পরম রমণীয়

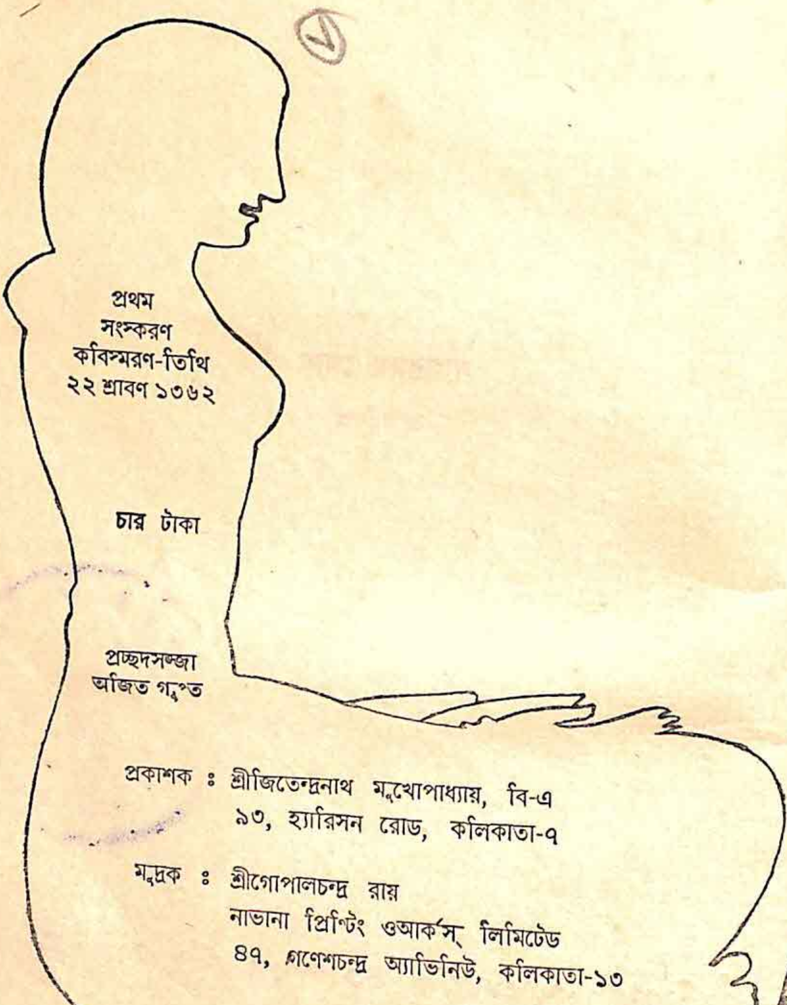
পরম রমণীয়

সাগরময় ঘোষ

সম্পাদিত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭



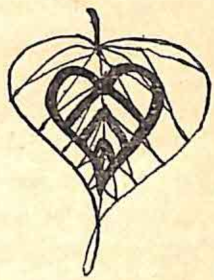
প্রথম
সংস্করণ
কবিস্মরণ-তিথি
২২ শ্রাবণ ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক ঃ শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩





উৎকৃষ্ট রচনা মাত্রেই রম্য, কিন্তু রম্য রচনা মাত্রেই রম্যরচনা নয়। যেমন, উৎকৃষ্ট রচনা মাত্রেই রসোপেত, কিন্তু রসোপেত রচনা মাত্রেই রসরচনা নয়। ঠিক কাকে যে রম্যরচনা বলে, সে-বিষয়ে কোনও সংজ্ঞা আজও নিরূপিত হয়নি। কাকে বলে না, বলা অনেক সহজ।

বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে রম্যরচনা লেখা হয়ে আসছে। লঘু নিবন্ধ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, আমেজী সাহিত্য, বৈঠকী রচনা, এই নানান নামে তার পরিচয়। সাহিত্যের এই ঘরোয়া বাগানে গত একশ বছরে নানা বর্ণের নানা গন্ধের যে অসংখ্য ফুল ফুটেছে, তারই একটি স্তবক এই পরমরমণীয়।

সম্পাদকের কথা

প্রবন্ধ আর 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ, সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন জাতের রচনা। আকৃতিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও প্রকৃতিগত পার্থক্য এ-দুয়ের মধ্যে অনেকখানি। প্রবন্ধে যে-আলোচনা একান্তভাবে বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ, রস-রচনায় সে-আলোচনা লেখকের আমেজী মনের জারক রসে জারিত হয়ে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। পাঠকের সামনে সে তার বক্তব্য বিষয়কে এমনভাবে তুলে ধরে যা সম্পূর্ণ তারই সৃষ্টি, যাতে থাকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত মনের কলা-কৌশল, একটা সজীব হৃদয়ের স্পর্শে যা অনুপ্রাণিত। এই রূপ আর রসের আকর্ষণ থাকে বলেই এ-জাতীয় রচনা আজ সাহিত্যের দরবারে বিশিষ্ট আসন অধিকার করে বসেছে। এই পরমরমণীয় রচনাকে তাই রসসাহিত্য বলেও অভিহিত করা যায়।

রসসাহিত্যের অন্যতম গুণ হচ্ছে, লেখকের ব্যক্তিত্বের বিভায় সর্বদাই তা ঝলমল করছে। লেখক তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। তাঁর হাতিয়ার সব সময়ই হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা, তাকে তিনি যদৃচ্ছ চালনা করতে পারেন। এ-লেখার পিছনে থাকে সৃষ্টির আনন্দ, কোনো উদ্দেশ্যের তাগিদ এতে তেমন থাকে না, আর থাকলেও তা পাঠকের মনের উপর জবরদস্ত-ভাবে চাপানোর কোনো স্পৃহা এর নেই। এ কতকটা শরৎকালের হালকা হাওয়ায় ভেসে চলা মেঘ; ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়, ক্ষণে ক্ষণে তাতে রঙ ধরে। ক্ষণিকের জন্য হলেও এই রূপ ও রঙের খেলায় প্রতিমুহূর্তেই জেগে উঠছে চিরন্তনের মাধুরী। কে দেখল বা না দেখল, তাতে তার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রবন্ধ-সাহিত্য বর্ষার জলভারাক্রান্ত মেঘমেদুর আকাশ, আর রসসাহিত্য শরৎ আকাশের লঘুপক্ষসঞ্চারী মেঘমালা। প্রবন্ধ-সাহিত্য প্রকাশ, রসসাহিত্য বিকাশ।

রসসাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার কোনো স্থির প্রয়াস লেখকের মনে থাকে না। যে-কোনো বিষয়কে পাঠকের সামনে তুলে ধরে তার উপর লেখক খেয়ালখুশিমত নানা রঙের আলো ফেলতে থাকেন; এর জন্যে পাঠকের কাছে তাঁর কোনো জবাবদিহির দরকার হয় না। যুক্তি এখানে অনেকটা শিথিল, ঢিলেঢালা। তাঁর বক্তব্য বিষয়ের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছা। ন্যায় ও যুক্তির পথেই সত্যনিষ্ঠ হয়ে চলতে হবে, এমন কোনো অংগীকার পাঠকের কাছে লেখকের দেওয়া নেই। লেখক শুধু চান আনন্দ প্রবৃত্তি আর সৃষ্টি-বাসনার কাছে সত্যনিষ্ঠ থাকতে। এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেই তিনি নিশ্চিন্ত।

এক কথায় বলতে গেলে, এমন অনেক পাঠক আছেন যাঁরা বিশেষ এক ধরনের প্রবন্ধ পড়তে ভালই বাসেন। হাতে যখন আর কোনো জরুরী কাজের তাগাদা নেই, মন যখন খুশির আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন তখন প্রিয়জনসঙ্গ সবাই কামনা করে। মনের মত কথা বলার সঙ্গী যদি হাতের কাছে না-ই পাওয়া গেল, ক্ষতি কি। বইয়ের তাক থেকে আপনার প্রিয় লেখকদের সংকলনটি তুলে আনুনঃ দেখবেন বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী বা প্রমথনাথ বিশী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ইন্দ্রজিৎ আপনার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করবার জন্যে উন্মুখ, আপনার মত শ্রোতাই ত তাঁরা এতকাল ধরে খুঁজে ফিরছেন। এদের সঙ্গে নিভৃতগুঞ্জনের জন্য আপনার মন যদি আজ প্রস্তুত না-ই থেকে থাকে, পাতা উলটিয়ে আপনি চলে আসুন, পাশেই ত রয়েছে বহুদূরবিস্তৃত ফরাস-পাতা বৈঠকখানা। সঞ্জীবচন্দ্র থেকে শিবরাম চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজতবা আলী থেকে রূপদর্শী সবাই একাসনে বসে আসর জাঁকিয়ে ঘরোয়া খোশ-গল্পের মজলিশ জমিয়ে তুলেছেন।

আগেই বলেছি, রসসাহিত্য বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ যে-নামেই একে অভিহিত করুন না কেন, এ হচ্ছে শরত-আকাশের নিরুদ্দেশ মেঘ। যদি কোনো উদ্দেশ্য এর পিছনে লুকিয়ে থাকে তো সে হচ্ছে শিল্পীর নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা, লেখার বিষয়কে প্রকাশ করা নয়। বিষয়টা শিল্পীর বা লেখকের একটা অবলম্বন মাত্র। তা বলে এরকম যেন ধারণা না হয় যে, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ মানেই নিজের সম্বন্ধে নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবেই কিছু লিখতে হবে অথবা 'আমি'র আধিক্য দিয়ে রচনা ভরিয়ে তুলতে হবে। বিষয়বস্তু এ-লেখার বড় আকর্ষণ নয়, এর আকর্ষণ নিহিত রয়েছে সেই বিষয় সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব মনোভাবে এবং সেই মনোভাবকে তিনি পাঠকের কাছে কেমন করে তুলে ধরছেন তার উপর। অর্থাৎ 'কী বলছেন', আর 'কী ভাবে বলছেন', সাহিত্য-রসিক পাঠকের কাছে দুয়ের আকর্ষণই সমান।

লেখক যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে পাঠককে কোণঠাসা করবেন বা তাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করবেন, পাঠক তা কখনই লেখকের কাছে আশা করে না, পাঠক চায় তার মন লেখকের ভাবনার সঙ্গী হয়ে নিঃসীম শূন্যে সময়হারা উদ্দেশ্যহীন ভেসে চলুক, সেখানে প্রয়োজনের তাগিদ তাকে তাড়না করে ফিরবে না।

পাঠকের সঙ্গে লেখকের এই আলাপচারিতে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ খুব স্পষ্ট থাকে। জীবনের গুণ-ভাবের সমাবেশ তাঁর রচনায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পাঠকের কাছে তাঁর চরিত্র এইজন্যেই মধুর, এইজন্যেই তাঁকে জানবার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। এসবের মিলিত প্রভাবেই সে দৈনন্দিন জগৎকে নিজের

করে তোলে, পুরনো জগৎ এক নতুন মহিমার সংস্পর্শে এসে নতুন প্রভায় জ্বলে ওঠে। রসসাহিত্যিকের কাজই হচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত জগতের মধ্যে এমন সব সম্ভার আবিষ্কার করা যা দেখেও আমরা দেখি না, জেনেও আমরা জানি না। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত বিষয়ে দৃষ্টিবিমুখ আমাদের মন তাই এ-জাতীয় সাহিত্য-প্রয়াসে উজ্জ্বল নক্ষত্র আবিষ্কারের আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, এক নতুন অনুভূতি-স্পর্শে আমরা বিহ্বল হই। লেখক এখানে শিল্পীর আসনে বসে চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেন যে, তুচ্ছের মধ্যেও কী বিরাটের মহিমা অংকুরিত হয়ে আছে।

রস-সাহিত্যের প্রধান যে লক্ষণগুলি তার সংজ্ঞা নিরূপণে সহায়তা করে, এখানে তার একটু আলোচনা করে রাখলে এই সংকলনের বিভিন্ন লেখক ও তাঁদের রচনা সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণা করে নেওয়া কষ্টকর হবে না। প্রথমত রচনার বিষয়-নির্বাচনে কোনো জাতবিচার মানলে চলবে না। গুরু-গম্ভীর বিষয় এবং বহুবার-বহু-লেখক-আলোচিত বিষয় থেকে আরম্ভ করে আপাত দৃষ্টিতে যা ক্ষুদ্র সাধারণ চুটকি মামুলি বলে মনে হয় তারাও এ-জাতীয় সাহিত্যে সমান পংক্তিতে মাথা উঁচু করেই বসতে পারে। অর্থাৎ জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না, পূর্ণের পদপরশ লেখকরাই তাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। কলকাতা থেকে কলতলা, বড়বাজার থেকে বড়াখাম্বা, চৌরঙ্গী থেকে চৌবাচ্চা, মান থেকে পাণ, শোবার ঘর থেকে সমুদ্রতীর—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে এই অবাধ বিচরণ একমাত্র রসসাহিত্যেই সম্ভব। লেখকরাও এর মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পান, পাঠকরা পায় লেখকদের অন্তরঙ্গভাবে কাছে পাবার আনন্দ।

রসসাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পড়বার সময় পাঠকের একবারও মনে হবে না যে, এ-লেখা কষ্টকল্পিত। শুধু যে তার ভঙ্গিটুকুই সহজ সাবলীল তা-ই নয়, এর চলার গতিতেও ছন্দ আছে; সে-ছন্দ মৃদু কিন্তু ম্রিয়মাণ নয়, শিথিল কিন্তু শ্লথ নয়।

কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌছবার তাড়া নেই, যুক্তিতর্কের উদ্দাম বন্যায় তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কোনো আড়ষ্ট দৃঢ়সংকল্প বা মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ নেই। বস্তুত এ-জাতীয় সাহিত্যরচনায় লঘুরস বা হিউমার-এর উৎস একটা কোমল সমবেদনার উৎস থেকে বেশী দূরে নয়। কারণ লেখক যে-চাক থেকে মধু আহরণ করেন তার মূল নিহিত আছে মানুষের অন্তর-প্রকৃতিতে, যেখানে জীবনের সহজ প্রথম স্বাভাবিক ভাবগুলি এক সঙ্গে মেলা করে থাকে। সেখানে লঘু-গুরু হাসি-অশ্রুর বাস পাশাপাশি।

সাহিত্য-জগতে যে-সব জাতি সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তার মধ্যে ফরাসী আর ইংরেজ সর্বাগ্রগণ্য। ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনীসাহিত্য, গবেষণামূলক সাহিত্য ও প্রবন্ধসাহিত্যে এই দুই দেশের কাছে বাংলাসাহিত্য অশেষ ঋণে ঋণী, এ-কথা অনস্বীকার্য। এই দুই দেশের সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়-সাধনের ফলে বাংলাসাহিত্যের আরেকটি অর্গল উন্মুক্ত হয়েছিল। সেই বাতায়ন-পথে এক-শতাব্দী পূর্বে রসসাহিত্যের যে আলোকরশ্মি দেখা দিয়েছিল, তাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃতবহুল শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধও যেমন রচনা করেছিলেন, অপরদিকে লঘুসাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে বাংলাভাষাকে মুক্ত করে বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আয়োজনও করেছিলেন। তাঁর হাতেই রসসাহিত্যের সূত্রপাত, তারপরে বহু সাহিত্যসাধকের অনলস প্রয়াসে এ-জাতীয় রচনা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ পার হয়ে আজ বাংলাসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় সম্পদে পরিণতি লাভ করেছে। বাংলাসাহিত্যের এই বিশেষ দিকটি কালে কালে কীভাবে ভাষা, বিষয়বস্তু, মননশীলতা এবং আঙ্গিকের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসরমান, তার ধারাবাহিক ইতিহাসটুকু তুলে ধরা এই সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। একশ' বছরে বাংলাভাষা ও শৈলীর ক্রমবিকাশও এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন আমি অনুভব করেছি।

সংবাদপত্রের আওতায় আরেক ধরনের রসসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, 'জর্নালিস্টিক লিটারেচর' নামে যা আজকাল জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত। সে-ধরনের রচনাকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়নি। তার একমাত্র কারণ, সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন পাবার দাবি সে রাখে না। সাময়িক প্রয়োজনের তাগাদায় রচিত বলেই সময় পার হয়ে গেলে তার রঙও ফিকে হয়ে যায়। যে সাতচল্লিশজন লেখকের রচনাকে এই সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁরা প্রায় সকলেই সিদ্ধহস্ত; বিশেষভাবে রসসাহিত্য রচনায় তাঁদের সযত্ন প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তু-নির্বাচনে, ভাষার করণ-কৌশলে, বলবার কায়দায় এঁদের অধিকাংশই রসসাহিত্য রচনার নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছেন, যার প্রভাব সাম্প্রতিককালের তরুণতম সাহিত্যিকদের মধ্যে স্পষ্টতই উপস্থিত। এ-ছাড়া এমন কয়েকজন সাহিত্যিক আছেন, আমি জানি, যাঁদের গদ্যরচনারীতি বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ বলে বিবেচিত। তাঁদের এ-জাতীয় রসসাহিত্য আমার নজরে পড়েনি এবং বহু অনুসন্ধান করেও যথাসময়ে আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

এই সংকলনকার্যে আমার যে-সকল সাহিত্যিক বন্ধু নানাভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, তার মধ্যে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সর্বাগ্রগণ্য। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বহু শ্রম স্বীকার করে তিনি যে লেখক-পরিচিত দিয়েছেন, তা এই সংকলনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল এই সংকলনকার্যে নানা পরামর্শ দিয়েছেন, এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে 'পরমরমণীয়'র পাঠকদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বাংলাভাষায় এ-ধরনের রসসাহিত্য-সংকলন ইতিপূর্বে আর হয়নি। প্রথম প্রচেষ্টা বলেই এর দুরূহতা আমাকে প্রতিপদেই বাধাগ্রস্ত করেছে। এ-বইয়ের সম্পাদনাকার্যে তাই কিছু দোষত্রুটি থেকে গেল, সবিনয়ে তা স্বীকার করে নিয়ে পাঠকদের ক্ষমাশীল সহানুভূতি প্রার্থনা করছি। এই সংকলন পাঠকদের যদি আনন্দ দিতে পারে, তবেই আমার শ্রম সার্থক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর॥ ব্রজবিলাস। ১
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ পালামৌর পর। ৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ বৃষ্টি। ১০
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ সোনায় সোহাগা। ১২
নবীনচন্দ্র সেন॥ প্রথম অনুরাগ। ১৯
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়॥ পূর্ণিমার শশী। ২২
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়॥ নক্ষত্রদের বৌ। ৩২
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ মুখ-চেনা। ৩৬
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ মান। ৪৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী॥ তৈল। ৪৭
বিপিনচন্দ্র পাল॥ কলিকাতায়। ৫১
জগদীশচন্দ্র বসু॥ হাজির। ৫৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ মন। ৫৭
শরৎকুমারী চৌধুরানী॥ মেয়ে-যজ্ঞি। ৬১
স্বামী বিবেকানন্দ॥ হাঙর। ৬৬
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বসন্তপঞ্চমী। ৭১
প্রমথ চৌধুরী॥ বর্ষা। ৭৪
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়॥ পাণ। ৭৮
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন। ৮৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর॥ বিচরণ। ৯৩
সরলাবালা সরকার॥ পুরীর সমুদ্রতীর। ১০৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ পাষাণের কথা। ১১১
সুকুমার রায়॥ ক্যাবলের পত্র। ১২২
দিবাকর শর্মা॥ অভিসার। ১২৭

কাজী নজরুল ইসলাম॥ আমার সুন্দর। ১৩১
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ বৈকালী। ১৩৭
প্রমথনাথ বিশী॥ গোরুর গাড়ি। ১৪৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ খোকার খেলনা। ১৪৮
অন্নদাশঙ্কর রায়॥ চিঠির কথা। ১৫১
শিবরাম চক্রবর্তী॥ চিত্রকলা। ১৫৪
পরিমল রায়॥ দিল্লীতে। ১৫৯
প্রবোধকুমার সান্যাল॥ শোবার ঘর। ১৬৩
অজিত দত্ত॥ ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা। ১৬৮
বুদ্ধদেব বসু॥ খাকি। ১৭২
সৈয়দ মুজতবা আলী॥ বই কেনা। ১৭৯
ইন্দ্রজিৎ॥ কলকাতা ও লন্ডন। ১৮৫
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়॥ হট্টশ্রী। ১৯১
সুবোধ ঘোষ॥ মধুমালার দেশ। ২০১
যাযাবর॥ পত্রসাহিত্য। ২০৪
জ্যোতির্ময় রায়॥ ইন্‌সম্‌নিয়া। ২০৯
সুশীল রায়॥ চৌবাচ্চা। ২১৩
রানী চন্দ॥ বিন্ধ্যাচলের পথে। ২১৮
রঞ্জন॥ রঞ্জন ও 'আমি'। ২২১
সন্তোষকুমার ঘোষ॥ এই দিল্লী। ২২৪
বিমল কর॥ আঁচল। ২৩১
পত্রনবীশ॥ ছদ্মনাম। ২৩৭
রূপদর্শী॥ মাহেশের রথ। ২৪৫
লেখক-পরিচিতি। ২৫৩

ব্রজবিলাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্রজবিলাস নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু, গ্রাহকবর্গের আগ্রহনিবৃত্তি হয় নাই। এজন্য অনেকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া এই মহাকাব্য পুনরায় মুদ্রিত করিতে হইল।

ফাজিল চালাকেরা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মত বিজ্ঞ বোদ্ধা যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাঁহারা যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করেন, অন্যে যাহা বলুক তাঁহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য। শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই জিনিস হইয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল চালাকেরা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিদ্যাসাগর লিখিত। যাঁহারা সেরূপ বলেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি তাহা এক কথায় সাব্যস্ত করিয়া দিতেছি।

এক গণ্ডা এক মাস অতীত হইল, বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে পেটের পীড়ায় বেয়াড়া জড়ীভূত হইয়া পড়িয়া লেজ নাড়িতেছেন, উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই। এ অবস্থায় তিনি এই মজাদার মহাকাব্য লিখিয়াছেন, একথা যিনি রটাইবেন, অথবা একথায় যিনি বিশ্বাস করিবেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত তাহা সকলে স্ব স্ব প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন।

আমার প্রথম বংশধর "অতি অল্প হইল" ভূমিষ্ঠ হইলে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া কোনও মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তকখানি কি আপনার লিখিত? তিনি কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহা ইঁহারই লিখিত। বিদ্যাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কিনা ইহা জানিবার জন্য এবার আমি চতুর চালাক বিশ্বস্ত বন্ধুবিশেষ দ্বারা তাঁহার নিকট ঐরূপ জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি পূর্বোক্ত মহোদয়ের মত ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, অথবা আমার লিখিত নয় বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দেন। যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে তিনি "না বিয়াইয়া কানাইর মা" হইতে চাহিবেন, সে ধরনের জন্তু নহেন।

অধিকন্তু তিনি ভাল লেখক বলিয়া এক সময়ে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, সত্য বটে। কিন্তু যে অবধি আমি প্রভৃতি কতিপয় উচ্চদরের লেখকচূড়ামণি, সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নানা রঙ্গে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেই অবধি তাঁহার লেখার আর তেমন গুমর নাই। ফল কথা এই, তিনি প্রভৃতি প্রাচীন দলের লেখকদিগের ভোঁতা কলমের থোঁতা মুখ হইতে এবংবিধ রগুদার মহাকাব্য নিঃসৃত হওয়া গোময়কুণ্ডে কমলোৎপত্তির ন্যায় কোনও মতে সম্ভব নহে।

যথাবিহিত যাহা অভিহিত হইল ইহাতে যদি প্রাচীন দলের অভিমানী লেখক মহোদয়েরা রাগ করেন করুন; আমার তাহাতে কিছুই বহিয়া যাইবেক না। আমি এ সকল বিষয়ে কাহারও তুআক্কা রাখি না ও রাখিতেও চাহি না। এজন্যে যদি আমায় নরকে যাইতে হয়, আমি তাহাতেও পিছপাও নই।

যদি বলেন, নরক কেমন সুখের স্থান, সে বোধ থাকিলে তুমি কখনোই নরকে যাইতে চাহিতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি একবারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার গুরুদেব উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে সেই সুবোধ সুশীল বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজারাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক, সব নরকে যাইবেন; যত দিলদরিয়া তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন; যত মৃদুভাষিণী চারুহাসিনী বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন; স্বর্গে যাইবার মধ্যে কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং অতঃপর নরকই গুলজার; এবং নরকে যাওয়াই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।' আমারও সেই উত্তর।

কিন্তু একটি বিষয়ে উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি কহিয়াছিলেন, 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল স্বর্গে যাইবেন।' আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে, এবং কাহারও পক্ষে সেই নরকপদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে; তাহা হইলে টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন এবং নরকের সকল জায়গা দখল করিয়া ফেলিবেন, আমরা আর সেখানে স্থান পাইব না।

শ্রীমান্ বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনগড়া বচন

পড়িয়া বলিয়া থাকেন, জ্ঞানকৃত পাপের নিষ্কৃতি নাই। বিষয়ী লোক শাস্ত্রজ্ঞ নহেন; সুতরাং তাঁহাদের অধিকাংশ পাপ জ্ঞানকৃত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ খুড়দের শাস্ত্রেও যেমন দখল পাপেও তেমনই প্রবৃত্তি; সুতরাং তাঁহাদের পাপের সংখ্যাও অধিক এবং সমস্ত পাপই জ্ঞানকৃত। এমন স্থলে, তাঁহারাই নরক একচাটিয়া করিয়া ফেলিবেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহারা আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যে নানা রঙ চড়াইয়া বর্ণনা করিয়া নরককে এমন ভয়ানক স্থান করিয়া তুলেন যে, শুনিলে হৃৎকম্প হয় এবং একবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আপনাদের বেলায় 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' বলিয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত পাপকর্মে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ের অতি সুন্দর একটি উদাহরণ দর্শিত হইতেছে।

কিছুকাল পূর্বে এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী প্রত্যহ তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অবাধে সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় গিয়া তদীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া অবশেষে ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন শিরোমণি মহাশয় ব্যাসাসনে আসীন হইয়া স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া তাহাকে অনন্তকাল যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলী বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধদেশ অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা ব্যভিচারিণীকে সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলী বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া বলে, তুমি, জীবদ্দশায় প্রাণাধিক প্রিয় উপপতিকে নিরতিশয় প্রেমভরে যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান করিতে; এক্ষণে এই শাল্মলী বৃক্ষকে উপপতি ভাবিয়া সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে যমদূতেরা যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করায়, তাহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া অতিকরুণ স্বরে বিলাপ পরিতাপ ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন

করিয়া কোনও স্ত্রীলোকেরই অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পর-পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর আর আমি প্রাণান্তেও পর-পুরুষে উপগতা হইব না।' সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি পূর্ববৎ শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ আর আর পরিচর্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত তাঁহার চরণসেবার জন্য যথাসময়ে তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইয়া তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক বারংবার আহবান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া গলদশ্রুলোচনে শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো। কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে আর আমার কোনও মতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া পণ্ডিত চূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং দ্বারদেশে আসিয়া সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন 'আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা পূর্বাপর যেরূপ বলিয়া আসিতেছি আজও সেইরূপ বলিয়াছি। শিমুল গাছ পূর্বে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন আলিঙ্গন করিলে সর্বশরীর শীতল ও পুলকিত হয়।' এই বলিয়া অভয় প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে পূর্ববৎ চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।

পূর্ব বারে অমার্জনীয় অনবধান-দোষবশতঃ নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিতেছি, বেতপ বিদ্যাবাগীশ দলের যেরূপ গুণকীর্তন করিলাম, তাহাতে কেহ এরূপ না ভাবেন, আমাদের মতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই একবিধ,

তাঁহাদের মধ্যে ইতরবিশেষ নাই। আমরা সরল হৃদয়ে ধর্ম প্রমাণ নির্দেশ করিতেছি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ে এরূপ অনেক মহাশয় ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে অন্তঃকরণ প্রকৃত প্রীতিরসে পূর্ণ ও প্রভূত ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। তাঁহারা যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভার আজ্ঞাবহ দলের ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য নহেন। তাঁহাদের সদসদ্বিবেক, উচিতানুচিত বিবেচনা প্রভৃতি এ কাল পর্যন্ত লয়প্রাপ্ত হয় নাই। তুচ্ছ লাভের লোভে অবলীলাক্রমে ধর্মাধর্ম বিবেচনায় বিসর্জন দিতে পারেন, তাঁহারা সেরূপ প্রকৃতি ও সেরূপ প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

"ব্রজবিলাস"। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ১২৯১ বংগাব্দ

পালামৌর পর

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহু কালের পর পালামৌ সম্বন্ধে দুইটা কথা লিখিতে বসিয়াছি। লিখিবার একটা ওজর আছে। এক সময়ে একজন বধির ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতিবাসী ছিলেন, অনবরত গল্প করা তাঁহার রোগ ছিল। যেখানে কেহ একা আছে দেখিতেন, সেখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিতেন; কেহ তাঁহার গল্প শুনিত না, শুনিবারও কিছু তাহাতে থাকিত না। অথচ তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, সকলেই তাঁহার গল্প শুনিতে আগ্রহ করে। একবার একজন শ্রোতা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আর তোমার গল্প ভাল লাগে না. তুমি চুপ কর।" কালা ঠাকুর উত্তর করিয়াছিলেন, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে এ গল্পের অনেক বাকি।" আমারও সেই ওজর। যদি কেহ পালামৌ পড়িতে অনিচ্ছুক হন, আমি বলিব যে, "তা কেমন করে হবে, এখনও যে পালামৌর অনেক কথা বাকি।"

পালামৌর প্রধান আওলাত মৌয়া গাছ। সাধুভাষায় বুঝি ইহাকে মধুদ্রুম বলিতে হয়। সাধুদের তৃপ্তির নিমিত্ত সকল কথাই সাধুভাষায় লেখা উচিত। আমারও তাহা একান্ত যত্ন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বড় গোলে পড়িতে হয়, অন্যকেও গোলে ফেলিতে হয়, এই জন্য এক এক বার ইতস্তত করি। সাধুসঙ্গ আমার অল্প, এই জন্য তাঁহাদের ভাষায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে নাই। যাঁহাদের সাধুসঙ্গ যথেষ্ট অথবা যাঁহারা অভিধান পড়িয়া নিজে সাধু হইয়াছেন, তাঁহারাও একটু একটু গোলে পড়েন। এই যে এই মাত্র মধুদ্রুম লিখিতে হইল, অনেক সাধু ইহার অর্থে অশোকবৃক্ষ বুঝিবেন। অনেক সাধু জীবন্তীবৃক্ষ বুঝিবেন। আবার, যে সকল সাধুর গৃহে অভিধান নাই, তাঁহারা হয়ত কিছুই বুঝিবেন না; সাধুদের গৃহিণীরা নাকি সাধুভাষা ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বলেন, সাধুভাষা অতি অসম্পন্ন, এই ভাষায় গালি চলে না, ঝগড়া চলে না, মনের অনেক কথা বলা হয় না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বলুন, সাধুভাষা গোল্লায় যাক।

মৌয়ার ফুল পালামৌ অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া

থাকে। হিন্দুস্থানীয়েরা কেহ কেহ সক করিয়া চালভাজার সঙ্গে ঐ ফুল খাইয়া থাকেন। শুখাইয়া রাখিলে এই ফুল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে। বর্ষাকালে কোলেরা কেবল এই ফুল খাইয়া দুই তিন মাস কাটায়। পয়সার পরিবর্তে এই ফুল পাইলেই তাহাদের মজুরি শোধ হয়। মৌয়ার এত আদর, অথচ তথায় ইহার বাগান নাই।

মৌয়ার ফুল শেফালিকার মত ঝরিয়া পড়ে, প্রাতে বৃক্ষতল একেবারে বিছাইয়া থাকে। সেখানে সহস্র সহস্র মাছি মৌমাছি ঘুরিয়া ফিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কোলাহলে বন পুরিয়া যায়। বোধ হয় দূরে কোথায় একটা হাট বসিয়াছে। একদিন ভোরে নিদ্রাভঙ্গে সেই শব্দে যেন স্বপ্নবৎ কি একটা অস্পষ্ট সুখ আমার স্মরণ হইতে হইতে আর হইল না। কোন্ বয়সের কোন্ মুখের স্মৃতি, তাহা প্রথমে কিছুই অনুভব হয় নাই, সে দিকে মনও যায় নাই। পরে তাহা স্পষ্ট স্মরণ হইয়াছিল। অনেকের এইরূপ স্মৃতিবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। কোনো একটা দ্রব্য দেখিয়া বা কোনো একটা সুর শুনিয়া অনেকের মনে হঠাৎ একটা সুখের আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন মন যেন আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠে। অথচ কিজন্য এই আহ্লাদ, তাহা বুঝা যায় না। বৃদ্ধেরা বলেন, ইহা জন্মান্তরীণ সুখস্মৃতি। তাহা হইলে হইতে পারে; যাঁহাদের পূর্বজন্ম ছিল, তাঁহাদের সকলই সম্ভব। কিন্তু আমার নিজ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ইহজন্মের স্মৃতি। বাল্যকাল আমি যে পল্লী-গ্রামে অতিবাহিত করিয়াছি, তথায় নিত্য প্রাতে বিস্তর ফুল ফুটিত, সুতরাং নিত্য প্রাতে বিস্তর মৌমাছি আসিয়া গোল বাধাইত। সেই সঙ্গে ঘরে বাহিরে, ঘাটে পথে হরিনাম—অস্ফুট স্বরে, নানা বয়সের নানা কণ্ঠে, গুন্ গুন্ শব্দে হরিনাম মিশিয়া কেমন একটা গম্ভীর সুর নিত্য প্রাতে জমিত, তাহা তখন ভাল লাগিত কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সেই সুর আমার অন্তরের অন্তরে কোথায় লুকানো ছিল, তাহা যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিল। কেবল সুর নহে, লতা-পল্লব-শোভিত সেই পল্লীগ্রাম, নিজের সেই অল্প বয়স, সেই সময়ের সঙ্গিগণ, সেই প্রাতঃকাল, কুসুমসুবাসিত সেই প্রাতর্বায়ু, তাহার সেই ধীর সঞ্চরণ—সকলগুলি একত্রে উপস্থিত হইল। সকলগুলি একত্র বলিয়া এই সুখ, নতুবা কেবল মৌমাছির শব্দে সুখ নহে।

অদ্য যাহা ভাল লাগিতেছে না, দশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি ভাল লাগিবে। অদ্য যাহা সুখ বলিয়া স্বীকার করিলাম না, কল্য আর তাহা জুটিবে না। যুবার যাহা অগ্রাহ্য, বৃদ্ধের তাহা দুষ্প্রাপ্য। দশ বৎসর

পূর্বে যাহা আপনিই আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন হয়ত আদর পায় নাই, এখন আর তাহা জুটে না, সেই জন্য তাহার স্মৃতিই সুখদ।

নিত্য মুহূর্তে এক একখানি নূতন পট আমাদের অন্তরে ফোটোগ্রাফ হইতেছে এবং তথায় তাহা থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের চতুষ্পার্শে যাহা-কিছু আছে, যাহা-কিছু আমরা ভালবাসি, তাহা সমুদয় অবিকল সেই পটে থাকিতেছে। সচরাচর পটে কেবল রূপ অঙ্কিত হয়, কিন্তু যে পটের কথা বলিতেছি, তাহাতে গন্ধ স্পর্শ সকলই থাকে। ইহা বুঝাইবার নহে, সুতরাং সে কথা থাক।

প্রত্যেক পটের এক-একটা করিয়া বন্ধনী থাকে, সেই বন্ধনী স্পর্শ মাত্রেই পটখানি এলাইয়া পড়ে, বহু কালের বিস্মৃত বিলুপ্ত সুখ যেন নূতন হইয়া দেখা দেয়। যে পটখানি আমার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল বলিতেছিলাম বোধ হয় মৌমাছির সুর তাহার পটবন্ধনী।

কোনো পটের বন্ধনী কি, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন; যিনি তাহা করিতে পারেন, তিনি কবি। তিনিই কেবল একটি কথা বলিয়া পটের সকল অংশ দেখাইতে পারেন, রূপ গন্ধ স্পর্শ সকল অনুভব করাইতে পারেন। অন্য সকলে অক্ষম, তাহারা শত কথা বলিয়াও পটের শতাংশ দেখাইতে পারে না।

মৌয়া ফুলে মদ্য প্রস্তুত হয়, সেই মদ্যই এই অঞ্চলে সচরাচর ব্যবহার। ইহার মাদকতা-শক্তি কতদূর জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সে বিষয়ে ইহার বড় নিন্দা নাই, কেননা আমার একজন পরিচারক একদিন এই মদ্য পান করিয়া বিস্তর কান্না কাঁদিয়াছিল। তাহার প্রাণও যথেষ্ট খুলিয়াছিল, যেরূপে আমার যত টাকা সে চুরি করিয়াছিল, সেই দিন তাহা সমুদয় বলিয়াছিল। বিলাতী মদের সহিত তুলনায় এ মদের দোষ কি, তাহা স্থির করা কঠিন। বিলাতী মদে নেশা আর লিবর দুই থাকে। মৌয়ার মদে কেবল একটি থাকে, নেশা—লিবর থাকে না; তাহাই মদের এত নিন্দা, এ মদ এত সস্তা। আমাদের ধেনোরও সেই দোষ।

দেশী মদের আর-একটা দোষ, ইহার নেশায় হাত-পা দুইয়ের একটিও ভাল চলে না। কিন্তু বিলাতী মদে পা চুলক বা না চলুক, হাত বিলক্ষণ চলে, বিবিরা তাহার প্রমাণ দিতে পারেন। বুঝি আজকাল আমাদের দেশেরও দুই চারি ঘরের গৃহিণীরা ইহার সপক্ষ কথা বলিলেও বলিতে পারেন।

বিলাতী পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করিতে পারিলে মৌয়ার ব্রান্ডি

হইতে পারে, কিন্তু অর্থসাপেক্ষ। একজন পাদরি আমাদের দেশী জাম হইতে শ্যামপেন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তিনি তাহা প্রচলিত করিতে পারেন নাই। আমাদের দেশী মদ একবার বিলাতে পাঠাইতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, অনেক অন্তরজ্বালা নিবারণ হয়।

"পালামৌ"। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ

বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই-সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে। চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে, এই বিশোষিতা পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহা-কল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইশ! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে-জলে এক করিব। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। যুবতীর যত্ননির্মিত শয্যা ভিজাইয়া দিই, সুষুপ্ত সুন্দরীর গায়ের উপর গা ঢালি। বায়ু! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল, নহিলে আমরা কেহ নই। চল আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ লতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

তবে আয়, ডেকে ডেকে, হেঁকে হেঁকে, নবনীল কাদম্বিনি! বৃষ্টিকুল-

প্রসূতি! আয় মা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনি; সৌরতেজঃসংহারিণী! এসো, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি! এসো ভগিনি সুচারুহাসিনি চঞ্চলে! বৃষ্টিকুল-মুখ আলো কর। আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে,. ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক-না—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও। এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্য মধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ তো এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ, পোড়াও তো ঐ উচ্চ দেবালয়চূড়া পোড়াও। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! দুই-একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে, মাগীর কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ-রস জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি—দম্পতীর গৃহে ছাদ ফুটা করিয়া টু দিই। যে পথে সুন্দর বৌ জলের কলসী লইয়া যাইবে, সেই পথ পিছল করিয়া রাখি। মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকুতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। ভণ্ড বামুনের জন্য আচমনীয় যাইতেছে দেখিলে, তাহার জাতি মারি। আমরা কি কম পাত্র! তোমরা সবাই বল—আমরা রসিক।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব! বিশীর্ণা সূত্রাকারা তটিনীকে কূল-প্লাবিনী দেশমজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী অনন্ত তরঙ্গিনী জলরাক্ষসী করিব। কোনো দেশের মানুষ রাখিব—কোনো দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

"গদ্যপদ্য"। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ

সোনায় সোহাগা

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজ-সংস্কারকদিগের এই একটি সহজ সত্যের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্তব্য যে, সভ্যসমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্যসমাজ নাই যাহার ষোল আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোনো সভ্য মানুষেরই এমন কোনো দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনো জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্মান জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল! নর্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্‌সন্‌ রীতিনীতি ষোলো আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদান অধিকাংশই সাক্‌সন্‌—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে; যে কোনো ভূত হউক না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা এবং অবশিষ্ট ফী-চারি ভূতের দুই আনা—একুনে চারি-দুগুণে আট আনা—এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল, পঞ্চীকৃত বায়ু, ইত্যাদি)। তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে, তাহা পঞ্চীকৃত সাক্‌সন্‌ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাকস্‌ন্‌, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা লাটিন, দুই আনা গ্রীক, দুই আনা ফরাসিস, ও দুই আনা কেল্‌ট্‌! সাক্‌সন্‌ মূল উপাদান ইংরাজি সভ্যতার ভিত্তি-ভূমিকে এমনি বলপূর্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাতাকে রাজবংশের দিক দিয়া ফরাসিস টানাটানি করিয়াছে, ধর্মযাজকের দিক দিয়া লাটিন গ্রীক টানাটানি করিয়াছে, আদিম নিবাসীর দিক দিয়া কেল্‌ট্‌ টানাটানি করিয়াছে এত যে প্রাণপণ বলে—কেহই তাহাকে একচুলও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। নর্মান কঙ্কেস্‌টের গ্রন্থকার ফ্রীমান বলেন—"ইংলণ্ড বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্মানেরা এমনি

এক মারাত্মক রকমের বৈদেশিক অনুপান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে; পূর্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।" অর্থাৎ সাক্‌সন্‌ মূল উপাদান কিয়ৎকাল দমনে থাকিয়া আবার তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর জাতীয় সভ্যতা অনুপান স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেপরূপ পঞ্চীকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়.--তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্বরা করিয়া তোলে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর কোনো জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্য-শালিনী উর্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থানটি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। এডওয়ার্ড-দি-কন্‌ফেসর একজন সাক্‌সন্‌ রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার মন ছিল সম্পূর্ণ ফরাসিস। ফ্রীমান তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন— "এডওআর্ড, সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, নর্মানদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের বা লাভের যেখানে যত-কিছু বরণীয় স্থান সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত ভরাট হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি যাচিয়া আনিয়াছিলেন। নর্মানদিগের কর্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এডওয়ার্ড হইতেই হইয়াছিল।"

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এডওয়ার্ড-দি-কন্‌ফেসর ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর-এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই যা একটু রক্ষা! ফ্রীমান বলেন,—"গডওয়াইন যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণস্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যারপরনাই সুস্পষ্ট প্রমাণ

দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।” এখানে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য কেবল এইটিই দেখানো যে, আমরাও এডওয়ার্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়ালে আমাদের দেশের কোনো উপকারেই আসিতে পারিব না,—লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্‌ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয় সভ্যতার পত্তনভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্যের সহিত যথাকালে যথা দেশে যথা পরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে সোনায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত. কিন্তু তাঁহার কোনো কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্যন্ত। যদি পূর্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পান, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির হৃদয় পান তবেই সোনায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোনায় সোহাগা করিয়া তোলে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি. তবে যে শাখায় আমরা উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম, আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভবনা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্যমহলে “চাই নূতন—চাই নূতন” “কই নূতন—কই নূতন” “এই নূতন—এই নূতন” বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে। জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস না দিলে নূতন এক মুহূর্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া “নূতন” যখনই ভুস্‌ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্‌ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের পতন ও ফরাসিস দেশে সাধারণতন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল।

হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধধর্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল রত্ন ছিল, কেবল একটি রত্নের অভাব ছিল, সেটি—হৃদয়। বৌদ্ধধর্মে, আত্মসংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্মের জন্য যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে—কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল,—সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসিস বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কিই আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল তবে শুদ্ধ শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য সমাজ হৃদয়শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনো একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্যের পরিবর্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদতত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিরচণ করিলে, জুঁই বেল মল্লিকা গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে—বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়! ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্বজন্মে কত-না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্জ্বল করিত ও দশ দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে শীতল সুগন্ধ উপঢৌকন দিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী শেফালিকা নববারিধারায় প্রাণ পাইয়া সৌরভের মাধুর্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্নাধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি তাড়াইয়াছ—ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম।" বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র্য সাধন কর—তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না—কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধি দেশী ফুল যে এই বলিয়া দুঃখের গীত সুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না! আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই বেল মল্লিকা গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া

বিদেশীয় শক্তি-সামর্থ্য সংযুক্ত হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়ান, ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তিপুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ, কার্য-নৈপুণ্য, কর্মিষ্ঠতা, প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকুন,—তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি—সোনায় সোহাগা।

"প্রবন্ধমালা"। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

প্রথম অনুরাগ

নবীনচন্দ্র সেন

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। শেষ দিন যখন পরীক্ষার গৃহ হইতে বাহির হইলাম, বোধ হইল হৃদয়ে যেমন একটি নবীন উৎসাহ, শরীরে যেন একটি নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা যখন মনে করি তখন আমার আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। বলিদান। অজ শিশুগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া আনিল। পরীক্ষার ফিশ দাখিল হইল। ছাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বালক অনাহার অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল, বালকের "নমিনেশন রোল" পহুঁছিল। ছাগল তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল,—বালক কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষা গৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান। তারতম্যের মধ্যে এই —ছাগল তখনই মরে, সকল যন্ত্রণা শেষ হয়। বালক যাবজ্জীবনের জন্যে আধ্ মরা হইয়া থাকে, তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ মাত্র হয়।

যাহা হউক বলিয়াছি, প্রবেশিকা শেষ হইল; শরীরে নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ প্রবেশ করিল; প্রকৃতি নবীন সৌন্দর্যে হাসিল। হৃদয় হইতে কি একটি পাহাড় নামিয়া গিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নানা আনন্দে আমরা দলে দলে গিরিশৃঙ্গের উপত্যকায় এবং নির্ঝরের ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। কখনো কখনো প্রশ্নের কাগজ খুলিয়া যে যে প্রকার উত্তর দিয়াছি সেরূপ নম্বর ধরিতাম, কিন্তু কিছুতেই 'পাস মার্ক' কুলাইয়া উঠিত না।

বিদ্যুৎ আমার কোনো দূর আত্মীয়ের কন্যা। তাহার ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে পড়িত। দিনরাত্রি আমরা প্রায় এক সঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম; কখনো কখনো ঝগড়া করিতাম। বিদ্যুৎ তখন ক্ষুদ্র বালিকা—চঞ্চলা, মুখরা, হাস্যময়ী। বিধাতার হস্তের একটি অপরূপ একমেটে প্রতিমা। যখন সে তাহার নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত অলকরাশি দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাইত দেখিতাম, তখন সে শত ত্যক্ত করিয়া গেলেও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা

তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বত্থ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ আলিব্ সাইপ্রেস প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্বক, যথাস্থানে যথাপরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইবে; কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও, অথবা স্ট্রাবেরি পিয়ার আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে, একূল-ওকূল—দুকূল নষ্ট হইবে!

পুরাতন ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মারা—রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতাসূচক কুসংস্কারগুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরাজেরা বড় বড় টাইটেল্ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে টাইটেল্ আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না! এই যে উপবীত দেখিতেছ—ইহার সমক্ষে রাজারা পর্যন্ত মস্তক অবণত করে!" ব্রহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও-কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য—তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত করিব?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্যরক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে; কিন্তু কিরূপে সাম্যরক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ, (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য। আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার তাহাতে কাহারো কোনো পুরুষার্থ নাই; অথচ আমাদের দেশের সাম্য-ভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের প্রেমে মজিয়া আর্য-জাতি-

সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন! ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে,—(১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে। এরূপ যখন, তখন উভয় মধ্যে কোনো-এক জাতি যদি পর-পরিচ্ছেদের কাঙ্গালি হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত—আর এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও লজ্জিত নহে! এইরূপ হাতে হাতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যা'ন, তাঁহারা ফলে ঠিক তাঁহার উল্টা করিয়া বসেন—বাহ্য আকার সাদৃশ্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজ্বল্যরূপে ফুটাইয়া তোলেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির সাম্য, জাতিগৌরবের সাম্য, বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্যম-উৎসাহের সাম্য সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মত কাজ করি। তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাজের মত বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, ও সহস্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধ মনুষ্য-মূর্তি বিকট নেকড়েবাঘ-মূর্তিতে পরিণত হইতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্য-প্রিয় দেশ-হিতৈষী যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আর্য জাতীয় ভাবসাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্বলাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক যদি নিখুঁত ষোলো আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোলো আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি—প্রসাদের কাঙ্গালি—ভাষার কাঙ্গালি—পরিচ্ছদের কাঙ্গালি—অনুগ্রহের কাঙ্গালি—এ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারি আনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা—কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ-সাজিয়া, ইংরাজের দলে মিশিতে গেলে—অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি—প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের সহিত অল্পে অল্পে

হইত না। সেও আমাদিগকে বিরক্ত করাটি একরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান। যখন বিদ্যুৎ সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা, সে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভাবি সংসার যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তদবধি আমি আর তাহার গৃহে বড় একটা যাইতাম না; গেলে মনে কি যেন দুঃখ, হৃদয়ে কি যেন একটা অভাব বোধ হইত। চার কি পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর একদিন বিদ্যুতের মাতা আমাকে ডাকিলেন। আমি অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছি, পাশে ও কে ধীরে ধীরে কোমল পদবিক্ষেপে আসিয়া বসিল? বিদ্যুৎ! কি চমৎকার পরিবর্তন। যে বালিকা ছুটিয়া, বাতাসে কুন্তলের কুঞ্চিত অলকাবলি এবং অঞ্চল উড়াইয়া ভিন্ন চলিতে পারিত না, সে আজি ধীরে ধীরে কোমল পদক্ষেপে—পায়ের নিচে ফুলটি পড়িলেও নামিতে হইত না—এরূপ অলক্ষিতভাবে আসিয়া বসিল। যাহার হাসি ও কণ্ঠ বাঁশির মত অনবরত বাজিত, আজি তাহার সে তরঙ্গায়িত অধরবিপ্লাবী হাসি কোমলার অধর প্রান্তে বিলীনপ্রায় হইয়া কি এক অস্ফুট ভাব ও শোভা বিকাশ করিতেছিল। কণ্ঠ নীরব। যে কখনো গলা জড়াইয়া ধরিয়া অংশে উরসে ভিন্ন বসিত না, কি আশ্চর্য, আজি তাহার সঙ্গে চোকে চোকে দেখা হইলে সে চোক নামাইয়া লইতেছে। আমি অন্য কাহারো সঙ্গে কথা কহিতে, সে তাহার কমলদলায়ত দুই ভাসা চক্ষু আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে স্থাপিত করিয়া অতৃপ্তভাবে চাহিতেছে। কি দৃষ্টি! কি অর্থ! কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে যে কলকণ্ঠে কাকলি বর্ষণ না করিয়া থামিত না, সে আজি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তরে অধোমুখে চাহিতেছে।

আমারও হৃদয়ে কি একটি ভাবের উদয় হইতেছিল আমি বড় বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমারও সেই মুখখানি বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল, অথচ নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিতেছিলাম না। কে যেন চোক ফিরাইয়া দিতেছিল। চোকে চোকে দেখা হইলে কি যেন একটি কোমল কুসুম-স্পর্শ-মৃদু-মধুর আঘাত হৃদয়ে পঁহুছিতেছিল। সেখান হইতে যে উঠিতে পারিতেছিলাম না সেকথা আর বলিতে হইবে না। বসিতে বসিতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ রাত্রি হইল। অবশেষে উঠিলাম; আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারন্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুমস্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা! কি স্পর্শ! বুঝিলাম, আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ।

অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরো বুকে টানিয়া ধরিল। আমার সমস্ত শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল। বালিকা আমার করে একটি গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরুঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। গুরুমহাশয় আমাকে যথাশাস্ত্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বিদ্যুতের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারিবে না। অতএব সেখানে আর যাইতে আমাকে নিষেধ করিলেন।

"আমার জীবন"। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ

পূর্ণিমার শশী

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

তর তর করিয়া আপন মনে কোথায় যাইতেছ, একবার দাঁড়াও দেখি হে? দাঁড়াও; একবার ভাল করিয়া তোমায় দেখি। এ দুঃখের মনুষ্য-জীবনে দুঃখ অনন্তবিধ; কিন্তু মর্মান্তিক দুঃখ এই যে, কিছুই ভাল করিয়া দেখা হয় না। যাহা কিছু দেখিলাম, যাহা দেখিয়া মোহিত হইলাম, যাহা দেখিয়া আবার দেখিবার জন্য লালায়িত হইলাম—কিছুই ভাল করিয়া দেখা হইল না। কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; ইন্দ্রধনু দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া গেল; ক্ষণপ্রভা যেমন ভাসিল, অমনি ডুবিল— কিছুই নয়ন ভরিয়া দেখা হইল না। আর কুসুমের সৌকুমার্য, বিদ্যুতের শোভা, ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য, সায়াহ্ন-গগনের কোমলতা, বসন্ত-পবনের মাধুরী, চন্দ্র-রশ্মির পবিত্রতা—যেখানে একাধারে মিলিত দেখিলাম, তাহাও কোথায় চলিয়া গেল—

> "ভাল করি পেখন না ভেল!
> মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
> হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

একবার দাঁড়াও দেখি হে! একবার দাঁড়াও, একবার নয়ন ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া তোমায় দেখি। তোমায় বড় ভালবাসি। তুমি সুন্দর, তাই তোমায় ভালবাসি। তুমি কোমল, তাই তোমায় ভালবাসি। যেমন তোমার হৃদয়ে, তেমনি আমারও হৃদয়ে কালিমা পড়িয়াছে, তাই তোমায় ভালবাসি। আর ভালবাসি তোমার ঐ—

> "ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগললোচন, মুখে মৃদু মৃদু হাস।"

শুধু কি ঐজন্য? তা তো নয়। আর কিছু আছে কি? এ ভাল-বাসার ভিতর—এ কেবল চক্ষের ভালবাসার ভিতর আর কিছু আছে কি? তুমি আকাশের চাঁদ, আমাদের আকাশকুসুম—কখনও ত বুকে করিতে পাইব না—বুকে রাখিয়া, এক শ বার পলকে এক শ বার, মুখখানি চাহিয়া দেখিতে তো পাইব না। বলিবার কিছু নাই, তবু বলি বলি মনে করিয়া, কেবল স্পর্শসুখটুকুর জন্য, কখনও তো অনর্থক জাগিয়া রাত পোহাইতে পাইব

না। কখনও তো আমার জন্য একটু অধিক হাসি, আমি আসিয়াছি বলিয়া একটু অধিক আহ্লাদ ও চাঁদমুখে দেখিতে পাইব না। কখনও তো বচনামৃত কর্ণ-বিবর ভরিয়া ঢালিবে না—কেবল চক্ষের ভালবাসা ইহার ভিতর আবার কিছু আছে কি? বুঝি তাই। তোমাকে দেখিলে স্মৃতির গভীর অন্ধকারের ভিতর কি যে অস্পষ্ট দেখিতে পাই; আবার পলকের মধ্যে কই আর দেখিতে পাই না। খুঁজি, পাই না। যেদিকে তাকাই—শূন্য। তাহা—যাহা চাই, তাহা কই পাই না। সংসার খুঁজিয়া দেখি, সে স্পর্শমণি একখানা বৈ ছিল না। অন্তরে চাহিয়া দেখি, ধূ ধূ করিতেছে। সেই কি যেন কিছুই যেন নয়। মরুভূমি নয়, অরণ্য নয়, সাগর নয়, অকূল নদী নয়. আকাশ নয়; যাহা কিছুর সহিত লোকে দগ্ধ-হৃদয়ের তুলনা দেয়, তাহা নয়—সেই কি যেন কিছুই যেন নয়। মরুভূমে ওয়েসিস্ আছে, অরণ্যে জীব আছে, প্রান্তরে সরসী আছে, সাগরে দ্বীপ আছে, নদীতে জল আছে, আকাশে তারা আছে—হৃদয়ে কিছু নাই। এ নদীর কূল নাই, এ নদীতে খেয়া নাই; ইহাতে মৎস্য ভাসে না, চন্দ্র হাসে না, নক্ষত্র নাচে না, প্রতিবিম্ব পড়ে না; এ নদীর জল নাই, মৃত্তিকা নাই, বালুকা নাই—এ নদী শূন্যময়। এ আকাশে ভানু নাই, শশী নাই, নক্ষত্র নাই; মেঘ উঠে না, বিদ্যুৎ হাসে না, উল্কাপাত হয় না, বজ্র গর্জে না—এ আকাশ আকাশময়; এ মরুভূমে সূর্যরশ্মি পড়ে না; বায়ু বহে না, উত্তাপ লাগে না; ইহাতে বালুকা নাই, মৃত্তিকা নাই, খণ্ডকুঞ্জ নাই—এ মরুভূমি মরুভূময়। এ অরণ্যে সরসী নাই, বৃক্ষ নাই, লতা নাই, তৃণ নাই, পথ নাই; ইহাতে বন্যফুল ফুটে না, বনের পাখী গায় না—এ অরণ্য যেন কিছুই নয়। কোথাও খুঁজিয়া পাই না। তার পর অনন্ত দুঃখে অনন্তে মিশিবার জন্য অনন্ত আকাশের দিকে যখন চাই, তখন তোমাকে দেখিয়া, আবার সেই স্বপ্নময়ী মূর্তি জাগিয়া উঠে। তাই কলঙ্কী চাঁদ! তোমার কলঙ্ক-সত্ত্বেও তোমায় এত ভালবাসি! ক্ষতি বৈ লাভ নাই, দুঃখ বৈ সুখ নাই, কাঁদাও বৈ হাসাও না, হাস বৈ কাঁদ না—তবু এত ভালবাসি। কেবল সেই অতুল মুখখানির সঙ্গে দূর সম্বন্ধ আছে বলিয়া—নতুবা তুমি আমার কে? কিন্তু শশি! যাহা মনে পড়ে, তাহাতে বড় যন্ত্রণা পাই! জীবন অন্ধকার, সংসার শূন্য—মন কেমন উদাস হইয়া যায়। আমি সুখ চাহি না; কেননা. সুখ দুঃখ হইতে অবিযোজ্য—সুখ-দুঃখের যে মূর্তি সক্রেটিস্ কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। আমি সুখ চাহি না; কেবল শান্তির ভিখারী! বলিতে পার চন্দ্রদেব, যেখানে গেলে চক্ষের

জল শুকায়, এমন শান্তিনিকেতন কোথায়? তাহাকে ভুলিতে পারিলে বোধ করি, শান্তি পাইতে পারি। তবে তাহাকে ভুলিব কি? হা অদৃষ্ট! ভুলিব মনে করিলেই ভুলিতে পারি কই? কিন্তু ভুলিতে যদি পারি, তাহা হইলেই কি ভুলিতে চাই? যদি কোনও দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দিতে চায়, তবে কি তাহাকে ভুলিতে চাই? তাহা হইলে কি চাই? কি আবার চাই? তাহাকে চাই। ঐ বরটি ছাড়া যদি আর সব দিতে চায়, তবে কি চাই? ভুলিতে চাই কি? না। তাহাকে যদি না পাই, তবে মরিতে চাই। ও বরটিও যদি না পাই—যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় অথচ তাহাকে না পাই, তবে কি ভুলিতে চাই? না; আবার মরিতে চাই! কথা হইতেছে মৃত্যু যদি না হয়—তবে—তবে—তবে—আবার মরিতে চাই। মরণ যে হইবে না, ওর বর যে পাইব না—তবু আবার মরিতে চাই। নতুবা আর কি চাহিব? এত যে কাঁদি, সে তো দেখে না; এত যে বিলাপ করি, সে তো শুনে না—কই, সান্ত্বনা করিতে তো আসে না—কই, চক্ষের জল মুছাইতে তো আসে না। তবে ভুলিব না কেন। বেশ তো, ভুলিয়া যাইব, আবার এ-অন্ধকারে দীপ জ্বলিবে, এ আকাশে চাঁদ উঠিবে, এ নদীতে নক্ষত্র নাচিবে, এ মরুভূমে কুসুম ফুটিবে, এ সমুদ্রে দ্বীপ ভাসিবে, এ অরণ্যে পথ জাগিবে, এ মেঘে বিদ্যুৎ হাসিবে; আবার সংসার সুন্দর দেখিব, জগৎকার্যে বৈচিত্র্য দেখিব, মনুষ্য-মুখে দেবভাব দেখিব, সকল বিশ্বাস করিব, উচ্চ হাসি হাসিব, পৌষের রজনীকে ক্ষুদ্র বোধ করিব, আবার হৃদয় বাজিবে, শূন্য হৃদয় ভরিবে, গৃহে আকর্ষণীশক্তি ফিরিবে, চক্ষের জল শুকাইবে, অন্তরের শ্বাস মিলাইবে, দুঃখশর্বরী পোহাইবে—বেশ তো, ভুলি না কেন? ভুলিব কি? ভুলিব কি? না, না, হইল না। পারিলাম না, আর কি করিব? মন মানিল না। হৃদয় বুঝিল না, বুক বাঁধিতে পারিলাম না,—কি করিব, নাচার। দিবানিশি তাহাকে ভাবিয়া ভাবিয়া এমন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছি। এখন ঐ স্মৃতিই আমার জীবন—ইহা জীবন—ইহা ভুলিলে থাকিবে কি লইয়া? শূন্য হৃদয় অপেক্ষা যন্ত্রণা ভাল।

বলিতে লজ্জা করে. কিন্তু এত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, এমন করিয়া মরমে মরিয়াও যে. সেই স্মৃতিমূলে পড়িয়া থাকি—আনচান করি, ছটফট করি, কাঁদি, তবু যে সেই জ্বলন্ত-অনল বুকে করিয়া রাখি, তাহার মধ্যে একটু স্বার্থপরতা আছে।

হৃদয়ে সে থাকিলে, হৃদয় বেশ পবিত্র থাকে। যে গৃহে সে অতিথি, সে

গৃহে কাঠিন্য কার্কশ্য কিছু দাঁড়াইতে পায় না। সে মনে থাকিলে যেন বিনা আয়াসে পরের হাসিতে হাসিতে পারি, পরের কান্নায় কাঁদিতে পারি—যেন আপনা আপনি আপনাকে ভুলিয়া যাই, বেশ যেন অনুভব করি যে, পরকে সুখী করিবার জন্যই এ-মনুষ্যজন্ম। হৃদয় পুড়িয়া যায় বটে, কিন্তু না পুড়িলে অপবিত্রতা দূর হইবে কেমন করিয়া? না পোড়াইলে সুবর্ণ খাঁটি হয় না। শোকদুঃখ না থাকিলে সহৃদয়তা জন্মিবে কেমন করিয়া? স্বীকার করিয়াছি তো একটু স্বার্থপরতা আছে। সে আমার ধর্মের বন্ধন। তাহাকে মন হইতে দূর করিলে, ধর্মের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে। স্ত্রীলোকের মুখ হৃদয়ে না থাকিলে ধর্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া যায়। অন্য কোনও স্ত্রীলোক এ হৃদয়ে স্থান পায় না—স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলেই স্ত্রীলোকের কথা ভাবিলেই অমনি সে আসিয়া সমস্ত হৃদয়টুকু জুড়িয়া দাঁড়ায়। তাহাতেই বলি তাহাকে ভুলিলে ধর্মের পথে স্থির হইয়া চলিতে পারিব না—আত্ম-বিসর্জনটা কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। কাগজে কলমে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতে অনেক কথা লিখিতে পারিলেও পারিতে পারি, কিন্তু এখন যেমন অন্তরের পরতে পরতে তাহা অনুভব করি; তেমনটি আর থাকিবে না।

সেদিন যখন সেই ভোগস্পৃহাশূন্য সংসারত্যাগী যোগীপুরুষ বলিলেন "স্ত্রীলোককে কালভুজঙ্গী জানিয়া তাহার পথের দূরে থাকিও, যদি ধর্মে মন থাকে, পুণ্যসঞ্চয়ে অভিরুচি থাকে, ইন্দ্রিয়দমনে বাসনা থাকে, স্বর্গে যাইবার অভিলাষ থাকে, তবে কখনও রমণীর মুখ দেখিও না"—তখন আমি মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলাম না বটে, কিন্তু মনে মনে হাসিলাম। পাছে তিনি মনে ব্যথা পান, এইজন্য তাঁহার কথায় আপত্তি করিলাম না, কিন্তু মনে মনে হাসিলাম। হা কৃষ্ণ! স্বর্গ-গমনে পাছে ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে রমণীর মুখ দেখিব না? হা কৃষ্ণ! রমণীর প্রণয়পবিত্র মুখ দেখিব না তো বুঝিব কেমন করিয়া, স্বর্গ কেমন—দেবতারা কেমন—দেবীরা কেমন—তাঁহারা দেখিতে কেমন—তাঁহাদের পবিত্রতা কেমন—স্বর্গে সুখ কেমন? রমণীর মুখ দেখিবে না তো শিখিবে কেমন করিয়া পবিত্রতা কি—ভক্তিপ্রীতি কি—সহিষ্ণুতা কি—আত্মবিসর্জন কি—নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি? ওমুখ দেখিবে না তো জানিবে কেমন করিয়া নন্দনকাননে যে ফুল ফুটে, সে কেমন ফুল—অপ্সরা-কিন্নরে যে গান গায়, সে কেমন সঙ্গীত—দেবতারা যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, সে কেমন স্নেহ—অনন্ত স্নেহ, অনন্ত প্রেম কাহাকে বলে?

এ পাপ সংসারে, রমণীর মুখ ব্যতীত, দেখিবার উপযুক্ত আর কি আছে? রমণী-কণ্ঠ-শব্দ ব্যতীত শুনিবার উপযুক্ত আর কি আছে? ধর্মশিক্ষার জন্য, রমণী-হৃদয়ের ন্যায় আদর্শ আর কি আছে?

ও কি ও শশি! মেঘের আড়াল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া, উচ্চ হাসি হাসিতেছ যে বড়? কি বলিতেছ?—মিথ্যা কথা? মুখের আদর? মুখের বৈ কি। নতুবা অন্তঃপুরবদ্ধা দাসীবৎ করিয়া রাখ কেন? দাসীরও দাসীত্বের সময় আছে, দাসীরও প্রভুপরিবর্তনের ক্ষমতা আছে, দাসীরও বিষয়-বিশেষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু প্রাণের যে প্রাণ, জীবনের যে জীবন, ধর্মে যে বন্ধন, সংসারে যে শান্তিনিকেতন, গৃহে যে আকর্ষণীশক্তি—তার দাসীত্বের সময় অসময় নাই, তার দাসীত্বে প্রভুপরিবর্তন নাই, তার কোনও স্বাধীনতা নাই; সে জাগিতে ঘুমাইতে দাসী, সে উঠিতে বসিতে দাসী, সে চলিতে ফিরিতে দাসী, সে হাসিতে কাঁদিতে দাসী, সে ভক্তিশ্রদ্ধায় দাসী, সে হৃদয়ে-মনে দাসী। তার দাসীত্বের মোচন নাই, তার দাসীত্বের মূল্য নাই, তার দাসীত্বের প্রশংসা নাই। তাকে যত ইচ্ছা পোড়াইতে পার, যে অপমান ইচ্ছা করিতে পার, অতি জঘন্য ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার উপকরণমাত্র করিয়া রাখিতে পার। অপরের ক্রীড়ার পুতুল হওয়ার ন্যায়, যে অত্যাচারী, তাহারই বিলাস-সামগ্রী হওয়ার ন্যায়, অধঃপাত আর কি আছে? তাহারাও মানুষ, তোমরাও মানুষ— তাহাদের উপর এ আধিপত্য তোমাদিগকে কে দিল? শরীরের উপর অত্যাচার অধর্ম। ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার ততোধিক অধর্ম। কিন্তু হৃদয়ের উপর অত্যাচারের ন্যায় অধর্ম জগতে নাই। তোমরা কিসের উপর অত্যাচার না কর? তোমরা আপনাদের জন্য সহস্র বন্ধন রাখিয়া, তাহাদের সর্বস্ব, এক দুর্বল বন্ধনে বাঁধিয়া দাও। যে দীপ প্রতি মুহূর্তে নিবিতে পারে, যে নিহার-বিন্দু প্রতি সূর্যরশ্মিতে শুকাইতে পারে, যে লতা প্রতিপদে ছিঁড়িতে পারে, যে কুসুম প্রতি বায়ুহিল্লোলে বৃন্তচ্যুত হইতে পারে, যে জলবুদ্‌বুদ্‌ কথায় কথায় জল হইয়া যাইতে পারে, তাহার সঙ্গে তাহাদের সর্বস্ব বাঁধিয়া দাও! তোমাদের এক বন্ধন ছিঁড়ে, সহস্র বন্ধন থাকে। তাহাদের একটি মাত্র বন্ধন; সেইটি ছিঁড়িলেই সব ফুরাইল! সকল অর্থের যে সার, তার এই দুর্দশা—তোমার মুখের আদর নয়? তার পিতা-মাতা নাই, তার ভাই-বন্ধু নাই, ত্রিজগতে তার স্বামী বৈ কেহ নাই! যে দিন বিবাহ হইল, সেই দিন তার মনের সকল নদী স্বামীসাগরে পতিত হইল; স্বামীই পিতা-মাতা, স্বামীই ভাই-বন্ধু, স্বামীই ধ্যান-

জ্ঞান, স্বামীই সর্বস্ব, স্বামীই ইহলোক পরলোক, স্বামীই চতুর্বর্গ, স্বামিপাদোদক-পানই প্রধান কর্ম, স্বামিচরণসেবাই তার পরমধর্ম, স্বামি-মুখমণ্ডল তার সংসার-সাগরের তরণী, স্বামিচরণারবিন্দ তার ভবসাগরের ভেলা। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, সে বেশ; সে তোমার প্রতি বিরক্ত হইলেই নরকে যাইবে; কেন এত অত্যাচার? কেবল কথার ভালবাসা নয়? এ সুখসৌন্দর্যপূর্ণ সংসার সে দেখিতে পাইবে না কেন?

কথা কি জান, সকল বিষয়েরই দুই পার্শ্ব আছে। কিছুই একেবারে ভাল নহে—আলোকেও ছায়া আছে; কিছুই একেবারে মন্দ নহে—শোক হইতে সহৃদয়তা জন্মে। এ কেবল এক পার্শ্ব দেখানো হইল। জন স্টুয়ার্ট মীলও কেবল এক পার্শ্ব দেখিয়াছেন। এইজন্য, তাঁহার গ্রন্থে অসাধারণ শান্তির পরিচয় থাকিলেও সন্দেহ দূর হয় না। ইহার অন্য পার্শ্বও আছে। সমাজপদ্ধতি অনুসারে তাহারা দাসী বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বল দেখি, তাহারা আমাদের দাসী, না, আমরা তাহাদের দাস? ফল কথা, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের দাস, পরস্পর পরস্পরের প্রভু।

স্ত্রী এবং স্বামীর এই প্রকৃত সম্বন্ধ। আর, সুখ-সৌন্দর্যপূর্ণ সংসার দেখিতে পাইব না কেন? হা অদৃষ্ট! সংসার সুখসৌন্দর্যপূর্ণ হইলে দেখাইতে কে না চাহিত? তা নয় বলিয়াই তো দেখিতে দিই না। তাহারা যাহাতে ভাল থাকে, তাহাতে কি আমাদের অসাধ? সংসারের সুখ হইতে ধরিয়া রাখি, এ ইচ্ছা আমাদের নয়। আমাদের বাসনা, সংসারের সুখ হইতে অন্তরে রাখি! স্বাধীন হইয়া কি হইবে? আমরা যে দিবা-রাত্রি বুকে করিয়া রাখি, তাহা অপেক্ষা কি সংসার ভাল? আমরা যে মুখে ঘাম দেখিলে দশদিক অন্ধকার দেখি, মুখ মলিন হইলে মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে, চক্ষে জল দেখিলে তাহা মুছাইবার জন্য প্রাণ দিতে পারি—সংসারে কি ইহার অধিক আদর পাইবে? এ স্বার্থপর সংসারে ও কাঁচা মুখখানির পানে কে তাকাইবে? মনে অভিলাষের উদয় হইতে না হইতে, কে সে অভিলাষ পূরাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে? গৃহসরোবরে স্নেহ-সলিলে, আদরপবণে সোহাগের বাতাস তুলিয়া মাধুর্যের ধ্বজা উড়াইয়া, যে প্রমোদতরী নাচিয়া বেড়ায়, সেই ক্ষুদ্র প্রাণতরণী সংসার-মহাসাগরের উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল অতল জলরাশির উপর শোক-তাপ-দুঃখ-নৈরাশ্য-প্রবল-বাত্যা-সন্তাড়িত হইয়া বিলোড়িত হইবে, সে কি ভাল? যে বিষম অনলে আমরা অহর্নিশি মর্মে মর্মে পুড়িতেছি, সেই অনলে এই নবনীর পুতুল

পড়িবে, সে কি ভাল? যে চরণে কাঁটা ফুটিলে বুকে শেল বিঁধে, যাহাকে বুকের ভিতর বুক ঢাকা দিয়া রাখিয়াও, পাছে ব্যথা পায় বলিয়া, ভয়ে মরি, উঠিতে-বসিতে সহস্রবার চক্ষু চাহিয়া দেখি, মূর্তিমতী সুকুমারতা হিংসাদ্বেষে ক্লিষ্ট হইবে, জ্বালাযন্ত্রণায় ব্যাকুল হইবে—প্রাণ ধরিয়া কি ইহা দেখা যায়? আমরা মরি, তাহাতে দুঃখ নাই—তাহারা সুখে থাক্‌। তাহাদের সুখের সামগ্রী, আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন? এত যে জ্বালাতন হই, এত যে দুঃখ ভোগ করি, কিছুই তো মনে থাকে না—ওই চাঁদমুখ দেখিলে সব ভুলিয়া যাই! পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে নমস্কার করি, আমেরিকার দৃষ্টান্তকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি; আমরা কিন্তু হৃদয়ের নিধি হৃদয়ে রাখিব। হৃদেয় রাখিব, হাসিতে দেখিলে হাসিব, কাঁদিতে দেখিলে কাঁদিব—তাহার প্রতিদানে, কেবল ওই মুখখানি দেখিব! যখন রোগ-শোক-দুঃখ আসিয়া ব্যাকুল করিবে, তখন ওই মুখখানি দেখিব। যখন কোমল আকাশে তুমি উঠিয়া, আজিকার মতন এমনই সৌন্দর্য ছড়াইবে, তখন তোমাকে দেখিব, একবার ওই মুখখানি চাহিয়া দেখিব! যখন সংসারের কদর্য দেখিয়া দেখিয়া চক্ষে শেল বিঁধিবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া চক্ষু জুড়াইয়া লইব। যখন বাল্যসুখস্বপ্নসকল আবার জাগিয়া উঠিবে, বাল্য-ক্রীড়ার সঙ্গীদিগকে মনে পড়িবে, তখন একবার ওই মুখপানে চাহিয়া, ওইখানে সে সকল সমবেত দেখিব। যখন পরকালের চিন্তা আসিয়া উদয় হইবে, তখন আবার ওই মুখখানি দেখিয়া ভরসা বাঁধিব। যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া ওই চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিবে, তখন একবার ওই মুখখানি দেখিয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব শিখিব। আর যখন স্নেহময়ী, ভক্তি-প্রীতিময়ী ধৈর্য-সহিষ্ণুতাময়ী রোগীর রুগ্‌ণশয্যার শিয়রে বসিয়া, পরের জন্য আপনাকে ভুলিয়া যাইব, তখন আবার ওই মুখখানি চাহিয়া দেখিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসার উপদেশ লইব। ইহার অধিক প্রতিদান আর চাহি না। ইহার অধিক সুখ আর কি আছে। এমন পবিত্র নিধিকে যে বিলাসের উপকরণ মনে করে, রমণীকে যে জঘন্য পশুবৃত্তিচরিতার্থতার সামগ্রীমাত্র বলিয়া জানে, সে মূর্খ, সে নীচ, সে মনুষ্যনামের কলঙ্ক, সে নরাকারে পিশাচ। কিন্তু শশধর! তোমার কাছে কি বলিব মনে করিয়া আসিয়া-ছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি।

ঐ তো জ্বালা! দিবানিশি ভোর করিয়া রাখিয়াছে। আমার মন, কি জানি কি আনন্দে, কি জানি কি দুঃখে, কি জানি কি অবসাদে,

চিন্তাতরঙ্গিনীতে সাঁতার দিতে পারে না তো, কেবল স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া যায়। কি জানি কেমন চাঁদই যে হৃদয়াকাশে উঠে, সে দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া যায়। ভাসিতে ভাসিতে কতদূর চলিয়া যায়, তখন আমি আবার আমার মন পানে একমনে চাহিয়া থাকি। মনে হয়, বুঝি হারাইলাম। বোধ হয়, গেল গেল। মনের উপর স্বত্ব—তাহা তো অনেক দিন গিয়াছে; অধিকারটুকু আছে, তাও বা হারাইলাম! ঐ তো সংসারের কু। জিনিস হারাইয়া যায়। অতি যত্নে রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। চক্ষে চক্ষে রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। বুকে ধরিয়া রাখিলেও জিনিস হারাইয়া যায়। আবার এ দুর্গম অরণ্যে—এ গভীর সমুদ্রে জিনিস হারাইলে তাহার খোঁজই হয় না। যখন এ সংসারপ্রবাসে আসিয়াছিলাম, তখন জননীপ্রকৃতি, কত কি সঙ্গে দিয়াছিলেন —সরলতা, সহজপ্রফুল্লতা, স্থিতিস্থাপকতা, উৎসাহ, বিশ্বব্যাপিনী আশা, লীলাময়ী কল্পনা। প্রবাসে পাছে দুঃখ পাই বলিয়া কত সুখের সামগ্রী সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সে সব হারাইয়া গেল—এক এক করিয়া নহে, একেবারে সব গেল—সব ফুরাইল। সব যায়, কিছুই তো থাকে না—ফিরিয়া যাইবার সময় কেবল প্রবাস-যাতনার কাহিনী লইয়া যাই। জগদীশ! তুমি না কি মানবের পিতা? কিন্তু সন্তানের জন্য পিতার যে স্নেহ, তাহা আমার কৈ? জগৎ সংসারে এত দুঃখ দিয়াছ কেন? বিরহশ্বাস দিয়া মানবহৃদয় গড়িয়াছ কেন? কেবল রোদনের অভিনয় করিবার জন্য আমাদিগকে এ রঙ্গভূমিতে পাঠাইয়াছ কেন? তুমি দয়াময়। তুমি ইচ্ছাময়। তুমি সর্বশক্তিমান। অন্যে কি ভাবে জানি না; কিন্তু আমি ইহা বুঝিতে পারি না; দয়া, ইচ্ছা, শক্তি—তবে সংসারে দুঃখ কেন? সংসারে যে দুঃখ আছে, তাহা তো আর কেহ অস্বীকার করিবে না; সুতরাং ও তিনটি কথাই ভুল। তিনি দয়াময় হইলে, আমরা যখন দুঃখের ভারে মরিয়া যাই, তখন অবশ্য আমাদের দুঃখ-বিমোচনের ইচ্ছা করিবেন—নতুবা আর দয়া কি? দুঃখীর দুঃখ মোচনের ইচ্ছাই দয়া। সে ইচ্ছার প্রতিরোধ না থাকিলে অবশ্য তাহা কার্যে পরিণত হইবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোনো প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য কার্যে পরিণত হইবে। তাহা হয় না, মনুষ্যের দুঃখ ঘুচেনা, যে যাহার ভিখারী, সে তাহা পায় না; তাহাতেই বলি, তিনি সে ইচ্ছা করেন না। তিনি কিসের দয়াময়? আর যদি তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বে আমাদের দুঃখ দূর

না হয়, তবে তিনি কিসের ইচ্ছাময়? কিসের সর্বশক্তিমান? কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি।

জিনিস হারাইয়া যায়। হারাইলামই বটে। কিছুই তো একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কিছুরই তো ধ্বংস নাই। এ বিশ্বে, আজ যাহা উপস্থিত আছে, তাহা চিরকালই ছিল। এক পরামণুর ন্যূনাধিক্য নাই—কেবল সংযোগের বিশ্লেষ মাত্র—কেবল সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়। হরি হে! সম্বন্ধ ছুটিয়া যায় কেন? যায় তো একেবারে যায় না কেন? তাহার পর আবার অন্য সম্বন্ধ হয় কেন? সুখের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুটিয়া যায়, আবার দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কেন? ঐ সঙ্গে সকল সম্বন্ধ মিটিলে ভাল হয়।

পূর্ণিমার শশি, আর একদিন—এখন সেই দিন নাই—আর কখনও যে হইবে, সে আশাও নাই—বহুদিন হইল আর একদিন, মুক্ত বাতায়ন পথে এমনই হাসিয়া, ইহার অপেক্ষা সহস্র গুণ সৌন্দর্য ফুটাইয়া ঘরময় পড়িয়াছিলে, আমার প্রাণময় পড়িয়াছিলে। আর কিছুতেই কি পড় নাই? তবে অত সুন্দর, অত শীতল, অত প্রেমময়, অত পবিত্রতাময় লাগিয়াছিল কেন? আর যত দুঃখ থাক্, তখন একা নই। তোমার সঙ্গ যে বেশ মধুর, এ কথা শুনাইবার লোক ছিল। তোমাকে দেখিতে দেখিতে, যাহার দিকে চাহিয়া তোমাকে ভুলিয়া যাইতাম, সে এখন নাই। আজ আমি একা। এ জগৎসংসারে আর আমার জুড়াইবার স্থান নাই। একজনের অভাবে সব অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সেই একদিন, আর এই একদিন। ইহারই মধ্যে কত কি হইয়া গেল। ঈশ্বরের দয়ার বালাই লইয়া মরি! কত কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল, কত কুরঙ্গনয়নে অশ্রু ঝরিল, কত বিম্বাধর শুকাইয়া উঠিল, কত জীবন অন্ধকার হইল, কত হৃদয় শূন্য হইল, কত আলোক নিবিয়া গেল, কত নক্ষত্র অদৃশ্য হইল, কত চাঁদ—তোমার অপেক্ষা কত ভাল চাঁদ অস্তমিত হইল, কৈ আর উঠিল না! তুমি চাঁদ, যাও, আইস, আবার যাও, আবার আইস। আমাদের হৃদয়াকাশের চাঁদ যায়—জন্মের মতন যায়—আর ফিরিয়া আইসে না। এই মধুর সময়ে প্রাণাধিকে, একবার এসো দেখিবে; এই মধুর জ্যোৎস্নার উপর মধুতর জ্যোৎস্না ফুটাইয়া চক্ষের আগে একবার দাঁড়াও দেখি রে! এই যে হাসি অধর হইতে পলাইয়া গিয়া নয়ন-প্রান্তে লুকাইত, সেই ভুবনভুলানো হাসি একবার হাস দেখি রে! সেই যে কণ্ঠ-ধ্বনি, যাহার প্রত্যেক-শব্দ-প্রবর্তিত-বায়ু-তরঙ্গ কর্ণবিবর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ভিতর বীণা বাজাইয়া দিত; সেই কল-কণ্ঠে একবার কথা কও দেখি রে! সেই যে দৃষ্টি, যাহার সৌন্দর্য জগৎসংসারকে সুন্দর

করিত, সেই দৃষ্টিতে. এ-দগ্ধ-হৃদয়ের উপর একবার অমৃত বর্ষণ কর দেখি রে! সেই যে লাবণ্যলীলা, সায়াহ্নগগনের ন্যায় পলকে পলকে নূতন নূতন শোভা ধারণ করিত, সেই শোভায় এ তাপিত প্রাণ একবার জুড়াও দেখি রে! এত ভালবাসায় যে বিচ্ছেদ হইবে, ইহা কখনও মনে ছিল না। তোমা ছাড়া হইয়া যে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানি না। কিন্তু শশি, মেঘের অন্তরালে লুকাইলে কেন? দেখ, আমার হৃদয়াকাশে একখানি করাল জলদ দেখা দিয়াছে—কখনও গর্জে না, কেবল অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। দুঃখ হইলে পৃথিবীর লোক কাঁদে আমি কাঁদিতে পাই না; চক্ষের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—হৃদয়ের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে—একবিন্দু জল নাই। অশ্রুপ্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে না কি, কাঁদিতে পাই না। তাই মরিতে ইচ্ছা হয়। তোমার শুভ্ররশ্মিতরঙ্গে ডুবিয়া মরা হয় না? মেঘে মুখ ঢাকিয়া রহিলে যে? এই অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ডুব দেওয়া হয় না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না অপেক্ষা এই অপরিস্ফুট কৌমুদী, এই ঈষদন্ধকারযুক্ত জ্যোৎস্না, আমি বড় ভালবাসি—আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে ভাল। কিন্তু শশাঙ্ক, আর কি মুখ খুলিবে না? তবে আর কি জন্য বসিয়া থাকি? এখন যাই। এত যখন মনের কথা হইল, তখন আর ভুলিব না—আবার সময় পাইলেই তোমাকে দেখিতে আসিব। এমনই সংগোপনে আসিয়া দেখিয়া যাইব! কেবল চক্ষের দেখা—তা চক্ষের দেখাই দেখিয়া যাইব। সকল ইন্দ্রিয়কে চক্ষুতে আনিয়া, একবার—একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া যাইব! আমার এ দুঃখময় জীবনে, ঐ সুখ! এমনই মৃদু পবনে, এমনই নির্জনে, এমনই গভীর নিশায়, এমনই নীরবে. এমনই করিয়া একা আসিয়া তোমায় দেখিয়া যাইব। একা আসিব, কেননা, দুঃখ স্বার্থপর—কেননা, যে দুঃখী, সে নির্জন ভালবাসে। আর যে দিন বড় সুন্দর সাজে সাজিবে, সোহাগের বড় বেশি ছড়াছড়ি করিবে, সে দিন ঐ সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেখিতে সঙ্গে-সঙ্গে একবার কাঁদিয়া যাইব। রোদনে যে এত সুখ, তাহা পূর্বে জানিতাম না। যে না জানে. সে আছে ভাল। জানি না কতদিনে এ হাহাকার ঘুচিবে!

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"। ১২৮২ বঙ্গাব্দ

নক্ষত্রদের বৌ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

খোক্কশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া শুনিল। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, যদি এই কার্জটি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটিও আমাদের হাতছাড়া হইবে না।

মাসী বলিল, "বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন পৃথিবীর অর্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটি মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী, তুমি এক কর্ম কর। তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুনকাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুনকাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়। তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুনকাম করিয়া দিলে ছুঁড়ী আর আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

দুইজনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল। ঝুড়ি হু হু শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরী মাসী চুনকাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময়ে মশা দেখিলেন যে সেখানে একটি ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটি সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোক্কশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কশের গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন, "কি হইল? আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী খোক্কশ আপনার বাচ্চা চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে। একে রাত্রি. তাতে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোক্কশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ংকর চীৎকার করিয়া ধাড়ী খোক্কশ বলিল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউরে, মনুষ্যের গন্ধ পাঁউরে! কেরা তোরা. এদিকে আসিস?"

মশা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

খোক্কশ বলিল, "আমি আবার কে? আমি খোক্কশ!"

মশা বলিলেন, "আমরা আবার কে? আমরা ঘোক্কশ!"

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কশের ভয় হইল। খোক্কশ বলিল, "বাপ রে! তবে তো তোরা কম নয়? ক খ গ ঘ, আমি খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুই পইঠা উঁচু! আচ্ছা. কেমন তোরা ঘোক্কশ, একবার কাশ দেখি, শুনি?"

মশা তখন সেই ঢাকটি ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কশ বলিল, "ওরে বাপরে! তোদের কাশির কি শব্দ! শুনলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কশ বটে!"

খোক্কশ কিন্তু কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! তোরা কেমন ঘোক্কশ, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছিগাছটি ফেলিয়া দিলেন। খোক্কশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শেষে বলিল, "ওরে বাপ রে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্তু খোক্কশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া খোক্কশ পুনরায় বলিল, "আচ্ছা তোরা যদি ঘোক্কশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?"

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন, "হাতী ভায়া! এইবার!"

এই কথা বলিয়া মশা হাতীটিকে ধরিয়া খোক্কশের গর্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্তে পড়িয়া হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ধরিলেন। খোক্কশের বাচ্ছা 'চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দে ডাকিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোলপাড় করিয়া ফেলিল। শুঁড়-বিশিষ্ট পর্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কশের

প্রাণ উড়িয়া গেল। খোক্কশ ভাবিল, তোদের মাথার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটিকে ধরিল, ঘোক্কশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে! এই মনে করিয়া খোক্কশ বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্তের নিকটা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ, চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় এখানে আসিবে! তোমার প্রতীক্ষায় আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে আমরা খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ফিরিয়া দিব। কারণ, এখন এ স্তন্যপান করে, অতি শিশু। ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দুর্দণ্ড সিপাহীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি সে অতি ভয়ংকর দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সিপাহী। সাবধানে আকাশে উঠিবে।"

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন, "কঙ্কাবতী, আমার কিছু আশ্চর্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালোমেঘে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয়ত তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য উদ্ধার করিবে।"

কঙ্কাবতী খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন; দ্রুতবেগে খোক্কশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশ চুন-কাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরূপ চুনকাম করিয়া কে দিল?

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান না। যে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুনকাম। আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চুনকাম। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, ঘোর বিপদ্! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?

হতাশ হইয়া আকাশের চারি ধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটি সামান্য ছিদ্র দেখিতে

পাইলেন। সেই ছিদ্রটি দিয়া নক্ষত্রদের বউ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটির নিকট যাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বউ একবার লুকাইল; পুনরায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিলেন. "ওগো নক্ষত্রদের বউ! তোমার কোনও ভয় নাই। আমিও মেয়েমানুষ, আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন বাছা?"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "কে গা মেয়েটি তুমি? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক, আমি বউ-মানুষ, সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি? তাতে রাত্রিকাল। একটু আস্তে কথা কও বাছা! আমার ছেলে-পিলেরা সব শুয়েছে, এখনই জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো নক্ষত্রদের বউ! আমার নাম কঙ্কাবতী। আমি পতিহারা সতী, আমি বড় অভাগিনী। আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে বাছা, পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা, তুমি যদি পথটি বলিয়া দাও তো আমার বড় উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে? এই সন্ধ্যাবেলা এক বেটী ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চুনকাম করিয়া দিয়াছে। তা যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।"

এই কথা বলিয়া. নক্ষত্রদের বউ চুপি চুপি আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

"কঙ্কাবতী"। ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

মুখ-চেনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাস্তায় বাহির হইলে কত রকম ধরনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়; কোনো মুখ দেখিলে কাছে যাইতে ইচ্ছা করে—কোনো মুখ দেখিলে পলাইতে ইচ্ছা হয়। কোনো মুখ দেখিলে মনে হয় সে হাজার অপরাধী হউক, সে যেন আমার কত দিনের জানা-শুনা, আবার কোনো মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন আমাদের মারিতে আসিতেছে, না খাইতে আসিতেছে।

কত রকম নাক দেখিতে পাওয়া যায়। কোনোটা খাঁদা, কোনোটা তোলা—কোনোটা সোজা—কোনোটা বাঁকা। কোনো নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বেশ শৌখীন—কোনো নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বড় জাঁহাবাজ।

যাহারা ভাল করিয়া কিছুই দেখে না তাহারা মনে করে, সব মানুষের ঠোঁট প্রায় একরকম। কিন্তু ঠোঁটের কত রকম গড়ন দেখা যায়। কোনো ঠোঁট দেখিলে মনে হয় স্নেহের চুম্বনে গড়া। কোনো ঠোঁট দেখিলে মনে হয়, লোকটা বড় খট্‌খটে, তার স্নেহমমতা কিছুই নাই।

একজন লোককে দেখিবামাত্রই তার সম্বন্ধে একটা-না-একটা ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। লোক-চেনার অভ্যাস ভাল রকম না থাকিলে অনেক সময় আমরা ভুল করিতে পারি। ভাল লোককেও মন্দ মনে করিতে পারি, মন্দ লোককেও ভাল মনে করিতে পারি। লোক চেনাও বড় সহজ নয়। কতকগুলি অক্ষর ও তাহার যোগাযোগে যত বাক্য হয় তাহা শিখিলে যেমন আমরা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখ-চিহ্ন দেখিয়াও আমরা মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্র এত বিভিন্ন যে তাহার অনুরূপ মুখের গঠন-চিহ্নও অসংখ্য। তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। সেইজন্য পণ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই বিষয় অনুশীলন করিয়া তাঁহারা যে সকল চিহ্ন ও নিয়ম বাহির করিয়াছেন তাহা সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষায় আমোদও আছে, উপকারও আছে।

কারবারের অধিকাংশ কাজ বিশ্বাসে বিশ্বাসে চলে। যাহাদের লোক চিনিবার অভ্যাস নাই তাহারা, যে কাজের যে উপযুক্ত তাহা বুঝিয়া লোক

রাখিতে পারে না, হয়তো অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এইরূপ করিয়া কত লোকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়। এইরূপ মুখ-পরীক্ষার আর একটি সুফল আছে। আমরা বাঙ্গালী, আমরা চতুর্দিকে যাহা দেখি, কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। সব জিনিসই যেন আমরা চোক বুজিয়া দেখি। সম্প্রতি কলিকাতায় যে মহামেলা হয় তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক তো গিয়াছিল, কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি, অমুক জিনিসটা কিরূপ দেখিলে--অমনি চক্ষুস্থির। কেহ হয়তো বলিবে "বেশ দেখিলাম, চমৎকার দেখিলাম, এমন ভাল যে না দেখিলে বুঝানো যায় না"; কেহ বলিবে, "তাতে এমন একটা ইয়ে আছে যে ইয়ে হয়ে সেটা কিছুতেই ইয়ে করা যায় না।" একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি প্রত্যেক জিনিসের তন্ন তন্ন বর্ণনা করিবেন—একটি খড়িকা পর্যন্ত তিনি ছাড়িবেন না। তাই বলিতেছি যদি এই মুখ-পরীক্ষায় আর কোনো ফল না হয়, অন্ততঃ খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার অভ্যাসটি হয়। এইবার তবে আসল বিষয়ে আসা যাক।

কপাল যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধি দুই রকম। একটি হইতেছে—খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার ক্ষমতা; আর-একটি —আলোচনা ও চিন্তা করিবার ক্ষমতা।

কপালের উপরভাগে চিন্তা-শক্তি অবস্থিত।

চিন্তা-শক্তি—অর্থাৎ তুলনা করিবার শক্তি, বস্তু-সকল পৃথক করিয়া দেখিবার শক্তি, শ্রেণীবিভাগ করিবার শক্তি, এবং কার্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি। যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু—তাহাদিগের এই চিন্তাশক্তি প্রবল।

কপালের নীচের ভাগে, খুটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ-শক্তি অবস্থিত। এই শক্তি যাহাদিগের প্রবল তাহাদিগের সমস্ত পৃথিবী দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা হয়, ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয় এবং সকল তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয়। এই শক্তি ডারুইন ও জন্ স্টুয়ার্ট মীলের অত্যন্ত প্রবল ছিল।

কপালের মধ্যভাগ ভরা থাকিলে, ঘটনার স্মরণশক্তি প্রকাশ পায়।

যদি কপালের উপরের ভাগ নীচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হয় তাহা হইলে এই বুঝায় যে সেই লোকের যতটা বেশি চিন্তাশক্তি ততটা পর্যবেক্ষণ-শক্তি নাই। বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনে তাহার বেশি ঝোঁক—ধরা ছুঁয়া যায়

এরূপ লৌকিক বিষয় অপেক্ষা সৃষ্টিছাড়া আসমানি চিন্তায় তাঁহার অধিক আমোদ। অধ্যাপক Owen কতকটা ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

উপরিভাগের কপালের পাশের দিক যাঁহার বেশি বড় হয় তাঁহার কারণ অনুসন্ধানের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা ও হাসি-তামাশার ভাব প্রবল। এই ভাবটি থাকিলে, যাহা কিছু হাস্যজনক বা অদ্ভুত সহজেই তাহার মর্ম গ্রহণ করা যায়। এবং বর্তমান সমাজের কুপ্রথা লইয়া বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা যায়। স্টেরু, হোগার্থ, হুড্ ও বঙ্কিমবাবু ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

আরও উঁচুদিকে ও পশ্চাদ্দিকে যদি কপাল প্রশস্ত হয় তাহা হইলে কল্পনাশক্তি কবিতাশক্তি বা শিল্পশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেক্সপিয়ার, গেত্তে, র্যাবেল, ডোরে প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

কপালের মধ্যস্থলে কসি-টানা বলি-রেখা থাকিলে বুঝায় যে যাহার উহা আছে, সে ব্যক্তি লোকের উপকার সাধনে রত। দুই ভুরুর মধ্যভাগে যাহার দাঁড়ি-টানা বলি-রেখা আছে, সে লোক খাঁটি ও সত্যপরায়ণ।

যাহার নীচের দিকের কপাল অত্যন্ত ছোট এবং মনে হয় যেন ভিতরে বসা, সচরাচর চলিত ঘটনা ও তথ্য সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত ভাসা ভাসা জ্ঞান এবং আপনার দোষের প্রতি সে ব্যক্তি অন্ধ। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই হতভাগ্য দুরদৃষ্ট ও অকৃতকার্য হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকের পদার্থ দেখে না—এবং চারিদিককার পদার্থ তাহাদিগের মনের উপর ভাল করিয়া বসে না। এইজন্য তাহারা ক্রমাগত ভুল করে এবং প্রায়ই আপনার দুর্দশার জন্য অন্যকে দোষী করে। এই সকল লোকের ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দেওয়া উচিত নহে। পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে বলবতী করিয়া তবে কাজকর্মে প্রবেশ করা উচিত। নতুবা পরিণামে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

প্রশস্ত উচ্চ এবং ভরা কপাল হইলে, বিশেষতঃ তাহার সহিত যদি দৃঢ় ওষ্ঠ থাকে এবং পরিষ্কার তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকে, তাহা হইলে উন্নতিশীল, সর্বগ্রাসী দার্শনিক, সমাজ-সংস্কাররত এবং বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত মন সূচিত হয়। যেমন, বেন্থাম মীল কব্ডেন, বিদ্যাসাগর।

সংস্কারকগণ মাত্রেরই কপাল উচ্চ প্রশস্ত এবং ভরা-ভরা।

ছোটবেলায় কব্ডেনের কপাল বড় প্রশস্ত ছিল না, কিন্তু লোকের জন্য খাটিতে খাটিতে এবং বুদ্ধি চালনা করিয়া তাঁহার জীবনের শেষভাগে তাঁহার কপাল বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাদিগের কপাল অত্যন্ত নীচু তাহাদিগের স্নেহ মমতা, চরিত্রের

উদারতা কম। যাহাদিগের কপাল উচ্চ এবং খোলারকম মুখের ভাব তাহারা পরোপকারে রত এবং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয় না। যেমন বিদ্যাসাগর।

এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। রাজনারায়ণবাবু ও বঙ্কিমবাবু। যাঁহার দাড়িগোঁফ আছে তিনি রাজ-নারায়ণবাবু; যাঁহার দাড়িগোঁফ কামানো দেখিতেছ তিনি বঙ্কিমবাবু। ইঁহাদের কপাল লক্ষ্য করিয়া দেখ। উভয়েরই কপাল উৎকৃষ্ট। রাজনারায়ণ-বাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এইজন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারায়ণবাবুর বেশি ঝোঁক। ইহার ফল—তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ "ধর্মতত্ত্ব দীপিকা।" রাজনারায়ণবাবুর মধ্যকপালও ভরা-ভরা—ইহাতে ইঁহার ঘটনার স্মরণশক্তি সূচিত হইতেছে। এইজন্য ইতিহাসে তাঁহার বিলক্ষণ দখল আছে এবং ছোট ছোট রাশি রাশি ঘটনার গল্প তিনি অজস্র করিতে পারেন এবং তাঁহার লেখাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার লেখা "সেকাল-একাল" তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার উপর-দিককার কপাল ভর-পুর থাকায় তাঁহার নানাপ্রকার মতলব (plan) মাথায় আইসে—এবং নীচের দিককার কপাল ততটা ভরাট না থাকায় এক এক সময়ে সে সব মতলব অনেকটা আস্‌মান-বিলাসী ও সৃষ্টিছাড়া হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ-শক্তি, সমালোচনশক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইঁহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোটখাট জিনিস খুব ইঁহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্ব-জ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিতেন। বিশ্লেষণ-শক্তি, পর্যবেক্ষণ-শক্তি অধিক পরমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানবচরিত্রের ও বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানবচরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল তাঁহার নাকের জোরে। রাজানারায়ণ-বাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী বুদ্ধি, সূক্ষ্মরুচি

ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় এবং রাজনারায়ণবাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও স্বপ্নভাব প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস আছে। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ-নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুকিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুলা দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জনস্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে। বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের সহিত আমাদের একথা মেলে কি না আমরা ঠিক বলিতে পারি না। চোখ নাক ঠোঁট প্রভৃতি মুখাবয়বের কি কি লক্ষণে কি কি ভাব প্রকাশ পায় তাহা পরে লেখা যাইবে।

কপাল সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম বলিয়া কপালের কথাটা শেষ করা যাক। যার কপাল যত গড়ানে, তার চিন্তাশক্তি, বিবেচনা-শক্তি সেই পরিমাণে কম। তারা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে।

এখন চোখ ও ভুরুর কথা বলা যাক। সমস্ত মুখাবয়বের মধ্যে চোখে যেমন ভাব প্রকাশ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। একজন কবি বলিয়াছেন, চোখ হচ্ছে "আত্মার গবাক্ষ"। একথা খুব ঠিক। ছবি আঁকিবার সময় দেখা যায়—একটু আধটু চোখের রেখার ইতরবিশেষে মুখের ভাব কতটা বদ্‌লিয়া যায়। আমাদের দেশের কবিরা আমাদের সুন্দরীদিগের নেত্র হরিণ-নেত্রের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কারণ হরিণের ড্যাবা ড্যাবা চোখে চকিত ভয়ের ভাব সুন্দর প্রকাশ পায়। লজ্জা ভয় আমাদের স্ত্রী-সৌন্দর্যের প্রধান উপকরণ বলিয়া এই উপমাটি ঠিক খাটিয়াছে। চোখ দেখিবার সময়, প্রথমে দেখা উচিত চোখ ছোট কি বড়। শরীরতত্ত্বের এই একটি সাধারণ নিয়ম, যার যত বড় চোখ, তার সেই পরিমাণে দৃষ্টিশক্তি অধিক। এইজন্য হরিণ, কাঠবিড়ালী, খর্গস, বিড়াল ইহাদের চোখ্ বড়; আর, শুয়োর, গণ্ডার প্রভৃতির চোখ ছোট এবং তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কম। হরিণের চোখ কত বড়, আর শুয়োরের চোখ কত ছোট। যেমন শরীরতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে চোখের আয়তনের উপর দৃষ্টিশক্তির তারতম্য নির্ভর করে, তেমনি মুখ-চেনা বিদ্যার মতে চোখে বুদ্ধিবৃত্তির উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়—বিশেষতঃ সামাজিক ভাবের ধর্মভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যাহাদিগের বড় চোখ তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয় যেন তাহারা

খুব "জাগ্রত জীবন্ত" এবং কার্যের জন্য সদাই উন্মুখ। আর যাদের ছোট চোখ তাদের দেখিলে মনে হয় যেন তাদের শরীর-মনে কেমন একটা জড়তা অলসতা ও ঘুমন্ত ভাব আছে। ডাক্তার রেড্‌ফীল্ড বলেন যে, যাহাদের চোখ বড় তাদের চঞ্চল হৃদয়ে ভাব-লহরী খেলিতে থাকে, তাদের চিন্তাক্রিয়া খুব দ্রুত, আর তারা খুব তড়বড় করিয়া কথা কহে। আর যাদের ছোট চোখ তাদের ভাব ইহার বিপরীত। যাদের বড় চোখ তারা একটু সাদাসিদে খোলা রকমের লোক—তাদের মনের ভাব কথায় স্বতই প্রকাশ হয়; আর, যাদের চোখ ছোট তারা ভাবিতে দেরি করে ও সাত পাঁচ ভাবিয়া একটি কথা কহে—ও তাহারা স্বভাবতঃ একটু কুটিল।

চোখে ভাষাশক্তি প্রকাশ পায়। যাদের চোখ বাহির দিকে ও নীচের দিকে বের-করা ফুলো-ফুলো ও বড় তাদের ভাষাশক্তি বিলক্ষণ আছে, কথার উপর তাদের খুব দখল, তারা উপস্থিত-বক্তা ও দ্রুত লেখক। বের-করা চোখে বহির্বস্তুর ছবি সহজে পড়ে। যাদের এই প্রকার চোখ তারা একদৃষ্টিতে সাধারণভাবে সমস্ত পদার্থ দেখিয়া লইতে পারে—কিন্তু তাহারা প্রত্যেক বস্তু তেমন খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে পারে না। যাদের চোখ ভিতরে ঢোকা তারা যাহা দেখে তাহা খুব ঠিক করিয়া দেখে, খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। কিন্তু তারা তেমন চট্ করিয়া ভাবগ্রহণ করিতে পারে না। ফুলো চোখ ও কোটরে চোখের এই প্রভেদ।

সুন্দর চোখগুলি প্রায় লম্বাদিকে খোলা—চওড়া দিকে ততটা খোলা নয়। চোখের উপরের পাতা ও নীচের পাতা চওড়াভাবে বিস্তৃত হলে—চোখটাকে কেমন গোল দেখায়। যেমন বিড়ালের চোখ কিম্বা পেঁচার চোখ। তাহারা অল্প আলোয় অনেক দেখিতে পায় ও সহজে বহির্বস্তুর ভাবগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ভাব সকল তেমন স্পষ্ট ও ঠিক হয় না—আর, যাদের চোখের পাতা চোখের উপর পড়িয়া চোখকে একটু ঢাকিয়া রাখে, তারা যদিও বহির্বস্তুর ততটা শীঘ্র ভাবগ্রহ করিতে পারে না কিন্তু তাহারা যে ভাবগ্রহ করে তাহা বেশি ঠিক ও স্পষ্ট হয়। গোল চোখো লোকেরা অনেক দেখে কিন্তু কম ভাবে। আর যাদের চোখ দীর্ঘায়ত তারা বেশি ভাবে ও বেশি তীব্ররূপে অনুভব করে। যাদের বড় বড় গোল চোখ তারা আমুদে, বুদ্ধিমান—উজ্জ্বল ভাবাপন্ন —খোলা—ও তাদের মন উঁচু দরের। কিন্তু দীর্ঘায়ত কিম্বা প্রশস্তচক্ষু লোকদিগের ন্যায় তাহাদের তেমন গভীরতা বা উদ্ভাবনা-শক্তি নাই।

যাদের চোখ পিটপিটে, মিটমিটে তারা ভারি ধূর্ত।

যাদের চোখ পটল-চেরা ও টানা তারা খুব মমতাময় ও শৌখীন। যাদের চোখের উপরের পাতা বড় ও চোখও একটু দীর্ঘায়ত তাদের চোখে কেমন এক প্রকার ঢুলুঢুলু স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ পায়।

যাদের চোখের তারা সমস্তটাই দেখা যায়—তারার উপরে ও নীচে সাদা বেরিয়ে থাকে, তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল, অস্থির, রাগী ও অবিবেচক। লাবেটার বলেন, "রস-কস্-হীন একটা সামান্য মুখে যদি খোলা প্রশস্ত ও বাহিরে-বের করা চোখ থাকে তবে তাহাতে এই সূচিত হয় যে সেই লোকের দৃঢ়তা অপেক্ষা একগুঁয়েমী বেশি, সে অত্যন্ত ভোঁতা ও নির্বুদ্ধি—কিন্তু বিজ্ঞতার ভাণ করে; আসলে হৃদয়হীন কিন্তু আপনাকে হৃদয়বান বলিয়া লোকের কাছে জানাইতে ইচ্ছা করে। এক এক সময়ে হঠাৎ তাহার ভাবের তীব্রতা হয়—কিন্তু উহা হৃদয়ের স্থায়ী স্বাভাবিক ভাব নহে।"

চোখের স্থায়ী সাধারণ ভাব-প্রকাশক চিহ্ন সম্বন্ধে মোটামুটি দুই চারিটি কথা বলা গেল। তারপর হাসি কান্না রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, চোখের ভাবের কি প্রকার পরিবর্তন হয়, তাহা এ প্রস্তাবে উল্লেখ করিলে বাহুল্য হইয়া পড়িবে। তাই আপাততঃ ক্ষান্ত হওয়া গেল।

ভুরুর যোগে চোখে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ হয়—এইজন্য ভুরুর বিষয় এখানে একটু বলা আবশ্যক।

নানা রকমের ভুরু সচরাচর দেখা যায়। কারও ভুরু ঘন, কারও সরু, কারও সূক্ষ্ম কারও স্থূল, কারও মসৃণ কারও কর্কশ, কারও সোজা কারও ধনুকের মত বাঁকা, কারও বা ভুরু টেরাভাবে কতকদূর উঠিয়া আবার ঢালু হইয়া নামিয়াছে।

সাধারণতঃ বাঁকা ভুরুতে মেয়েলি ভাব ও সোজা ভুরুতে পুরুষ চরিত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাঁকা ভুরু, সোজা ভুরু অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বেশির ভাগ বাঁকা ভুরু দেখা যায়।

যদি ভুরু ধনুকের মত বাঁকা হয় এবং যাহার ঐরূপ ভুরু সে যদি উহা কুঞ্চিত করিয়া ঘন ঘন উপর দিকে উঠায়, তাহা হইলে এই প্রকাশ পায় যে, সে ব্যক্তি গর্বিত, ভাবুনে, অত্যাকাঙ্ক্ষী, সৌন্দর্যানুরাগী ও সে খুব জাঁকজমক ভালবাসে।

নীচু, বাহিরদিকে ঝোঁকা, বারন্ডা-বেরকরা ভুরুতে বিচারশক্তি, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, চিন্তার গভীরতা ও গবেষণা-শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ডারুইন,

গ্লাডস্টোন, সর্ উইলফ্রিড লসন, লিবিংস্টন প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক-দিগের এইরূপ ভুরু।

ভুরু চোখের কাছাকাছি থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা, গভীরতা, একনিষ্ঠা প্রকাশ পায়।

আর, চোখ হইতে ভুরু যার যত ঊর্ধ্বে থাকে সেই পরিমাণে তার চপলতা, উদ্যম-অধ্যবসায়ের অভাব প্রকাশ পায়।

যাদের ভুরু খুব পাতলা ও চোখ হইতে দূরে তাদের হৃদয়ের আগ্রহ ও শক্তি কম। যাদের এইরূপ ভুরু তারা কখনোই দৃঢ়মনস্ক, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন কিম্বা গভীর চিন্তাশীল হয় না।

সূক্ষ্ম ও সমান ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার ঐরূপ ভুরু তাহার মন উচ্চ ভাবাপন্ন, বাহ্য বিষয়ের ভাব সহজে ও শীঘ্র তাহার মনে অঙ্কিত হয়—বুদ্ধি পরিষ্কার, ও চরিত্রে সামঞ্জস্য-ভাব আছে। ভুরু সূক্ষ্ম অথচ অসমান হইলে, বিরক্তি-প্রবণতা ও উত্তেজনাশীলতা প্রকাশ পায়।

ঘন ও খুব স্পষ্টব্যক্ত ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার এইরূপ ভুরু তাহার শরীরে অস্থি ও মাংসপেশীর প্রাবল্য—তাহার চরিত্রের বল ও সহিষ্ণুতা আছে—অধ্যবসায়, মনের আগ্রহ এবং বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা আছে।

এই প্রকার ভুরু আবার যদি কর্কশ হয়, স্থূল হয়, অসমান হয়, তাহা হইলে ইহাতে চরিত্রের অসামঞ্জস্য, হৃদয়ের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। ভ্রূযুগল পরস্পর হইতে খানিকটা ছাড়াছাড়ি করিয়া থাকিলে ইহাই প্রকাশ করে যে, যাহার ঐরূপ ভুরু তাহার হৃদয়ভাব খুব তীব্র—তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ খুব দ্রুতগামী এবং বাহ্যবিষয় তাহাদের মনে শীঘ্র অঙ্কিত হয়।

"প্রবন্ধমঞ্জরী"। ১৩১২ বঙ্গাব্দ

মা ন

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রাণ অতি তুচ্ছ গণি, প্রাণাধিক মান।" হে রাম! এমন কুশিক্ষাও কি আর আছে। এমন ভ্রমপূর্ণ কথাও লোকে উপদেশস্থলে বলে! কোথায় অমূল্য, অতুল্য, পরম যত্নের, পরম সমাদরের প্রাণ—আর কোথায় ছেঁড়া ন্যাকড়া মান। ছি ছি! প্রাণের কাছে, ধনের কাছে, মানের কথা কি তুলিতে আছে?

যেমন গামছা ধুতি, ছড়ি ছাতি, তেমনি মান—দাম দিলেই পথে ঘাটে হাটে মাঠে যত চাই, ততই পাই। তাই যে খুব দরে চড়া, তাহাও নয়; টাকাকড়ির তো কথাই নাই, একটু ভাণের বদলেই মান পাওয়া যাইতে পারে। "আপনার মান আপনার ঠাঁই"—কেবল যার যত্ন নাই, সাধ নাই, ইচ্ছা নাই, তারই মান নাই। নহিলে মানের জন্য আবার ভাবনা?

হারাধন মান হারাইয়াছে, আর হারাধনের মুখ দেখাইবার জো নাইঃ—হয়, ইহা স্বার্থপর শঠের কথা, নয় বুদ্ধিহীন ঘটের কথা; যাহারই হউক, ভদ্রলোকের অগ্রাহ্য, শুনিবার যোগ্যই নহে। কিছু পাইয়া, কিম্বা কিছু পাইবার আশায় যদি হারাধন এই অকিঞ্চিৎকর মান দু দিনের তরে হারাইয়াই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা এমন কি হইল? আজি মান গিয়াছে, আবার কাল মান হইবে; তবে আর মুখ দেখানো বন্ধ হইতে গেল কেন? জুতার সুখতলা হারাইয়াছে, তোমার আর লোকের সম্মুখে বাহির হওয়া উচিত হয় না। সুখতলার অভাবে তবু পায়ে লাগে। আর, মানের অভাবে? —কৈ, আহারেরও ব্যাঘাত নাই, নিদ্রারও বিঘ্ন নাই।

শঠের কথা বলিতেছিলাম, আর নিপট নির্বোধের কথা বলিতেছিলাম। ইহারা বলে, মান গেলেই সব গেল। খাঁটি জানিবে, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিতেও যে ব্যক্তি এমন কথা বলে, সে বড় সহজ লোক নয়; হয় সে মানের দালাল, খরিদদার জুটিলেই তাহার লাভ; নয় তো সে কোনো দালালের হাতে পড়িয়া আপনি ঠকিয়া এখন বারেন্দ্রাগিরি ধরিয়াছে; তোমাকেও ঠকাইয়া আপনার পর্যায়ে বসাইবার—ভুক্তভোগী করিবার চেষ্টায় আছে। তাই বলিতেছি, ইহারা স্বার্থপর শঠ, ইহাদের কথায় ভুলিও না, ঠকের কাছে ঠকিও না।

যাহাতে মানের দর বাড়ে, মানের কদর বাড়ে, তাই করাই ইহাদের বৃত্তি ব্যবসা। আর, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও, ইহারা কবির দলে দিন-মজুরীর দোয়ার, গান বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রাণপণে চেঁচাইয়া দিলেই ইহারা বাহাদুরি মনে করে। ডার্বিন বলিলেন—বানরের বংশেই ক্রমে মানুষ হয়; নির্বোধের দল ধুয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—ঐ কথাই ঠিক, আমরা দেখিয়াছি আমাদের সাক্ষাৎ বাবা বানর ছিলেন। তাই বলিতেছি, নির্বোধের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে যাহা ধরাইয়া দিবে, তাহাই তাহারা ধরিবে। এই এতকাল কেহ বলে নাই, আমি আজি নূতন বলিতেছি—মান নিতান্ত অপদার্থ সামগ্রী। দেখিও আভাস পাইবামাত্র কাকের পালের কলরবের মত এখন ঐ রবই শুনিতে পাইবে—মান অতি অপদার্থ সামগ্রী।

ফলে শঠের কাঠে সাবধান! কি রাজদ্বারে, কি কারাগারে, ইহারা সর্বত্রই আছে; সেই পঞ্চমের উপর গলা চড়াইয়া ডাকিতেছে—চাই মা—ন, বড় মান, খুব মান, সম্মান। ডাকুক, তায় ভুলিও না, তোমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইবার ফিকির। তমঃসুক লিখিয়া তোমার কাছে কেহ কর্জ করিতে আসিলে তোমাকে "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত—" সম্বোধন করে; তুমি তখন মনে করিতেছ সে ব্যক্তির অপমান, আর তোমার সম্মান, উভয়েরই সীমা নাই; কিন্তু তোমার লাভ—কাগজ, তাহার—টাকা। বল দেখি, কে ঠকিল? বল দেখি, মান ভাল, না অপমান ভাল? তাই বলিতেছি যে, যে টাকা কয়টি রাখিয়া দিতে পারিলে, তোমার সংবৎসরের অন্নচিন্তা কমিবে, মান কিনিতে যেন তাহা হাতছাড়া করিও না। বুঝিলে তো? তোপ মারিলেও না! আপনি বাঁচিলে হাজার তোপ! সেইরূপ আঁখর দিয়া বলিলেও ভুলিও না; কীর্তন গাইবার সময়ে আঁখর দেয়, মন ভুলাইবার জন্য; তাহা তো জান? আমার কথা না শুনিলে আখেরে কাঁদিতে হইবে।

মান যে কত সুলভ, মান যে আপনার হাতে, সেটা একটু দেখাইয়া দিই; নহিলে তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। চেয়ে চিন্তে একটু লম্বা কোঁচা, পায়ে মোজা, ফর্সা জামা, আর ভৃত্য শ্যামা—সঙ্গে করিয়া যেখানে যাইবে, সেইখানেই তোমার মান; তুমি আপনাকে আপনি বাবু বলিলে বাবু, বাহাদুর বলিলে বাহাদুর, রাজা বলিলে রাজা; তাহাতে তোমার অন্য বাবুগিরি চাই না, সত্যিকার প্রজার পুরী চাই না, চাই-কি ভাল মানুষকে ভেড়া করিয়া তুমি দশ টাকা নগদও হস্তগত করিতে পার। আবার সেই টাকাতে কত ইয়ার, কত ডিয়ার লইয়া কত বালাখানায় টপ্পা গাহিয়া, কি পথের

খানায় ধাক্কা খাইয়া কত কারখানাই তুমি করিতে পার। তুমি জঘন্য নগণ্য জীব, তবু সকলেই তোমার নাম করিবে, সেও তো মান। আর যদি সে সময়ে সম্মান নাই হইল, তাহাতেই বা কি? তোমার নেশা ছুটিলে চোখ ফুটিলে দেখিতে পাইবে, তুমি যে ছিলে, সেই; মোদ্দা জামাটা যেন সদ্য পাটভাঙা হয়। ধোপাকে ভার দিও, সে দুটি পয়সায় তোমার সঙ্গদোষ চরিত্রদোষ সকল দোষ ধুইয়া দিয়া তোমার পুরাতন মান ইস্তিরির জোরে খাড়া করিয়া দিবে; তোমার সেই নিখুঁত নিভাঁজ নির্মল মান লইয়া আবার তুমি চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া, চোখ রাঙাইয়া, বুক ফুলাইয়া চলিয়া যাইবে, কেহ পাশে আসিলে চাবকাইয়া দিয়া আবার তুমি বাহবা লইবে। মান তো ধোপার হাতে; আর ধোপা তো দু'-পয়সার চাকর! মানের জন্য আবার ভাবনা?

বাংলাদেশে কেহ ইতিহাস লেখে না, কেহ ইতিহাস পড়েও না। সেটার প্রতি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বোধ করি, এ বড় সুবুদ্ধির বন্দোবস্ত। ইতিহাসে পুরাতন কথা লেখা থাকে; কাজ কি বাবু সে কথায়? এখন, এই উপস্থিত মুহূর্তে আমার যদি গাড়িজুড়ি, চেইন ঘড়ি, হুইপ ছড়ি, চশমা দাড়ি সমস্তই থাকে. তাহা হইলে কাল, আমার কি ছিল আমিই বা কে ছিলাম—সে খোঁজখবরে আমার দরকার কি? বাস্তবিক, দরকার কিছুই নাই; আর দরকার যাহাতে নাই বাঙালীও তাহাতে নাই। বাঙালী তো অজ্ঞান নয়। "ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ"—যে জাতির ইষ্টমন্ত্র, সে কি কখনও অজ্ঞান হয়।

বাস্তবিক মানের জন্য ভাবিতে নাই। মান তোমারও নয়, মান আমারও নয়; মান যায়ও না; ফল কথা মান মানীর, যখন যাহার মানে দরকার, তখনই তাহার মান! মানের সঙ্গে যখন চিরন্তনের বাঁধা সম্বন্ধ কাহারই নাই তখন মানের যন্য প্রাণ দেওয়া ধন দেওয়া দূরে থাকুক, এমন যে ফক্কিকার জিনিস ফাঁকি, তাহাও সকল সময়ে দিতে নাই। কালেভদ্রে ফাঁকি দিয়া, কি দুটা মিছা কহিয়া যদি মান পাওয়া যায় ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐ ব্যস্।

"পাঁচুঠাকুর"। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ

তৈ ল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

তৈল যে কী পদার্থ, তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ। আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমানরূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন!

বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য—তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না। উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না। —বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোনো কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মক হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্লভরাম হইয়াও উড়িষ্যার গভর্নর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্বশক্তিময় তৈল নানারূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে

স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগতকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার বা সৌজন্য, 'ফিলনথ্রপি।' যাহার দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেস্টি, চাকর-বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয়, সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের একমাত্র উপায় তৈল। এইজন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্বি দিয়া থাকে। এইজন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, রাজায়-প্রজায় বিবাদ-বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান্, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্তিমান।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়— যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল— পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যেরূপেই হউক তৈল দিলে কিছু-না-কিছু উপকার হইবে। যেহেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট পাঁচ সিকা বৈ আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজি-ওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল

পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধা মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজকাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিক্যাল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি, বাছিয়া বাছিয়া কোনো রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপ্যাল করিয়া শীঘ্র একটি স্নেহ-নিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্তত উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল-অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রমথতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে, আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না, যদিও কোনো রীতিমত কালেজ নাই, তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রোমোশনের সুপারিশ মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ি সদাসর্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙালীর একমাত্র ভরসা তৈল। বাঙলায় যে-কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈলে বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেবা হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে।

যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড়লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এদেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়ার আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থুদু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ফেরে।

"বঙ্গদর্শন"। চৈত্র ১২৮৫

কলিকাতায়

বিপিনচন্দ্র পাল

কলিকাতার প্রথমদর্শনে মনে কি ভাব জন্মিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে বিলাতের পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া প্রথম লন্ডনের আলো দেখিয়া ইংরেজ-বালকের মনে যেসকল ভাবের উদয় হয়, কেতাবে পড়িয়াছি—কলিকাতার প্রথমদর্শনে আমার অন্তরে সেরূপ কোনো ভাব জন্মে নাই, একথা বলিতে পারি। শিয়ালদহ হইতে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে চাপিয়া শ্রীহট্টের ছাত্রাবাসে যাইয়া উঠিলাম। সেকালে তৃতীয়শ্রেণীর গাড়িই সচরাচর পাওয়া যাইত। ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়া আর নড়বড়ে গাড়ি; ইহাই, এখন যেমন তখনও প্রায় সেইরূপই, কলিকাতার সেক্‌রা গাড়ির লক্ষণ ছিল। দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ি বোধ হয় রাজপথে বেশী বাহির হইত না। কুক্‌ কোম্পানীর আড়গড়া ছাড়া প্রথমশ্রেণীর গাড়ি কোথাও পাওয়া যাইত না। আর বিবাহের মিছিল ব্যতীত কেহ কুকের বাড়ির গাড়ি ভাড়াও করিত না।

ইংরেজিতে কলিকাতাকে City of Palaces কহে। কিন্তু প্রথম কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাসাদাবলী দেখিয়া আমার মনে কোনো বিশেষ বিস্ময় বা উল্লাস জন্মে নাই। তখন কলিকাতার এখনকার চেহারাও ছিল না। অধিকাংশ রাজপথেই সারি সারি খোলার-ঘর ছিল। শিয়ালদহ হইতে বাহির হইয়া বহুবাজারের রাস্তা দিয়া কলেজ স্ট্রীটে পড়িয়া মেডিকেল কলেজের দক্ষিণে নিমু খানশামার লেনে শ্রীহট্টের ছাত্রদের মেসে (mess) যাইয়া উঠিলাম।

এখন এ-রাস্তার দুধারেই পাকা বাড়ি হইয়াছে। সুসজ্জিত দোকান-পাটে রাজপথের নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। সেকালে এরূপ ছিল না। নিমু খানশামার লেন বহুদিন কলিকাতার মানচিত্র হইতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার নাম লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে; বস্তুরও শেষ চিহ্ন পর্যন্ত আজ আর নাই। নিমু খানশামার লেন এখন মেডিকেল কলেজের ভিতরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। মেডিকেল কলেজও তখন এত বিস্তৃতিলাভ করে নাই। পুরাতন বড় বাড়িটা মাত্র ছিল। উত্তরে ও

দক্ষিণে খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। উত্তরে সে-জায়গায় এখন শ্যামাচরণ লাহার চোখের হাসপাতাল হইয়াছে। দক্ষিণে আগেকার হাতার বাহিরে অনেকগুলি নূতন বাড়ি উঠিয়াছে। এইরূপে মেডিকেল কলেজ উত্তরে কলুটোলার রাস্তা হইতে দক্ষিণে বর্তমান ইডেন হাসপাতাল রোড পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ইডেন হাসপাতাল রোডের পূর্বনাম ছিল চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন। এই চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন পশ্চিম মুখে যাইয়া চূণাগলিতে পড়িয়াছিল। চূণাগলির নাম বদলাইয়া গিয়াছে। এখন ইহা ফিয়ার লেন হইয়াছে। শহরের রাস্তায় এই নাম-বিপর্যয়ে কলিকাতার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের কতকটা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতেছে এখনকার শহরের মিউনিসিপাল কর্তারা যাহা কল্পনাও করিতে পারেন না। চাঁপাতলা নামের পিছনে একটা পুরাতন ইতিহাস ছিল। চূণাগলির নামের পিছনেও একটা ইতিহাস ছিল। চূণাগলি বলিতে আমরা সেকালের কলিকাতার ফিরিঙ্গি-পাড়া বুঝিতাম। চূণাগলির সাহেব, বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ পরিভাষা ছিল। ফিয়ার লেন সে-স্মৃতিকে জাগায় না। নিমু খানশামার লেন নামের পিছনেও সেরূপ একটা স্থানীয় সামাজিক ইতহাস লুকাইয়া ছিল। খানশামা হইলেও নিমু একদিন কলিকাতার ঐ পল্লীতে একজন সমাজপতি ছিল। এইরূপ কত অলিগলির প্রাচীন নামের সঙ্গে কলিকাতার পুরাতন সামাজিক ইতিহাস জড়াইয়া ছিল। নূতন বাবুদের আত্মীয়-স্বজনবর্গের নাম জাহির করিবার বলবতী পিপাসাতে সে-সকল ঐতিহাসিক চিহ্ন লোপ পাইতেছে। যাঁরা এমন সস্তায় আত্মপ্রতিষ্ঠা বা স্বজন-প্রীতির পরিতৃপ্তি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁরা একথা ভাবেন না যে, তাঁদের পরে যাঁরা কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্তা হইবেন তাঁরাও আবার নিজেদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য আজিকার এই নামগুলি মুছিয়া ফেলিয়া পথঘাটের অন্য নামকরণ করিতে পারেন এবং করিবেন। আমার মনে হয়, এর চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে সেদিন যেদিন কলিকাতার কোনো পথের নামে কোনো লোকের নামযুক্ত থাকিবে না এবং মার্কিনের নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরের মতন আমাদের শহরেও রাজপথের নাম ১নং, ২নং, ৩নং এইরূপ নম্বর-ওয়ারী হইবে।

'প্রবাসী'। আশ্বিন ১৩৩৪

হা জি র

জগদীশচন্দ্র বসু

হঠাৎ চীৎকার করিয়া কেহ উত্তর দিল—"হাজির"! কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি অতি করুণ ও ভক্তিউচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তর শুনিলাম—"কি আজ্ঞা প্রভু?" কে তোমার প্রভু, কাহার হুকুমে এরূপ উদ্দীপ্ত হইলে?

কি আশ্চর্য! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি আলোড়িত হইল। সুপ্ত স্মৃতি আজ জাগরিত—যাহা অশব্দ, আজ তাহা শব্দায়মান; যাহা বুদ্ধির অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্থযুক্ত হইল।

এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই দুই-এর মধ্যে যে সর্বদা কথা বলিতেছে তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুমতি তো আমি, সুমতি তবে কে?

এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। কোনো দিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশস্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক বিষয়ে লিখিলাম; পরে লিখাইল, 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়া মাত্র'। জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিতাম না, কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি, ইহার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা?' জবাব দিলাম, যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সেইসব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যেসব

অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং বিলাতের সম্বর্ধনাসভায় নিমন্ত্রিত হইলাম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উলিয়াম রাম্‌সে বহু সাধুবাদ করিলেন; পরে বলিলেন—"কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে, এখন হইতে ভারতে নূতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল; কিন্তু একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" সেদিন বোধ হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিবে, কারণ স্পর্ধার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম—আপনাদের আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করিবে। এখন সেদিন আসিয়াছে; যাহা কুমতি বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাই সুমতি। তখনকার শুভ লগ্ন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একদিন পর আর একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং সম্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল।

এমন সময় যে হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষা শ্রেয়ঃ, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল—'কল কি মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে?'

কলে কেন ক্লান্তি হয়? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার অপেক্ষায় ছিল; সেসব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিককাল ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এইসব প্রক্রিয়া অধিকতররূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

জীবতত্ত্ববিদের হস্তে এইসব নূতন তত্ত্ব রাখিয়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। রয়াল সোসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম। সর্ব-

প্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ বার্ডন সেণ্ডারসন বলিলেন—"জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বে নিষ্ফল হইয়াছে; সুতরাং আপনার কথা অসম্ভব ও অগ্রাহ্য। এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার-চর্চা হইয়াছে। আপনি পদার্থবিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনারা অজ্ঞাত পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।" তখন কুমতির প্ররোচনায় বলিলাম—নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার। আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম। আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য; ইচ্ছায়ই হউক অনিচ্ছায়ই হউক, তাহা সকলকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই দুর্মতির ফল ফলিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সবদিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম। আশা ও নিরাশার অতীত, এইভাবে বিশ বৎসর কাটিল।

এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম—"বিদেশ যাও"। বিদেশ যাত্রা। সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম—"আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল! লাভালাভ বলিবার তুমি কে?" আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।

তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। কাহার হুকুমে এরূপ হইল? একি স্বপ্ন? বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, এখন তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন। যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, এখন তাহা সর্বত্র গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম, পুনরায় দেখিতে পাইলাম—তাহাই সুমতি।

সুতরাং কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা কুমতি জানি না; কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট তাহা মন বোঝে না। সুদিনের বৃহৎ সফলতা ভুলিয়া দুর্দিনের বিফলতার কথাই মনে পড়িতেছে। তখন সর্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম, কেবল দুই-এক জনের অহেতুক স্নেহ আমাকে আগলাইয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহারা অন্ধকার যবনিকার পরপারে। অস্ফুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌঁছিয়া থাকে?

জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন

হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধুলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার কি আছে? কোন্‌টা সুমতি আর কোন্‌টা দুর্মতি, এই ধান্ধাতেই জীবন কাটিয়াছে। সাফাই কথা যখন কিছুই নাই তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে— "আসামী হাজির!"

"অব্যক্ত"। বঙ্গাব্দ ১৩২৮

মন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে মধ্যাহ্নকালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতলা ঘরে বসিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিক্‌টিক্‌ করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে একজোড়া চড়ুই পাখি বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতিদূর তীর-রেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্তী বেড়া-দেওয়া ছোটো বাগানটি পর্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মতো দেখাইতেছে—এই তো বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এইভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কী। কাগজ-কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল। কোন্‌ বিষয়ে তোমার কী মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি সে-কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কী দরকার ছিল। ঐ দেখো, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধুলা এবং শুকনা পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকারভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল। পদাঙ্গুলিমাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গিটি করিয়া মুহূর্তকাল দাঁড়াইল, তাহার পর হুসহাস করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল তো ভারি! গোটাকতক খড়কুটা ধুলাবালি সুবিধা মতো যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গি করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল। এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোনো উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক। না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব, না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে সমীচীন

উপদেশ। পৃথিবীতে যাহা-কিছু সর্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেইসমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি করিয়া উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে।

অমনি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিশ্বাসে কতকগুলা যাহা-তাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাটিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম। অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁ দিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই, শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা। অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্যালোক—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল খ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে তো বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ। কেবল একটা কঠিন কীর্তি। তাহাকে কেহ-বা হাঁ করিয়া দেখে কেহ-বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনই থাক্।

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ-কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই। সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি, ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শালপাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল গাছটির মতো। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড়ো একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটিও তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিক্কন সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পান্ডুবর্ণ হইয়া উঠে, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারি দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে; বর্ষাশেষে ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়। তখন সমস্ত দিন এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, 'আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন। প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না। ঐ দিগন্তের পরপারে কী আছে; ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছ কেমন করিয়া নাগাল পাইব। আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ-কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোনো সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যেদিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য ওঠে সেদিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলকসঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যেদিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস ওঠে, সেদিন ইচ্ছা করে—কী ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে।'

এই সমস্ত কান্ড। গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতা ফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে-রকম আছে আর এক রকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এ-দিক, না হয় ও-দিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়—একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, অরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোনো প্রবল শয়তান সরীসৃপের মতো লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া শত লক্ষ আঁকাবাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত

তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখির গানের মধ্যে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্তে শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না।

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই। ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনী-গাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না 'তোমার ফুলের কোমলতা আছে কিন্তু ওজস্বিতা নাই' এবং কুল ফল কাঁঠালকে বলে না 'তুমি আপনাকে বড়ো মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই।' কদলী বলে না 'আমি সর্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র প্রচার করি' এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎ পত্রের আয়োজন করে না।

"সংকলন"। অগস্ট ১৯২৫

মে য়ে - য জ্ঞি

শরৎকুমারী চৌধুরানী

মেয়ে-যজ্ঞি বলিলেই বুঝিতে হইবে বিশৃঙ্খলার সমষ্টি! প্রাতঃকাল হইতে ভিয়েনের গন্ধে, দাসীর কলরবে, ছেলের কান্নায়, মলের রুনুঝুনুতে, চুড়ির ঝন্‌ঝন্ শব্দে যজ্ঞিবাড়ি সরগরম। পিচ্ছলে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, অথচ হাতে অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি করিতেই হইবে—সুতরাং কেহ আছাড় খাইয়া লোক হাসাইতেছে, কাহারও ঢাকাই শাড়িতে কাদা লাগায় মন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছে, কোনো ছেলে "সন্দেশ খাব রে" বলিয়া সেই কাদাতেই গড়াগড়ি দিতেছে।

একটি ঘরে বড় বড় বঁটি পাতিয়া সধবা, বিধবা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, কুৎসিতা, সুন্দরী মহিলারা তরকারি কুটিয়া ঝুড়ি ঝোড়া বোঝাই করিয়া দিতেছেন, হাসি গল্পের বিরাম নাই। বাঙ্গালীর মেয়েরা প্রত্যেকেই ইংরাজ মহিলাদের মত সুস্বরের প্রতি মনোযোগিনী নহেন, সুতরাং কেহ বা কোকিল-কণ্ঠে, কেহ বা মোটা গলায় উচ্চস্বরে কথা কহিতেছেন।

শিশুসন্তান আসিয়া মাতাকে বিরক্ত করিতেছে—অনেকক্ষণ মায়ের ভ্রূক্ষেপই নাই—হাতে কাজ, মুখে গল্প, ঠোঁটে হাসি—যখন ছেলে পঞ্চম স্বরে—"মা, খাবার দে না, আ-আ"—বলিয়া ক্ষুদ্র হাতে দু-একটা চড় দিল বা মাথার কাপড়টা খুলিয়া দিল—তখন মা, "আ মোলো যা হতভাগা ছেলে, তর সয় না" বলিয়া ক্ষুদ্র হাতের মৃদু চড়ে ঋণ সুদশুদ্ধ ফেরত দিয়া আবার গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ বা, 'এই যে বাবা, দিচ্ছি, খাবার দিচ্ছি চল, ক্ষিদে পাবেই ত' বলিয়া গল্পের হারানো খেই খুঁজিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলে কাঁদিয়া 'যজ্ঞি-বাড়ি' বলিয়া জানান দিতে লাগিল।

আর একটা ঘরে বালিকারা ও ছোট ছোট বধূরা পান সাজিতেছে। ঘোমটার প্রান্তে হাসিমাখা লাল লাল ঠোঁটের উপর নোলকটি ঝুলিতেছে। হাত দুখানি চুন খয়েরের দাগে রঞ্জিত; মাঝে মাঝে নিজের হাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলের বিষম ভাবনা হইতেছে যে, এই হাত লইয়া কেমন করিয়া লোকের সামনে বাহির হইবে—কেহ বা "কি ক'রে এ দাগ উঠবে

ভাই” বলিয়া হাসিয়া আকুল হইতেছে। কেহ বা দাগ উঠিবার উপায় বলিয়া দিতেছে। এই ঘরে শিশুর কলরব বড় একটা নাই, যদি কোনো শিশু “দিদি, নে-না” বলিয়া আসিতেছে, অমনি তাহার দিদি “যা যা, ঐ ঘরে মা আছে যা” বলিয়া সদ্যই বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছে।

এমন সময় ডাক পড়িল—“ওরে, এই বেলা সবাই ভাত খেয়ে নে-না গো—এখনই যে সব মেয়েরা আসতে আরম্ভ করবে, দুটো বেজে গেছে।”

দালানে সারি সারি কলাপাতায় ভাত ও পাঁচ সাত প্রকার তরকারি একটু একটু দিয়া পাতা সাজানো আছে। ভাত শুখাইয়া চাল হইতেছে, যে আসিতেছে, সে বসিতেছে। কেহ ডাকিতেছে—“ও সেজ বৌ, আয় না”—কেহ ডাকে, “ন-দিদি, শীগ্‌গির নে-না ভাই খেয়ে, না হ’লে যে কারও চুল বাঁধা হবে না।” কাহারও ডাকাডাকিতে সাড়া নাই, পাতা পড়িয়া আছে। যাহাদের অর্ধেক আহার হইয়াছে, তাহারা ডাকিল—“ও ঠাকুর, আর কি আছে নিয়ে এস না।” ঠাকুর এক পিতলের হাতা লইয়া আসিয়া সকলকে এক এক হাতা দিয়া গেল। “ও ঠাকুর, মাছের ঝোলের মুড়োটা লক্ষ্মীর পাতে দাও—কাঁটার মাছ একখানা খুঁজে দাও ত।” ঠাকুর পরিবেশনে আসিলেই বধূরা ঘোমটার মাত্রা বাড়াইয়া হাত গুটাইয়া আহার বন্ধ করিতেছে, মেয়েরা চাহিয়া চাহিয়া খাইতেছে।

ভাত খাওয়ার পালা শেষ হইতে না হইতে একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। একজন তাঁদের দেখিয়া “ঐ রে—কারা এল, ওঠ ওঠ, আর দই খায় না।” কেহ ত্রস্তে উঠিয়া পড়িল, কেহ গল্প বন্ধ হওয়ায় এইবার ভাল করিয়া কাজে মনোনিবেশের অবসর পাইয়া, “দইটা বেশ হয়েছে জেঠাই-মা, আর এক খুড়ি দাও ত” বলিয়া প্রচুর দই খাইয়া লইল। একটি করিয়া শিশু প্রায় সকলের পাশে আছেই—কারও পাশে বা দুটি। মা এখন বিশেষ মনঃসংযোগে ছেলেকে আহার করাইতে লাগিল, কেহ উঠিতে বলিলে বলে, “এই যে ছেলেটা খাচ্ছে, খাওয়া হোক, উঠি।” নিজেও যে না খাচ্ছেন, এমন শপথ করা যায় না।

এদিকে ত্বরিতাগত মহিলারা আপাদমস্তক বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া জড়ভরতের ন্যায় উচ্ছিষ্টের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—কোন দিকে যাই। গৃহিণীরা দই সন্দেশের হাঁড়ি হাতে পরিবেশনে ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন, “এস এস—চল চল, উপরে চল।” কিন্তু উপরের সিঁড়ির সন্ধান কে দেয়? সুতরাং নিমন্ত্রিতরা দাঁড়াইয়া আহার দেখিতেছেন। ইহাতে দু-একজন শীঘ্র আহার শেষ করিয়া—“পিসিমা যেন কি, এঁদের

নিয়ে বসাও না গা” বলিয়া হাত ধুইতে গেল। তাহারা যখন হাত ধুইয়া আসিল, তখন আরও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছেন। তখন একজন “আসুন আসুন, আপনারা এইদিকে এখন আসুন” বলিয়া উপরে লইয়া একটি ঘরে বসাইলেন। যাহারা পূর্বের পরিচিতা, তাহারা আসিয়া সিঁড়ি, ঘর, মাদুর খুঁজিয়া লইয়া এক রকম বসিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। মহিলারা প্রায়ই পরস্পরে পরস্পরের অপরিচিত; মূক বধিরের ন্যায় বসিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। যদি কেহ কাহাকেও পরিচিতা পাইয়া থাকেন, তবে তিনি দুই এক কথা কহিয়া সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন।

এমন সময় গৃহিণীদের কাহারও বন্ধু অথবা মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির কুটুম্ব বা পিত্রালয়ের কেহ আসায় তাঁহাদের কল্যাণে গৃহিণীদের কেহ একবার আসিয়া সকলকেই সমভাবে আপ্যায়িত করিয়া গেলেন—একজন আসিয়া পান দিয়া গেল। যাঁহারা সকাল সকাল আসিয়াছেন—মনোগত বাসনা যে, সকাল সকাল ফিরিবেন। গতিক দেখিয়া বুঝিলেন যে, সে আশা বৃথা!—

বাড়ির মেয়েদের মধ্যাহ্নের আহার ও বৈকালিক বেশভূষা সমাপ্ত হইতে পাঁচটা বাজিল। তখন একটি গলা-খোলা লাল বডি বা হাতকাটা কালো জ্যাকেটের সঙ্গে কেহ নীলাম্বরী, কেহ ঢাকাই, কেহ শান্তিপুরের ডুরে পরিধান করিয়া দু-চারখানি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া এ-ঘর ও-ঘর হইতে নিমন্ত্রিতাদের সংগ্রহ করিয়া উঠানে লইয়া গিয়া বসাইতে লাগিলেন; সেখানে শতরঞ্জির উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। এক পাশে কারচোপের কাজের বিছানা, তাহাতে আইবড় ভাতের বা বৌভাতের বা 'সাধের' ক'নে উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কার ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা হইয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্পাধারে বড় বড় দুটি গোলাপ ফুলের তোড়া। এক পাশে নাচের বাজনা বাজিতেছে, কতকগুলি কালো কালো মোটাসোটা প্রৌঢ়া ভদ্রলোক ঢোলক, মন্দিরা ও বেহালা বাজাইতেছে। তিন চারজন নাচওয়ালী আবাহু, আকণ্ঠ, আপাদমস্তক অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ বা সিগারেট খাইতেছে, কেহ পান খাইতেছে। নিমন্ত্রিতাদের আসিতে দেখিয়া দুইজন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাচ গান জুড়িয়া দিল ও নাচিতে নাচিতে প্রত্যেকের অতি নিকটে আসিয়া পেলার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে উঠান ভরিয়া গেল, আতর, গোলাপ ফুলের মালা ও

তোড়া বিতরণে নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনা করা হইল। এখন যাঁরা আসিতেছেন, তাঁহাদের কোনো চিন্তা নাই যে, কোথায় বসিব। প্রবেশপথে ও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাড়ির মেয়েরা নিমন্ত্রিতাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। যে কেহ গাড়ি বা পালকি হইতে নামিতেছেন, অমনিই তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া উঠানে বসানো হইতেছে। আসর জমজমাট, হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া পাল ভেদ করিয়া ছড়ছড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হৈ হৈ করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল এবং "নরেন কোথা গেলি", "খুকী ঝিয়ের কোলে যা", "হ'রে রুমালখানা মাথায় দে", "রোগা ছেলে ভিজে গেল", "ওমা কি হবে, আজ সবে দুটি ভাত দিচ্ছি" বলিতে বলিতে মহিলারা ঘরের ও বারান্দার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। বেনারসী, ক্রেপ, বোম্বাই প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র ভিজিল। হুড়াহুড়ি, কলরব, কাদার পিছিল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কে কাকে দেখে! তারই মাঝে নাচওয়ালীরা ভাঙা গলায় চেঁচাইতেছে—"ওগো, মেয়েদের দালানে বসাও না!" তাহাদের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে, হীরা, মুক্তা ও প্রচুর সোনায় ভূষিতা মহিলাদের দেখিয়া তাহারা আশা করিয়াছিল যে, প্রচুর পেলা পাইবে—কিন্তু হায় রে বৃষ্টি!

বারান্দায়, দালানে ও ঘরে ঘরে খাদ্যের পাতা সাজানো হইয়াছে, তিল মাত্র স্থান নাই যে মহিলারা আশ্রয় লয়েন, তা আবার গানের মজলিস বসিবে!

বৃষ্টির প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া বাড়ির মেয়েরা অভ্যাগতাদিগের হাত ধরিয়া সযত্নে আহারে বসাইলেন এবং বৃষ্টিতে সকলের বড়ই কষ্ট ও ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গোলযোগে পরিবেশনে অনেক ত্রুটি হইতে লাগিল—কেহ লুচি পাইল, কচুরি পাইল না, সন্দেশ পাইল ত রসগোল্লা পাইল না।

রান্না হইয়াছে—পোলাও, কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারি, মাছ দিয়া ছোলার দাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের দাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটোল ভাজা, দইমাছ, চাটনি, তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপর ভাজা; একখানি সরাতে খাজা, গজা, নিমকি, রাধাবল্লভি, সিঙ্গারা, দরবেশ মেঠাই; একখানা খুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ; আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুজিয়া, গোলাপজাম ও পেরাকী। ইহার উপর ক্ষীর, দধি, রাবড়ি ও ছানার পায়স। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল, কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না, এজন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না।

আহার্য প্রচুর ও অনেক প্রকারের, সুতরাং পরিবেশনে বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও প্রত্যেকেরই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল।

এইবার বাড়ি যাওয়ার পালা। "গাড়ি কই", "খোকা কোথা", "খুকীর গলার হার কে নিলে?" কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না! বৌমার হীরার ধুক্‌ধুকি নাই, টেঁপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নীর নাকের নথের নোলক পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজা পায়েই "আমার জুতো ও—ও—ও—ও" করিতে করিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

গিন্নীর বকুনি, কর্তার ক্রোধ শান্ত হইতে রাত বারোটা বাজিল। জুতার শোক ভুলিয়া অমিয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এক ঘুমে রাত্রি প্রভাত। একজন বৈষ্ণব খঞ্জনি বাজাইয়া গান গাহিতেছে—জয় যদুনন্দন জগত-জীবন—।

'ভারতী'। ভাদ্র ১৩১৫

হা ঙ র

স্বামী বিবেকানন্দ

সকালবেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে।

জল-জ্যান্ত হাঙর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি—গতবারে আসবার সময়ে সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙরের খবর শুনেই, আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর—সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে, ঝুঁকে হাঙর দেখচে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙর মিঞারা একটু সরে গেচেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসচে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক থিক করচে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিশ মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক ওদিক কোরে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি হাঙরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম—তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন, হুড়ি চড়ে—তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুশী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মত জলের ভিতর ছুটচে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টাটাক, এইপ্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি ত দেখা যাচ্চে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার,—ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসচি, এমন সময় একজন বললে—ঐ ঐ! দশ বার জনে বলে উঠলো, ঐ আসচে, ঐ আসচে!! চেয়ে দেখি দূরে প্রকাণ্ড একটা কালো বস্তু ভেসে আসচে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাইলস্করি চাল; বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসচে—আর আগে আগে দুএকটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ

তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্চে। কোনো কোনোটা বা জেঁকে তার ঘাড় চেপে বসেচে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গো হাঙর। যে মাছগুলি হাঙরের আগে আগে যাচ্চে, তাদের নাম আড়কাটি মাছ—পাইলট ফিশ।" তারা হাঙরকে শিকার দেখিয়ে দেয় আর বোধহয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে পাশে ঘুরচে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ-মাছ, হাঙরের গায়ে দিয়ে চিপ্সে ধরে; তাই হাঙরের গায়ে পিঠে চড়ে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পরিষদজ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয় ধরা পড়লো। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্সে উঠতে লাগল। ঐ রকম কোরে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে। সে "কুঁয়োর ঘটি তোলার" ঠাকুর দাদা! তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর, ফাতনা শুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ কোরে জলে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নীচে একখানি পুলিশের নৌকা আমরা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল—পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠলো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে ,কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় কোরে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে ত

দূরে ফেললেন; আর আমরা উদগ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙরের জন্য "সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং" হয়ে রইলাম, এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ "সখি, শ্যাম না এলো।" কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দু'শ' হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেড়ে উঠ্লো; সঙ্গে সঙ্গে, "ঐ হাঙর ঐ হাঙর" রব! চুপ্ চুপ্—ছেলের দল!—হাঙর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙরটা যে ভড়কে যাবে—ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করচে, তাবৎ সেই হাঙর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শি-সংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্যে, পালভরে নৌকার মত শোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—এইবার হাঙরের মুখে টোপ ঠেকেছে! সে ভীম পুচ্ছ একটু হেল্লো—সোজাগতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙর চলে গেল যে হে! আবার একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়ালো। আবার শোঁ করে আস্চে—ঐ হাঁ কোরে, বঁড়শি ধরে-ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়্লো, আর হাঙর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসচে, আবার হাঁ করচে; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েচে, এইবার—ঐ ঐ চিতিয়ে পড়লো; হয়েচে, টোপ খেয়েচে—টান্ টান্ টান্, ৪০।৫০ জন টানে, প্রাণপনে টান্! কি জোর মাছের! কি বাটাপট—কি হাঁ। টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্লো, ঐ যে জলে ঘুরচে, আবার চিতুচ্চে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙর পালাল! তাই ত হে, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েচে অমনিট কি টান্তে হয়? আর—"গতস্য শোচনা নাস্তি"; হাঙর ত বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাঠি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা ত খবর পাইনি—মোদ্দা হাঙর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা" বঁড়শি—সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স"আড়কাঠি"—"রক্তচোষা" অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হুতাশ হবার প্রয়োজন নেই। ঐ যে পলায়মান "বাঘা"র গা ঘেঁষে আর একটা প্রকাণ্ড "থ্যাব্ড়া মুখো" চলে আস্চে! আহা হাঙরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিতো। নিশ্চিত বল্তো, "দেখহে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেচে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত

হাড়! এতকাল হাঙর-গিরি করচি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেচি, কত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো, পেটে পুরেচি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে" বলে, একবার সেই আকটি দেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান কোরে আগন্তুক হাঙরকে অবশ্যই দেখাতো। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোনো না কোনোটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিতো। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না তখন হয় হাঙরদের অত্যন্ত অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোনো প্রকার হাঙুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন কোরে হয়? —অথবা "বাঘা" মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েচে, তাই "থ্যাবড়া"কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেসে "ভাল আছ ত হে" বলে সরে গেল।—"আমি একাই ঠকবো?"

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা..." —শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেচেন "পাইলট ফিশ্", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসচেন "থ্যাবড়া"; তাঁর আশে পাশে নেত্য করছেন "হাঙর-চোষা" মাছ। আহা, ও-লোভ কি ছাড়া যায়? দশহাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ কোরে তেল ভাসচে, আর খোসবু কতদূর ছুটছে, তা "থ্যাবড়াই" বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়ারের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রং-বেরঙের গোপীমণ্ডল—মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!!

এবার সব চুপ—নোড়োচোড় না, আর দেখ—তাড়াতাড়ি কোরো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরচে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখচে! দেখুক। চুপ চুপ—এইবার চিৎ হল—ঐ যে আড়ে গিলেচে চুপ—গিল্‌তে দাও। তখন "থ্যাবড়া" অবসর ক্রমে. আড় হয়ে টোপ উদরস্থ কোরে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়লো টান! বিস্মিত "থ্যাব্‌ড়া", মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠলো—টান্ ভাই টান্। ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙর জলের উপর।

বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান্—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েচে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেচে—ঠোঁট এ ফোঁড় ও ফোঁড়—টান্। থাম্—থাম্-ও আরব পুলিস মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত—নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্--কি ভারি হে? ওমা, ও কি? তাই ত হে, হাঙরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলচে কি? ও যে নাড়িভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়িভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্ ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া কর্‌লে চলবে না। টান—এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেল; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়—ধুপ! বাবা, কি হাঙর! কি ধপাৎ কোরেই জাহাজের উপর পড়লো? সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার—ওহে—ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ।—"বটে ত"। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম্ দুম্ দিতে লাগ্‌লো হাঙরের মাথায়। আর মেয়েরা—আহা কি নিষ্ঠুর, মের না ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখ্‌তেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক্। কেমন কোরে সে হাঙরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগ্‌লো, কেমন সে হাঙর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগ্‌লো; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো, একরাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক্। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিলো। সব জিনিসেই সেই হাঙরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

"পরিব্রাজক"। ১ মাঘ ১৩১২

ব স ন্ত প ঞ্চ মী

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকালের হিসাবে আজ হইতে মদনোৎসব আরম্ভ, চৈত্র মাসের কন্দর্প-চতুর্দশীর দিন এই উৎসবের শেষ হইত। পুরা বসন্তকালটা আমোদে, প্রমোদে, উৎসব আনন্দে কাটিত। সঙ্গীত, কবিতা, রচনা, কাব্যামোদ, রং লইয়া খেলা, কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি, আর ফুলের বাহার—মদনোৎসবের ইহাই উপাদান ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফুলের সাজে সাজাইয়া, বাসন্তী রঙের কাপড় পরাইয়া বাহির করা হইত। তাহারা নাচিত, খেলিত, হাসিয়া বেড়াইত। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর দলও সাজিয়া কুঙ্কুম কস্তুরী লইয়া বাহির হইত এবং নানা রসের কবিতা আবৃত্তি করিত, কথা-কাটাকাটি করিত এবং নাচ-গান করিত। ইহা ছাড়া মদনের পূজা, আরতি এবং শোভাযাত্রাও হইত। এই উৎসবে যেন একটা আনন্দের ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া যাইত।

এই মদনোৎসবই আকারান্তরিত হইয়া হোলি উৎসবে পরিণত হইয়াছে। কাব্যামোদের পরিবর্তে গালাগালি চলিয়াছে, কুৎসিত ভাবের আলোচনা হইয়া থাকে। পূর্বে যখন আমরা সজীব জাতি ছিলাম, তখন মদনোৎসবে মধুর রসেরই আধিক্য হইত—সাজে মাধুর্য, ভাষায় মাধুর্য, সঙ্গীতে মাধুর্য, চিত্রলিখনে মাধুর্য—সর্বত্রই মাধুরীর প্রবাহ বহিয়া যাইত। জাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর পরিবর্তে কৌসিত্য প্রবল হইয়াছে, আমোদ-প্রমোদ অশ্লীল কুরুচিকর আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের পুরাতন উৎসব সকলের বিপরিণাম দেখিলেই বুঝা যায় আমরা কতটা হীন হইয়াছি।

বসন্তপঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজাটা তন্ত্রের কীর্তি! বাঙ্গালায় যেমন মাটির সরস্বতী গড়িয়া পূজা হয়, ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন হয় না। এমন কি বাঙ্গালীর মতন পুস্তকপূজা—ভারতীর আরাধনা আর কোন প্রদেশে হয় না। অদ্য অনধ্যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালী যেমন একেবারেই কলম স্পর্শ করে না, গ্রন্থাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না—এত কঠোর অনধ্যায় ভারতের আর কোন প্রদেশে প্রচলিত নাই। সরস্বতী পূজা বাঙ্গলার

খাস-সামগ্রী—খাস-উৎসব। বিহারের হিন্দুগণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত পূজা করিয়া থাকে, আজ সরস্বতী পূজার দিনে তাহারা দোয়াত পূজা বা গ্রন্থ পূজা করে না। আজ হইতে তাহাদের হোলি আরম্ভ হইল, আজ হইতে আবীর ও গালাগালি চলিতে আরম্ভ হইল, আজ হইতে দোল-পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে তাহারা হোলি গান করিবে। হোলির সূচনার দিন বলিয়া আজ বসন্তপঞ্চমী তাহাদের পক্ষে আমোদের দিন। যুক্তপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবে বিহারের মতন হোলির প্রথম দিন বলিয়া বসন্ত-পঞ্চমীর আদর। কেবল বাঙলায় আজ শক্তিপূজার বোধন বসিল, বাসন্তী দুর্গোৎসবের বিজয়ার পর চতুর্দশীর দিন এই বোধনের শেষ হইবে।

আমরা ইংরেজিনবীশ বাঙালী মেকী সভ্যতার খাতিরে দেশের পুরাতন উৎসব আনন্দ ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, পরন্তু নূতন উৎসব আনন্দ অবলম্বন করিতে পারি নাই। আসল কথা—আমরা উৎসব আনন্দে মত্ত হইতে ভুলিয়াছি। তাহার একটু কারণ আছে। দশজনকে লইয়া উৎসব আমোদে প্রমত্ত হইতে হয়। উৎসব বলিলেই সংহতি বুঝায়! আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, বন্ধুবান্ধব লইয়া উৎসব করিতে হয়। দশজনকে লইয়া আনন্দ করিতে হইলে ট্যাকের কড়ি খরচ করিতে হয়, নিজে একটু সংযমী ত্যাগী হইতে হয়। যে বিলাসী সে অত পরের উপদ্রব সহিবে কেন, পরের জন্য পয়সা খরচ করিবেই বা কেন? বিশেষতঃ বাবু বিলাসীর বিলাসের আকাঙ্ক্ষাটা খুব বড়, অথচ তদনুরূপ অর্থ-সমর্থ অর্থোপার্জন করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি বিলাসে ইংরেজের নকল করেন বটে, কিন্তু ইংরেজরা ইয়োরোপীয় জগৎ ছানিয়া টাকা রোজগার করে এবং বাবুয়ানি করে, তিনি ইংরেজের এঁটো পাত চাটিয়া তাহার চাকরি—দালালি—মোসাহেবি করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করেন। এমন নকলনবীশ বিলাসীর আধিক্য সমাজে হইলে সামাজিক আমোদ উৎসব একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। আর একটা কথা; আজকালকার সামাজিক বাবুরা আর অল্পে তুষ্ট নহেন; তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে বাদসাহী খোরাক না তৈয়ারী করিতে পারিলে, তাঁহারা খাইতে আইসেন না। দশজন মিশিতে হইলে যে দশজনকে একটু একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। ফলে আনন্দময়—উৎসবময় বাঙলা দেশ এখন নিরানন্দ এবং উৎসবহীন হইয়াছে। তাহার ফলে রোগ শোক অল্পায়ু অল্পভোগী হইয়া আমরা কষ্ট পাইতেছি, বল বুদ্ধি ভরসা চাল্লশে পেরুলেই ফরসা হইয়া যাইতেছে।

কাজেই বলিতে হয় আজ বসন্তপঞ্চমীর দিন একবার বুক-ভরা, গাল-পোরা হাসি হাস না ভাই। হাসি না পায়, জোর করিয়া হাস—শুষ্ক হাসি হাস। হাসির ভান করিতে করিতে আসল হাসি ফুটিয়া উঠিবেই। সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার; কাহারও ভাগ্যে নির্জলা সুখ বা নির্জলা দুঃখ ঘটিতেই পারে না;—সুখের মধ্যে দুঃখ থাকে, দুঃখের মধ্যে সুখ থাকেই। যে হাসিতে জানে সে সুখেও হাসে, দুঃখেও হাসে—সে হাসিয়া সুখ-দুঃখকে এক করিয়া ফেলিতে পারে। মুসলমানের আমলে এমন কি অধিক সুখ ছিল যে, বাঙলা উৎসবময় হইয়াছিল। আসল কথা, তখন বাঙালী আমোদ করিতে জানিত—হাসিতে হাসাইতে জানিত। এখন বাঙালী হাসিতেও জানে না, হাসাইতেও পারে না। তাই বঙ্গভূমি নিরানন্দময়ী। হাস না?—বসন্তপঞ্চমী বড় সুখের, বড় ভোগের উৎসব, এই শুভ দিনে একবার আপনা ভুলিয়া হাস না? তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার জাতির কল্যাণ হইবে, তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে, বংশ রক্ষা হইবে, প্রকৃত সুখোদয় হইবে। মা-সরস্বতীকে সামনে রাখিয়া—একবার গাল-ভরা সরল হাসি হাস! উৎসব সার্থক হউক, বাঙালী জীবন ধন্য হউক।

'প্রবাহিণী'। ১১ মাঘ ১৩২১

বর্ষা

প্রমথ চৌধুরী

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুইই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার

স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তার পর মাথা নাড়বে, তার পর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে সীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুণগুণ করছে, কত কবিতার শ্লোক কখনো পুরোপুরি কখনো আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা যেসব গান আজ আমার মনে পড়ছে সেসবই হয় সংস্কৃত, নয় বাঙলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভূবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—‘এমন দিনে তারে বলা যায়’। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেন নি, শেক্‌স্‌পীয়রও বলেন নি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো Mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর Mystery নেই, তা কবিতা নয়—পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা—এটা কখনো ভেবে দেখেছেন যে, বাঙলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ-ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হত না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্রবিদ্যুতের একটু আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই এক শ—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তার পর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলক ধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল' অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের ল' অ্যান্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য তো মাথায় থাক্, সংবাদপত্রও লিখতে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাঙলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বদ্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত

বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুক্‌নো ফুলের পাঁপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে যে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বা'র করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

'প্রবন্ধসংগ্রহ'। আষাঢ় ১৩২৯

পা ণ

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাণ কতকাল ভারতে আছে? এই আকস্মিক প্রশ্নের সামাধান করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস দেশের ইতিহাস খুঁজিতে হয়। কেহ কেহ হয়ত সদম্ভে বলিবেন যে, প্রাচ্যজগতের ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি দেশই মানব-সভ্যতার আদি জন্মস্থান। কিন্তু এ অন্ধ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। আর্যজাতির আদিবাস যে য়ুরোপখণ্ডে, বল্‌টিক্‌ সাগরের তীরভূমিতে, বা ঐরূপ কোন একটা স্থানে ছিল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। 'অন্যে পরে কা কথা', ব্রাহ্মণকুলতিলক বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় পর্যন্ত ঐ দিকে ঢলিয়াছেন। সুতরাং সভ্যতার প্রথম বিকাশ যে প্রতীচ্য-জগতে হইয়াছিল এই সারতত্ত্ব অনার্য ভিন্ন কেহই অস্বীকার করিবে না। এ অবস্থায় পাণের জন্মকথা আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীস দেশের ভাষা ও ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়, এ কথা কি আর বার বার বলিতে হইবে?

এই অনুসন্ধানকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পথে একটি সামান্য বাধা আছে; লেখক গ্রীক্‌ভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইহাতে বড় আসিয়া যায় না। সকলেই জানেন, ভাষাতত্ত্ববিচারে ভাষায় অধিকারের আদৌ প্রয়োজন নাই। এ ক্ষেত্রে অভিধানই আমাদের পরম সহায়; শব্দচয়নকার্য অভিধানের সাহায্যে সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। মহাজনপ্রদর্শিত এই সুগম পন্থা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা পাঠকসমাজকে উপহার দিতেছি।

গ্রীক্‌ ভাষায় প্যাণিক্‌ (panic) শব্দটি দেখা যায়। এই শব্দের অর্থ অকারণ আতঙ্ক। বৈষ্ণবধর্মে যেমন অহেতুকী প্রীতি, তেমনই একটা অহেতুকী ভীতিও আছে। দিনমানের সমস্ত বিচিত্র কোলাহল স্তব্ধ হইলে 'অর্ধরাত্রে শয্যাগৃহে' প্রদীপ নির্বাণলাভ করিলে যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে একমাত্র জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত থাকে তখন সকলেই এই অহেতুকী ভীতির সত্তা অনুভব করিয়াছেন। ইহাই গ্রীক্‌ ভাষায় প্যাণিক। এক্ষণে শব্দের অর্থ বিচারে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক

শব্দটি হইতে আমরা কি ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারি। বাস্তবিক, শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টায় অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া একটিমাত্র শব্দ অবলম্বন করিয়া ভূরি ভূরি ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার করাই আধুনিক-প্রণালী-সম্মত গবেষণা (modern method)।

কথায় বলে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে (history repeats itself)। এই গ্রীক্ প্যাণিক শব্দ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আজকাল আমাদের মধ্যে যে পাণাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, বহুযুগ পূর্বে এইরূপ একটা পাণাতঙ্ক গ্রীস্‌দেশে দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে প্যাণিক্ শব্দের উদ্ভব। খুব সম্ভব সেই সময় হইতেই প্রতীচ্যখণ্ডে পাণ খাওয়ার আর চলন নাই। আমরাও এই সুযোগে পাশ্চাত্ত্য সুসভ্য জাতিগণের অনুসরণ করিতে পারিব না কি? কালক্রমে এই প্যাণিক্ শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়া সকল প্রকার অমূলক আতঙ্ক বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। অর্থের এরূপ পরিণতি ভাষাতত্ত্বে একটা মোটা কথা।

এইবারে কথাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা যাউক। গ্রীস্‌দেশে পাণাতঙ্ক যখন ঘটিয়াছিল, তখন তথায় যে পাণ খাওয়ার প্রথার পূর্বাবধি প্রচলন ছিল ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। Pantheon, pancratium, panathenaic প্রভৃতি গ্রীক্ শব্দেও একথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে পাণ (গ্রীক্ উচ্চারণ প্যান) একটা উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরীরবিজ্ঞানের pancreatic juice-এরও এই পাণ হইতে উদ্ভব; এই কারণেই পাকস্থালীতে ভুক্ত দ্রব্য সহজে জীর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আহারান্তে পাণ চিবানর ব্যবস্থা, ইহতে pancreatic juice অর্থাৎ পাণদ্বারা সৃষ্ট রস বহুলপরিমাণে নিঃসৃত হয়।

কেহ কেহ বলিবেন, গ্রীক্‌দিগের মধ্যে pan নামক এক অরণ্যচারী দেবযোনি ছিলেন, তাঁহারই নাম হইতে panic শব্দ নিষ্পন্ন। ইহাকেই বলে পুঁথিগত বিদ্যা! এই জন্যই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' একটা প্রবাদ আছে। এই পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতগণ জানেন না যে এই Pan দেব আদিতে পাণের অধিষ্ঠাতা দেব, এবং তাঁহার নিবাসারণ্য ব্যাঘ্রতরক্ষুসঙ্কুল কণ্টকারণ্য নহে, পাণের বরজ। কল্পনাকুশল সৌন্দর্যপ্রিয় কবিত্বপ্রবণ গ্রীক্ জাতি প্রকৃতির প্রতি বৃক্ষে, প্রতি লতায়, প্রতি পুষ্পে দেবতার সঞ্চার দেখিতেন, তাঁহারা কবিত্বরসাভিষিক্ত প্রেমিকপ্রেমিকার রসালাপের নিত্য-সহচর পাণের বেলায় সে ভাবটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন ইহা কি সম্ভবপর? ক্রমে গ্রীক জাতির মন বিস্তারলাভ করিলে প্যাণ (রোমীয় ফণস্) এই

পাণপত্র হইতে সমস্ত উদ্ভিদ্-প্রকৃতির দেবতা হইয়া পড়িলেন। পল্লব-গ্রাহী পণ্ডিতগণ শুদ্ধ এই শেষ কথাটাই জানেন'।

এতক্ষণে প্রমাণ হইল পাণ 'কোথায় ছিল'; এক্ষণে ভারতবর্ষে 'কে আনিল এ মধুর পাণ' ইহার বিচার করিতে হইবে।

সকলেই জানেন, পুরাকালে ফিণীশীয় জাতির বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রসার ছিল। এই বণিগ্‌বৃত্তি জাতির নাম হইতেই সংস্কৃত বণিক্ (বণিজ্), আপণ বিপণি, পণ, পণ্য প্রভৃতি বাণিজ্যব্যবসায়ের শব্দগুলির উদ্ভব। সংস্কৃতে এরূপ বিদেশজাত শব্দের অভাব নাই, ইহা বৈয়াকরণেরা স্বীকার করেন। উচ্চারণ-বৈষম্যে ফিণীক বণিক্ হইয়াছে। এই ফিণীশীয় জাতির নিকট হইতে গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ বর্ণমালা সংখ্যালিখনপ্রণালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে, বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। এই জাতির গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের সঙ্গেই বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে, এই জাতি গ্রীস্ হইতে ভারতবর্ষে পাণের প্রথম আমদানী করেন। গ্রীসে পাণাতঙ্ক (panic) আরম্ভ হওয়াতে অন্যদেশে পাণ চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

বেদে এই জাতি পণি নামে উল্লিখিত। আর্যেরা অল্পস্বর ভালবাসিতেন, সেইজন্য ফিণীশ্যান বা পিউণিক (punic) পণি হইয়াছে। এই পণি হইতেই পাণ। পরে যখন পৌরাণিক যুগে বৈদিক যুগের আচার-রীতি সকলে ভুলিয়া গেল, তখন প্রকৃত ব্যুৎপত্তির স্মৃতিলোপ হইয়া পর্ণ হইতে পাণ, এই নূতন ব্যুৎপত্তি দাঁড়াইল। 'পুত্র' 'অসুর' প্রভৃতির শব্দের ব্যুৎপত্তির বেলাও এইরূপ ঘটিয়াছে। বিদেশ হইতে আনীত বলিয়া কপিশালগমের ন্যায় পাণও অদ্যাপি অনেক শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতধারিণী বিধবা ব্যবহার করেন না। কিছুকাল বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ার পর উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণ এদেশেই ইহার চাষ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে ইহার চাষ হয়, সেইজন্য আজও নৈহাটী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

পাণব্যবসায়ীদিগকে বারুই বলে। অনুমান হয়, স্মরণাতীতকালে এক সম্প্রদায় লোক গ্রীস্ দেশের Pherae নামক স্থান হইতে আসিয়া পাণের ব্যবসায়সূত্রে ভারতবর্ষে চাষ আবাদ করে ও ক্রমে এদেশের বাসিন্দা হইয়া পড়ে। আজকাল ঠিক এইভাবেই অনেক হিন্দু ব্যবসায়ী আফ্রিকা ও আমেরিকায় বসবাস করিতেছে। স্বদেশের নামে এই জাতি বারুই ও ইহাদের আবাদ বরজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের

স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কীর্ণতার দোষে এই বিদেশ হইতে আগত জাতি, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, হিন্দু সমাজের সঙ্গে ভালরূপ মিশিতে পারে নাই।

পাণের আর এক নাম তাম্বুল, পাণব্যবসায়ী আর এক সম্প্রদায়ের নাম তাম্বুলী বা তামুলি। তাম্বুল Stamboul হইতে আসিয়াছিল বলিয়া ইহার এই নামকরণ হয়, অথবা প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বর্তমান তমলুকে ইহার প্রথম আবাদ হয়, অথবা দাক্ষিণাত্যের তামিল জাতির সহিত ইহার কোন সংস্রব আছে. এই জটিল প্রশ্নসম্বন্ধে (সময়াভাবে) কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। অনুমান হয় প্রথমটিই সত্য, কেননা এতদ্দেশবাসীরা চিরদিনই শৌখিন।

এই অনুমান সত্য হইলে বাজারে যাহা ছাঁচি পাণ বলিয়া বিক্রীত হয় তাহাই বোধ হয় Stamboul এর আমদানী। মুসলমান ভ্রাতারা কথাটা সমজাইবেন। একই জিনিসের একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে আমদানী হওয়া মানবেতিহাসে বিচিত্র ঘটনা নহে। ইংলণ্ডে তথা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ধর্মের আমদানী, ইংরাজী ভাষায় ল্যাটিন্ শব্দের আমদানী ইত্যাদি ঐতিহাসিক উদাহরণের অভাব নাই।

আপাতত ভাষাতত্ত্ববিচারের একটু প্রয়োজন আছে। 'পাণ' শব্দের বাণান লইয়া কিঞ্চিৎ গোলযোগের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এ শব্দটিতে দন্ত্য 'ন' চালাইতে চাহেন। তাঁহারা বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেহেতু জল খাইলেই পাণ খাইতে হয়, অতএব 'পান' শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তাম্বুল অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি, বেদের 'পণি' শব্দ হইতে 'পাণ' শব্দ সিদ্ধ। অতএব মূর্ধন্য 'ণ' এ স্থলে অপরিহার্য। বৈদিকভাষা ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক ব্যাকরণের মতেও 'পর্ণ' শব্দের অপভ্রংশ পাণ, যেমন চূর্ণ=চূণ, স্বর্ণ=সোণা, কর্ণ =কাণ, বর্ণন=বাণান। [পাণ সকল পর্ণ বা পাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ইহা একাই নামটি দখল করিয়া লইয়াছে। যেমন সম্বন্ধের মধ্যে যাঁহার সহিত সকলের অপেক্ষা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তিনি সম্বন্ধী par excellence হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রঘুবংশের সিংহ এই জন্যই 'সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং' বলিয়া প্রণয়ের দোহাই দিয়াছেন ইতি সুধীভির্বিভাব্যম্।]

অতএব দেখা গেল এ হিসাবেও মূর্ধন্য 'ণ' সঙ্গতপ্রয়োগ। তবে হয়ত কেহ ব্যাকরণের সূত্র তুলিয়া তর্ক করিবেন যে অপভ্রংশে যখন রেফের অভাব ঘটিয়াছে তখন ণত্ববিধানের আর অবসর নাই। কারণ

'নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।' কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। পূর্বে যেস্থান দ্বীপ ছিল তাহার দ্বীপত্ব লোপ পাইলেও দ্বীপনামের লোপ হয় না—যথা নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ। তালগাছের অত্যন্তাভাব ঘটিলেও তালপুকুর তালপুকুরই থাকে। মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানে বলে, কোনও অঙ্গের অভাব হইলেও সে অঙ্গের অনুভূতির অভাব ঘটে না। 'মাথা নাই তা'র মাথাব্যথা' বৈজ্ঞানিক সত্য। একজন সৈনিকের পায়ের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঐ অঙ্গে কণ্ডূয়নপ্রবৃত্তি মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ সজাগ হইত। জীবিত ভাষারও জীবিত দেহের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলী আছে, অঙ্গচ্ছেদ হইলেও স্নায়ুর কার্য চলিতে থাকে। অতএব রেফের অভাব হইলেই যে শব্দের ণত্ব লোপ পাইবে ইহা সঙ্গত যুক্তি নহে। বরং এরূপ বর্ণবিন্যাসে ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়তা করে।

এক্ষণে ব্যাকরণের কচ্‌কচি ছাড়িয়া এই দেশব্যাপী আতঙ্কের নিদাননির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। পাণে কিরূপে ও কেন পোকা ধরিল? কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরার কথা জানা আছে। 'কদু কুম্‌ড়ো ছেড়ে আল্লা সর্‌ষির মধ্যি তেল,' মাণিকপীরের গানে একথাও শুনিয়াছি। কিন্তু এ যে তাহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর। 'বৈদ্যবাটী' অর্থাৎ কুম্‌ড়া মুলা বেগুনে পোকা হইলে ত কোন ক্ষতি ছিল না। বাল্যকালে একবার মাছে পোকা হইয়াছিল অল্প অল্প মনে পড়ে। কিন্তু সে সময়ে কেহবা চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন, কেহ বা অতি সুবিবেচনার সহিত অনুকল্পে মাংসভোজন করিয়া 'কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে।' রঙ্গপুর অঞ্চলে পাকা আমে পোকা দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সে দেশে অজস্র কাঁঠাল মেলে। কিন্তু পাণে পোকা, এ যে অসহ্য অকথ্য অবাঙ্‌মনসগোচর! যাক্, বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব-নির্ণয়ক্ষেত্রে মিছামিছি প্রলাপবাক্যপ্রয়োগে কোন ফল নাই।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, হ্যালির ধূমকেতু যখন পৃথিবীর সহিত সঙ্ঘর্ষে আসে তখন অজস্র উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সেই উল্কাপিণ্ডের ধ্বংসাবশেষ তাঁহারা বহু অনুসন্ধানেও জলে স্থলে অন্তরিক্ষে কোথাও পান নাই। এমন কি সম্ভব নহে, যে ঐ উল্কাসমূহের সূক্ষ্ম অণুগুলি পাণের বরজে পতিত হইয়াছিল এবং ভাদ্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ডিম্বাকৃতি অণুগুলি ফুটিয়া কীট আকারে দেখা দিয়াছে? একজন সংবাদপত্রের পত্রপ্রেরক নীল পীত হরিদ্রা প্রভৃতি নানানবর্ণী পোকা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 'ইন্দ্রধনু চূর্ণ হ'য়ে' এরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে

কিনা কে জানে? যাঁহারা আকাশতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁহারা এই সকল (hypothesis) অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে এরূপ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের বাহিরে, নীলনদের তীরে বা দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে, এমন কোন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে যাহার দরুণ এই অত্যাহিত। কেননা সম্প্রতি একজন বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণায় ও বিস্তর নূতন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাকৃতিক কারণ দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যপ্রদেশে নিহিত রহিয়াছে। 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?'

পাণের পোকার নিদাননির্ণয় একটু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইহার মধ্যেই রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে পাণে তিনি অণুবীক্ষণযোগেও কোন পোকা দেখিতে পান নাইঃ—যদিও অনেকে শাদা চোখেই দেখিতে পাইতেছেন ও বলিতেছেন "still it moves"! রায় বাহাদুরের এই অভয়বাণী যদি সত্য হয়, তবে বলি চুণীবাবুর মুখে ফুল-চন্দন—শ্রীবিষ্ণুঃ—পাণসুপারি পড়ুক্। তিনি আতঙ্কনিগ্রহ করিয়া হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমানসমাজ হইতে কোন খয়ের খাঁ হাকিম মুস্কিল আসান করিলেই সোণায় সোহাগা হয় অর্থাৎ পাণে চুণখয়ের সমান হয়, বাঙলা মায়ের উভয় সন্তান মায়ের দুই গালের চর্বিত পাণ খাইয়া ধন্য হয়। [শেষ কথাটিতে কেহ স্বরাজের বিভীষিকা দেখিবেন না ত?]

যাহা হউক এই হুজুগ বেশীদিন থাকিলে বাঙালীর ধর্মকর্ম, বাঙালীর সামাজিক জীবন, বাঙালীর কাব্যসাহিত্য, সব রসাতলে যাইবে। বাঙালীর উন্নতিবৃক্ষে পোকা ধরিবে। এই হুজুগ চলিলে, বাঙালীর আসরে আর ঘন ঘন তামাক-পাণ ও পরনিন্দার অনুপান চলিবে না, বাঙালী গৃহিণী আর স্বামিবশীকরণের অভিপ্রায়ে পাণের সঙ্গে শিকড় খাওয়াইতে পারিবে না, বাঙালী বীর আর পাণের থেকে চুণ খসিলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাইতে পারিবে না, বিবাহের স্ত্রী-আচারে আর হাঁইআমলা বাঁটিয়া বাঙালী বরের দুই গালে পাণ দিয়া মার্কা দেওয়া চলিবে না, শুভদৃষ্টিকালে আর কনের শরমমাখা ঢল্‌ঢলে মুখখানি পাণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চলিবে না, বাঙালীর ঘরের কচি মেয়ে আর 'পাণ, পাণ, পাণ কোথাও না যান,' বলিয়া সাঁজপূজনী ব্রত করিবে না, আর পাণ দিয়া ঠাকুরাণীবরণ হইবে না, পাণসুপারির অভাবে সত্যনারায়ণের পূজাপাঠ চলিবে না, ব্রাহ্মণভোজনের রজতখণ্ড দক্ষিণার সঙ্গে আর পাণ দেখা দিবে

না, খেম্‌টার আসরে আর পাণ দিয়া খেম্‌টাওয়ালী বরণ হইবে না, চাপ্‌-রাশী সাহেবের আর 'পাণ খা'বার জন্য' শিকি বক্‌শীশ মিলিবে না।

তাহার পর কাব্যসাহিত্যের কথা। কাব্যের দিক্‌ হইতে দেখিতে গেলে আপাতত মনে হয় বটে, পাণে পোকা হইয়া ভালই হইল। কবিদের একটা নূতন উপমা জুটিল; এতদিন সেই মামুলি ব্যবস্থা ছিলঃ—চন্দ্রে কলঙ্ক, বসন্তবায়ুতে গরল, কুসুমে কণ্টক, যুবতীর মুখে ব্রণ, রমণীহৃদয়ে কপটতা, ইলিশমাছে কাঁটা—এখন হইল পাণে পোকা। অর্থাৎ জগতে কিছুই সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু এই নূতন উপমা আপাতমনোরম পরিণামবিষম। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি তাম্বূলরসের অভাবে অচিরে বাঙ্গালীর জীবনে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে কাব্যরসের অত্যন্তাভাব ঘটিবে। সাহিত্যপরিষদের বিজ্ঞানপিপাসু সম্পাদক ও সভ্যগণ একবার এ সর্বনাশের কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

প্রথমেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় যে ডানাঝরা পরীরা 'মিঠাপাণের খিলির সঙ্গে মিঠা কথা' বেচিত তাহারা দুর্লভদর্শন হইল। হায়! আর আমরা সেই কাব্যের উপেক্ষিতা তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখার পপুলার সংস্করণগুলিকে দেখিতে পাইব না; স্ত্রীস্বাধীনতার সেই জ্বলন্তচিত্রগুলি না দেখিতে পাইয়া সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারে আর আমাদের তাদৃশ নিঃস্বার্থ অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মিবে না; সৌন্দর্যচর্চার (aesthetic culture) এমন সুগম পন্থা, এমন সুলভ সহায় আর থাকিবে না। হায়! 'ইংলিশ্‌ম্যান' তথা 'প্রবাসী' পত্রিকার বিরাট আন্দোলনে যে ফল ফলিল না, সামান্য একটি পোকায় সে বিভ্রাট ঘটাইল।

অথবা মৃদু বস্তু হিংসিতুং
মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।

পাণওয়ালীদের সংহারের জন্য ইংলিশ্‌ম্যানের অশনি ও প্রবাসীর কষাঘাত কাজে লাগিল না, ক্ষুদ্র একটি কীটে প্রমাদ ঘটাইল। হায়! এ যে ক্লিওপেট্রার অপেক্ষাও সাঙ্ঘাতিক অবস্থা !!

শুধু ইহাই নহে। আর দুরন্ত শিশুকে 'ঘুমপাড়ানিয়া মাসীপিসী' 'বাটা ভরা পাণ গাল ভ'রে' খাইবার লোভে ঘুম পাড়াইতে আসিবে না। সুতরাং নবীনা জননীদিগের কাব্যচর্চার তথা প্রণয়চর্চার অবসর হইবে না (খোকা যে ঘুমায় না)। ইংরাজীনবীশ কবি আর বাঙ্গালীর মেয়ের রূপ বর্ণনায় 'তাম্বূলে তামাকুরস রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট' পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া আসর জমাইতে পারিবেন না। ভাবুক কবি আর "পাণ কিন্‌লাম চূণ

কিন্‌লাম ননদভাজে খেলাম। একটি পাণ হারাল দাদাকে ব'লে দিলাম।" ইত্যাকার মেয়েলী ছড়ার কবিত্ববিশ্লেষণ করিতে পারিবেন না। রসিক সমালোচক আর 'বঁধু একটা পাণ খেয়ে যাও' গানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইয়া ভক্তহৃদয় পুলকিত করিতে পারিবেন না। ললিত আর তেমন করিয়া লীলাবতীর চিবুক ধরিয়া "লীলাবতী ক'রেছ কি হেরে হাসি পায়। রক্তগঙ্গাতরঙ্গিণী চিবুক তোমার।" বলিয়া আদর করিবে না। আর আমরা বিলাসভবনে সে পাণের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় দেখিতে পাইব না। নবীননবীনার দাম্পত্যলীলায় সে কাড়াকাড়ি ছোড়াছুড়ি, সে পাণের দোনার grapeshot, সে 'রাধাধরসুধাপান', সে 'দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া', আর দেখিতে পাইব না। আফিসের ফেরতা ঘরে আসিয়া আর তেমন করিয়া পাণের বাটা সাম্‌নে লইয়া চূণখয়েরে রঞ্জিতাঙ্গুলি তাম্বুল-রসে রঞ্জিতাধরা 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা' কুট্টিমাসীনা স্রস্তবসনা মনোহারিণী নারীমূর্তি দেখিতে পাইব না—

(পতন ও মূর্ছা)

'মানসী'। আশ্বিন ১৩১৭

বো ল্ তা ও ম ধ্যা হ্ন

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি সন্ধ্যারও নহি, উষারও নহি, আমি মধ্যাহ্নের জীব। বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম—জন্মাবধি রবিকিরণ পান করিয়া এ দেহ গঠিত। সারা হিমরজনী অন্ধ জীবনভার বহন করিয়া চাকের মধ্যে জড় হইয়া থাকি, ভীতি-বিহ্বল বিবশ দেহে ক্ষীণ প্রাণ কোনপ্রকারে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রভাতে রবিকিরণ আসিয়া প্রথম আমাকে জাগাইয়া তুলে—আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে. নয়নে দৃষ্টি দেয়। আমি মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে জন্মিয়াছি, তাই রবিকরে আমার এত আনন্দ। রবিরই মত আমার কনক-বর্ণ, মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য তীব্র। সন্ধ্যাছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে, উষাছায়ায় হৃদয়ে একটুকু মৃদু তরুণ অরুণ-আভা, মধ্যাহ্নের মত এত আলো কোথায়? এত রূপ কাহার? মধ্যাহ্ন আর আমি। দুইজনেই কেবল আলোক, কেবলমাত্র ঔজ্জ্বল্য, ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, ম্লান পাণ্ডু মধুরতা নাই। এরূপ কেবলই তপ্ত তীব্র দহন-জ্যোতি। তাই ত তোমাদের কবিরা মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য কদাচ গাহেন, বোলতার সৌন্দর্যও গাহেন না। এ সৌন্দর্যে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, এ রূপ মর্মে মর্মে তীক্ষ্ণাগ্র সূচির মত বিঁধিতে থাকে, দারুণ দহনে কবিতা উথলে না। সন্ধ্যা উষা তরল কোমলভাবে হৃদয় প্লাবিত করে, প্রখর জ্বলন নাই, তরঙ্গ ভঙ্গে মধুর ছন্দে কবিহৃদয় সে সৌন্দর্যে বহিয়া যায়। মধুকাতরহৃদয়ে মৃদুগুঞ্জনে পদ্মিনীর সহিত ভ্রমর মধুরালাপ করে, কবি-হৃদয় মধুকাহিনী মুগ্ধ। কিন্তু মধ্যাহ্নের সৌন্দর্যও ন্যূন নহে, ভ্রমরও সৌন্দর্যে বোল্তার নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। সৌন্দর্যই ত প্রখর। আলোক ঝলসিবে না ত কি ঝলসিবে?

আমি মধ্যাহ্নের—তা' কাব্যে স্থান পাই বা না পাই। মধ্যাহ্নকে আমি আপনার অন্তরে অনুভব করি—এমনি আমার মত হৃদয়, এমনি নীরব নৈরাশ্য, নিশিদিন অন্তরে অন্তরে এমনি দারুণ দহন। এই চাকে বসিয়া দেখিতেছি, আমার চাকের সম্মুখে বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্ত দেশ ব্যাপিয়া অনল-মধ্যাহ্ন বহিয়া গিয়াছে—কম্পিত তীব্র লাবণ্যে ধরণী দিশা-

হারা। এই ত সৌন্দর্য। এমন প্রখর তেজ! এমন সুতীব্র স্নেহ। যেখানে দিয়া বাহিয়া যায় সব শুকাইয়া, যেখানে হৃদয় খুলে সব জ্বালাইয়া। জ্বালা নহিলে ত সৌন্দর্য মৃদু। আমারও সৌন্দর্য তাই এমনি জ্বালাময়—যেখানে বিঁধে তীব্র মদিরার মত প্রতি শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া। তোমরা ত এ জ্বালা সহিতে পার না, সৌন্দর্য কিরূপে অনুভব করিবে? আমি হুল বিঁধাইয়া আপন অন্তরে মধ্যাহ্নের তীব্রতা উপভোগ করিতেছি।

এক একবার ইচ্ছা হয়, ঐ কবিহৃদয়ে এই হুল ফুটাইয়া সে তীব্রতা বিঁধিয়া দিই। কিন্তু তোমাদের কবি কি এ সৌন্দর্য সহিতে পারিবেন?

তোমাদের কাব্যে ত কোথাও দারুণ তীব্রতা অনুভব করা যায় না। কেবলই ঢলঢল কোমলতা, শিথিল মৃদু আলস, মধুর প্রেমে অর্ধনিমীলন। এত মধুরতার মধ্যে তোমরা নিমগ্ন হইয়া থাক কিরূপে? আমি কেমন মধ্যাহ্নের প্রখর হৃদয়ে জ্বালাবিদ্ধ জীবন লইয়া চিরদিন এই রবিকিরণের জ্বলন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি। মধ্যাহ্ন আমাকে জানে, আমি মধ্যাহ্নকে জানি। সন্ধ্যার মত এ কেবলই প্রশান্ত মধুরতা নহে। তাই ত এত সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াও একেবারে গলিয়া যাই না, আশা মিটে না। সন্ধ্যায় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, হৃদয় অবসন্ন, একরত্তি জীবনের পরে বৃহৎ সংসার যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, সৌন্দর্য তখন কোথায়? অন্ধকার ঘনাইয়া ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে না। তোমাদের কবিরা বোধ করি আধ ঘুমঘোরে স্বপ্নে সন্ধ্যার সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। মধুরতা বৈ তাহা আর কিছুই নয়। মধ্যাহ্ন সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র। পূর্ণালোকে স্বপ্নরচিত হয় না, কোমলতাও তাদৃশ নাই। কোনও কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া। এইজন্য মধ্যাহ্নের তরল আলস-ভাবেই তাঁহারা মুগ্ধ। কিন্তু এ মৃদুতায় আমার মন উঠে না। আমার মত এমনি হুল বিঁধিয়া সে তীব্রতায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকে একেবার অন্তরে অনুভব না করিলে সকলই ব্যর্থ। তোমরা তীব্র প্রখর জ্বালা উপভোগ করিতে পার না, হুল নাই, মধুরতায় গলিয়া যাও। আমি চিরদিন এই প্রখর জ্বালায় জ্বলিতে থাকি।

এই জ্বালায় মধ্যাহ্নের প্রেম ব্যক্ত হয়। মধ্যাহ্নের প্রেম মর্মবেধী—আমারই মত বিঁধিয়া বিঁধিয়া। বেধন প্রেমের ধর্ম—জ্বালা প্রেমে অনিবার্য। তোমরা এত করুণ হৃদয়, প্রিয়জনের অন্তরে ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব কর না? প্রিয়জনকে ভিন্ন পৃথিবীতে কে কাহাকে ব্যথা দিয়া থাকে? এই জন্যই

এ দারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে এমন একটু সুতীব্র কোমলতা, এ কঠোর জ্বালায় এমন করুণ আনন্দ। প্রেম জ্বালাইয়া জ্বলে এবং এই জ্বলনেই তাহার জীবন। মধ্যাহ্ন মধুর ধার ধারে না, কোমলতায় হৃদয় হরণ করে না, অন্তরের অন্তরতম দারুণ জ্বালা বিদ্ধ করিয়া কেবলি দহিতে থাকে। গুঞ্জনে ও মধুরতায় যে যথাসর্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহে আমি ত তাহার প্রেম বুঝি না। তাই প্রেমে মধ্যাহ্ন আর আমি। মধুরতায় সন্ধ্যা আছে, ঊষা আছে, ভ্রমরও আছে বৈকি।

ইহাদের প্রেমে কি জ্বালা নাই? কিন্তু সে জ্বালা বড়ই মধুর। এত মধুর যে তাহাতে প্রেম জ্বলে না। সন্ধ্যার প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব, ঊষার ত জ্বালা নাই বলিলেই চলে, আর ভ্রমরের মধুতেই পরিতৃপ্তি। ভালবাসিয়া আশ মিটে না শুধু আমার আর মধ্যাহ্নের। যতই বিঁধি ততই বিঁধিতে চাহি—যতই জ্বলি ততই আরও জ্বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ ভালবাসা ত কেহ অনুভব করে না। মধুবিহ্বল মদির-মোহই এখানে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। প্রেম যেন নিতান্তই ছায়ায় ছায়ায়, একটুকু আলোক সহে না, উত্তাপ সহে না, কেবলি অতি মৃদু ললিতগলিত কোমলতা কৃষ্ণ অন্ধকার এবং ছায়ালীন অনাতপ মাত্র অবলম্বন।

কৈ আলোকে ত তোমাদের প্রেম ফুটে না। বিধাতা, কালোর প্রতি তুমি বুঝি কিছু সদয়। তাই এই মর্ত্য মানবেরাও দেখি সারাক্ষণ কোকিল ভ্রমর আর সন্ধ্যা লইয়াই রহিয়াছে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের সহিত কোমলতা যেন অবিচ্ছেদ্য। কেবল, গৌরাঙ্গে যে তোমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া বুঝিতে পারি না। আর এই পূর্ণিমা নিশিথে বিমল জ্যোৎস্নালোকে এত প্রেমের গানই বা উঠে কোথা হইতে? এ কি বিদ্রূপ! না ছলনা! জানি না, জ্যোৎস্না-লোক অস্পষ্ট এবং ছায়াময় বলিয়া যদি তাহার মধ্যে প্রেমের রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমার নিকট প্রেমে তীব্রতার মত আর দারুণ রহস্য নাই।

এই জন্যই মধ্যাহ্নের প্রেম সর্বাপেক্ষা রহস্যময়। দিগন্ত হইতে দিগন্ত তপ্ত স্বর্ণপ্লাবন! যেমন তীব্রতা তেমনি প্রেম! প্রেম নহিলে এত সৌন্দর্য টিঁকিয়া রহিবে কিসে? কিন্তু কাব্যে ত এ সৌন্দর্য স্থান পায় না। নাই বা পাইল। আমি তোমাদের অন্তরে এই সৌন্দর্য চিরদিনের তরে বিঁধিয়া দিতে চাহি। বিধি হে, কবিকে যদি আমার মত এমনি হুল দিতে! মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য হুল বিঁধিয়া অনুভব করিবার—জ্বলিতে হইবে কিনা। মধুরতাই যদি চাও ইহাতে কি নাই? প্রখর যৌবনে কি আর কোমলতা অনুভব করা যায় না? কিন্তু তাহা এই তীব্রতার মধ্যেই। হুল ফুটাইয়া যে এই তপ্ত

তীব্রতা না অনুভব করিল, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য তাহার নিকট অসম্পূর্ণ। তবু ছায়ায় দাঁড়াইয়াও হে কবি, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য তুমি যে গাহিয়াছ, ইহাতেই তোমার কাব্যরস পানে আনন্দ পাই। তাই আরও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ উদার হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া দিই—তুমি আমাকে অনুভব কর, আমি তোমাকে অনুভব করি।

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবিকে অনেক কথা বলি—কবিকে নহিলে আর কাহাকে বলিব?—কিন্তু সহসা এক একবার মনে হয় যে, তোমাদের কবিও যেন কোথায় কবে মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অনুভব করিলে কি হইবে,—সে কেবল ক্ষণিকের চকিত অনুভব—আমার মত এমন নীরবে সে অনলজ্বালা সহিতে পারেন নাই, জ্বালা ধরিতে না ধরিতে ছায়ায় গিয়া হৃদয় জুড়াইয়াছেন। তাই প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ। কবি হৃদয়ও ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে। দুষ্মন্তের প্রখরজ্যোতি কবি নীরবে সহিতে পারেন না। শকুন্তলায় তাঁহার হৃদয় শান্তি পায়। এই শকুন্তলার হৃদয়ে বসিয়াই তিনি দুষ্মন্তের সৌন্দর্য পান করিতেছেন। শকুন্তলা হইতে দূরে পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুষ্মন্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে কে? তবু জগতের প্রাচীন কবি তুমি মধ্যাহ্নকে অনুভব করিয়াছ। শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্মন্তের প্রেম বিঁধিয়া অবধি শকুন্তলা জ্বলিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রেম না জ্বলিয়া ত অনুভব করিবার যো নাই। মধ্যাহ্ন ত চিরদিন জ্বলিয়া সারা।

কিন্তু এই সুন্দর মধ্যাহ্ন তীব্রতায় একটা কালো ভ্রমর আসিয়া দেখা দিল কেন? কবি, তুমি ঐ কালোরূপে বড়ই মুগ্ধ। ভ্রমরকে ছায়ায় রাখিয়া তবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছ বটে—সে ত আর প্রখর মধ্যাহ্ন সহিতে পারিবে না। কিন্তু যে ছায়া মধ্যাহ্নকে চায়, ভ্রমরের গুঞ্জন তাহার ভাল লাগিবে কেন? শকুন্তলা ঐ বাচাল ভ্রমরটার প্রতি বড়ই বিরক্ত—বারবার সখীদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছেন। ভ্রমরের ভাগ্যে অঞ্চলতাড়না! শুধু আমার কপালে নয়? হোক্ হোক, মানব-সমাজে বিচার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনিতে পাই, শকুন্তলাও নাকি মনে মনে ভ্রমরের উপর সদয়। তাই ত মিলন না হইতে হইতে শকুন্তলার কপালে দারুণ বিচ্ছেদ। ভ্রমর মধুগুঞ্জনে যত বিঘ্ন ঘটায় বৈ ত নয়। কবি, আমাকে ত ডাকিবে না। ভ্রমর তোমার প্রিয়পাত্র।

কিন্তু আমার হুল বিঁধিলে তোমার হৃদয় সৌন্দর্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইটুকু সহিতে এত কাতর? আমি যে তোমার হৃদয়ে চিরদিন মধ্যাহ্নকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। আমার মত তুমিও এমনি জ্বলিবে—এ জ্বলনের অবসান নাই—চিরদিন মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য অনুভব কর।

যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে তখন না হয় ভ্রমরকে ডাকিও। তাহার গুঞ্জনে ঘুমঘোরে সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে। ঐ কালোরূপ দিয়া ত মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারিবে না। ভ্রমর গুণগুণ করিয়া তোমাদেরই মত সন্ধ্যার সৌন্দর্য গাহেও বটে। গাহিবে না কেন? সন্ধ্যারই মত অন্ধকার রূপ কিনা। আমার ত তাহা নয়। মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য তীব্র, প্রেম তীব্র, হুল তীব্র। বিধাতা ভ্রমরকে বৃথা হুল দিয়াছ। হুলই যদি দিলে তবে অমন কালোরূপ করিলে কেন? কালোরূপে বড়ই যেন কেমন সুখের ভাব; হুলে এত সুখ সহে না। আর ভ্রমর সৌন্দর্যেরই বা কি ধার ধারে? বিস্তৃতি সৌন্দর্যের ধর্ম কৃষ্ণ অন্ধকার ত কেবলই গুটাইয়া আসে। কিন্তু এখানে বোধ করি লোক অন্ধ হইয়া সৌন্দর্য দেখে। তাই অন্ধকারের প্রভাবে আমি আর মধ্যাহ্ন বাদ পড়িয়া যাই। তা হোক। এ সৌন্দর্য ত আর অস্বীকার করিবার যো নাই। কাব্যে স্থান দিয়া সূর্যের গৌরব কেহ বৃদ্ধি করিতে পারে? না চোক বুজিয়া সে সৌন্দর্য হ্রাস করা যায়?

তোমাদের কাব্যে আমার হুলের জ্বালা না বিঁধিলে আর মধ্যাহ্নকে সুতীব্ররূপে উপভোগ করিতে পারিতেছ না। এখন দূর হইতে কেবল রাখাল বালকের বংশীধ্বনির উদাস কোমলতায় তোমরা মুগ্ধ। বোধ করি, যাহা কিছু বিঁধে তাহাই তোমাদের নিকট কোমল—কেবল আমার এই দারুণ হুল বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বংশীধ্বনিতে তীব্রতা কতকটা যেন কমিয়া আসে বটে। রাখালেরা ছায়ায় বসিয়া বাজায় কিনা, তোমরাও ছায়ায় বসিয়া শুন। আর তাহারা ছায়ার প্রেম যেমন অনুভব করে মধ্যাহ্নের দারুণ ভালবাসা ত তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবু কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাইতেন, রাধিকার হৃদয় কি জ্বলিত না? মধ্যাহ্ন বংশীধ্বনিতে তীব্রতার রন্ধ্রে উদাস নৈরাশ্য ফুঁ দিয়া কোমলতা বাহির করে। এই জন্য এ কোমলতা ঔদাস্যে, মধুরতায় নহে।

মধুরতা যেমন সন্ধ্যায়! ম্লান মুখে রবি ধীরে অস্ত যায়, চন্দ্র উঠে—তাহাও মধুর। আলোক কোথাও ফুটিতে পারে না। নীল আকাশ, অস্ফুট ছায়া, প্রশান্ত নীরবতা মিলিয়া কেবলি বিমল মাধুরী রচনা করে। মাধুরী

গার্হস্থ্যে। তাই সন্ধ্যার কেমন সুকুমার গৃহস্থ ভাব। ইহার মধ্যে আমরা যেটুকু ঔদাস্য অনুভব করি তাহা শান্তিপ্রধান। কিন্তু এ মধুরতা আমার পোষায় না। মধ্যাহ্নে আমি যেন ছুটিয়া জগতের কর্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ি; সন্ধ্যায় জগৎ নিতান্ত মধুভাবে হৃদয় প্লাবিত করে। আমি জ্বলিতে চাহি—মধু লইয়া কি করিব? জ্বালা নহিলে সৌন্দর্য আমার নিকট ব্যর্থ।

আর সন্ধ্যাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। স্বপ্নালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তাই আজও কেহ সন্ধ্যার রঙ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তোমাদের কাব্যে তাম্রবর্ণের কথাও শুনি, ধূসর বর্ণের উল্লেখও দেখি, কেহ কেহ সন্ধ্যাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সারিতে পারিলেও ছাড়েন না। বোধ করি, দূর হইতে যাহার যেরূপ বোধ হইয়াছে আন্দাজে বর্ণনা করিয়া সারিয়াছে। এখন তাই কোনও বর্ণনা অপর বর্ণনার সহিত ঠিক মিল খাইতেছে না। আমি ত স্বল্পালোকে তেমন দেখিতে পাই না, তবে অন্তরে তাহার প্রভাব কতকটা অনুভব করি বটে। আর ঐ আকাশের গায়ে রবির রাঙ্গা আলোটুকু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একরূপ দেখিও। কিন্তু এত অল্প দেখিয়া কি কাব্যে বর্ণনা করা চলে? তবু কিন্তু তোমাদের কবিদের বর্ণনা মর্ম স্পর্শ করে।

কিন্তু সন্ধ্যা তোমাদের এত প্রিয় কিসে? বোধ করি, ভ্রমরগুঞ্জনেই সন্ধ্যার প্রতি তোমাদের অনুরাগ। নহিলে সন্ধ্যাকে ত আর কেহ বড় দেখে নাই। ভ্রমর পদ্মিনীর চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুণগুণ করিতে থাকে, তোমরা প্রেম অনুভব কর। কিন্তু পদ্ম ত রবিকিরণ পানে বিহ্বল—ভ্রমরের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। দূর হইতে তাহা ত আর তোমরা জানিতে পাও না। তবে মধু দেয় কেন? মধু কি আর সাধ করিয়া দেয়? কত সাধ্য সাধনা, কত গুঞ্জন, অবসর মত ছোঁ মারিতেও ত্রুটি নাই। আর যে গুঞ্জনে তোমরা ভুল, ক্ষুদ্রা-পদ্মিনী যে ভুলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? গুণে নয়, ঐ গুঞ্জনেই ভ্রমরের ছলনা।

প্রেমে যাহারা কেবলি সুখ চাহ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুন, ভ্রমরের পদানুসরণ কর। তোমাদের নিকটেই ত ভ্রমরের পদমর্যাদা—আদর করিয়া ষট্‌পদ নাম দিয়াছ। জ্বালা সহিতে পার না, কাঁটার ঘায়ে কাতর, ভ্রমরই তোমাদের আদর্শ। গুণগুণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ফুলের মধু লুটিয়া, প্রেম ব্যক্ত কর, জ্বলিতে ত হইবে না।

কবি, তুমিই কিন্তু ভ্রমরকে বাড়াইয়া দিয়াছ। না জানি কোন্ সন্ধ্যার স্বপনে কোন্ ফুলবনে কি শুভক্ষণেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি ঐ কালোরূপ আর ঐ আরও কালো হৃদয় সুস্পষ্ট

দেখিতে পাও নাই। ঊষার মৃদু আলোকেও ত তুমি বাহির হও, একবার সে রূপ ভাল করিয়া দেখিয়া এ দারুণ ভুল সংশোধন করিয়া লইলে না কেন? ভ্রমরকে দেখিতে হয় মধ্যাহ্নে—ভ্রমর আর আমি পাশাপাশি। কেবলি স্বপ্নের কাব্য রচনা! একটুকু মধ্যাহ্নের আলো সহে না, হুলের জ্বালা সহে না! এ ছায়ালীন স্বপ্ন রাজ্যে আমি স্থান চাহি না। যেদিন তোমার হৃদয়ে এই দারুণ হুল-জ্বালা বিদ্ধ করিতে পারিব, তোমার নশ্বর কাব্যকে অমর করিয়া দিয়া মরিব। সেদিন হইতে তোমার কাব্যে মধ্যাহ্ন জ্বলিতে থাকিবে—সেই জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে মগ্ন হইয়া কেবলি জ্বলিয়া রহিব। আপনাকে ভুলিব, জগৎকে ভুলিব, আর তাহার পূর্বেই জগতের হৃদয় হইতে ভ্রমরের স্থান ঘুচাইব। এখন কবি তুমি হৃদয় লইয়া এস—আমি সেখানে এই হুল ফুটাইয়া দি। বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ।

'বলেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী'। ১৩১৪

বি চ র ণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সেখানে আর এ পাহাড়ের ঋতুপর্যায়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বসন্ত এখানে এসে-যায় শীতের আগেই দিগ্‌বিদিকে ফুলের মেলা বসিয়ে দিয়ে। আমাদের সেখানে যখন ফুলেদের বাসর-জাগবার পালা, এখানে তখন তুষারের বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে সব ফুলগুলি। সেখানে বসন্ত দেখা দেয় শীতের আসরে শিউলিফুল ছড়িয়ে; এখানে শীত আসে বসন্তের সভায় সাদা চাদর টানতে টানতে, ফুল মাড়িয়ে।

শীত গলে পড়ছে বর্ষায়, বর্ষা ফুটে উঠছে বসন্তে, বসন্ত খিন্ন হতে হতে শরতের জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ঝিক্‌মিক্ করতে করতে তুষারের শুভ্রতায় গিয়ে শেষ হচ্ছে—এখানের ছন্দটা এইরূপ।

এখানে এসে অবধি হিমালয়কে একবার দেখে নেবার জন্যে উঁকি দিচ্ছি—এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

এ যেন একটা নীহারিকার গর্ভে বাস করছি। দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল; রাত আসছে অঞ্জন শিলার মতো হিম, অন্ধকার।

আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশ-বিশ হাত পৃথিবী গুটিকতক ফুল-পাতা নিয়ে, যেন অগোচরের কোলে এক-টুকরো জগৎ; আর, আমরা যেন এক-ঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের কাছে চারিদিক এখনো অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেন নি—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার গায়ে পার্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু একটু দেগে রেখেছেন, অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।

এই যে পরিচয়ের পূর্ব মুহূর্তে কুয়াশার যবনিকাটি দুলছে, এপারে-ওপারে বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম ব্যবধান, একে সরিয়ে যেদিন শুভদৃষ্টি হবে সেদিন অন্তর গিয়ে মিলবে বাহিরে, বাহির এসে লাগবে অন্তরে। এই কথাটাই এক-গোছা সবুজ পাতা আমার জানালার কাচের বাহিরে, কেবলই ঘা দিয়ে দিয়ে জানাচ্ছে কাচের এপারে ঘরের বন্দী প্রকাণ্ড একটা

পতঙ্গকে। অজানার দিক থেকে একটির পর একটি দূত—চঞ্চল একটি নীল পাখি, ছোটো একটি মৌমাছি—তরুলতার কানে-কানে, অপরাজিতার ঘোমটা একটু খুলে, এই কথাই জানিয়ে যাচ্ছে দিনের মধ্যে শতবার।

আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো অন্ধকারের দিকে মুখ ক'রে। কলঙ্ক-ধরা একখানা কাঁসরের মতো গভীর রাত্রিটাকে কালো ডানার ঝাপ্‌টায় বাজিয়ে তুলে মস্ত একটা ঝড় আজ মাথার উপরে ক্রমান্বয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন দিশেহারা পাগল পাখি।

রাত্রি শেষে বর্ষা দিগ্‌বধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি অরুণ-আভা দেখা যাচ্ছে। আর, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ সীমা পর্যন্ত; আর রঙও নেই, রূপও নেই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটিমাত্র পাহাড়ি ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের নববধূ সে, আলোর প্রতীক্ষা করছে। প্রজাপতির পাখার চেয়ে সুকুমার এর পাপড়িগুলি, এত ছোটো, এত কচি—একেই ঘিরে আজ প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরিশিখরে, মেঘলহরীর তীরে, বনের পাখির কণ্ঠে, নীহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্বতের কলভাষী দুরন্ত শিশু এই যে জলধারা—এর ঝরে পড়ার মধ্যে।

কাঁচা সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত-বাউরির বুকের পালকের অফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই আলোর উপরে সব-প্রথম তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের লেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।

এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত-দিনের, তরুণ দিনের, প্রথম আশীর্বাদ পড়েছে; সে একটিমাত্র আলোর করকা। আর তারই আভা তুষারের সহস্র ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো ক'রে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল-ফোটার ছন্দটি ধরে।

আমার এ বাগানখানি পাহাড়কে আঁকড়ে ধরে শূন্যের উপরে ঝুলে রয়েছে। এখানে এক-ঝাড় পাহাড়-মল্লিকা, এক-ঝাঁক পাখি আর আমি। এইখানটিতে তুষারের বাতাস নিয়ত গাছের ফুল, পাখির গান, ফুটিয়ে তুলছে। আমার গান নেই। সকাল-সন্ধ্যায় একখানা পাথরের মতো নিশ্চল নির্বাক আমাকে বাতাস আর আলো শুধুই স্পর্শ করে যাচ্ছে।

আমাদের যারা অনেকবার পাহাড়ে এসেছে এবং যারা নূতন আগন্তুক,

তাদের দেখি ওঠা-নামা চলা-ফেরার অন্ত নেই। যেখানে ইংরেজি বাদ্য, গোরার নাচ, সেই সকল মেলাতেই এরা ত্রিসন্ধ্যা যোগ দিয়ে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে—হয় ঘোড়ার পিঠে নয় তো নিজের পায়ে দুই জোড়া চাকা বেঁধে। মাড়োয়ারি রাজার ফরাসি-ধরণের বৈঠকখানার চুড়োয় বাতাসের ধনুকে চড়ানো ঐ লোহার তীরটার মতো, এরা দেখি, শূন্যকে বিঁধে-বিঁধেই কেবল ঘুরছে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে; ছুটেও চলছে না, উড়েও যাচ্ছে না।

আমার চলার গণ্ডীটাও যে খুব বড়ো, তা নয়। একটি পাহাড়ের যে-পিঠে সূর্য উদয় হন আর যে-পিঠে তিনি অস্তে যান, এইটুকুমাত্র প্রদক্ষিণ করে উঁচুনিচু একটা পথ; এই পথ দিয়ে কাঁটা-দেওয়া একটা মস্ত লাঠি নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাথর কুড়িয়ে, গাছ সংগ্রহ করে—মাসের মধ্যে ত্রিশটা না হোক, ঊনত্রিশ দিন তো বটেই—এই পথটিতেই সকালের আলোয়, সন্ধ্যার ছায়ায়, দিবা দ্বিপ্রহরে, রাতের অন্ধকারে। এইখানে পাথরের গায়ে কচি শ্যাওলার নূতন সবুজ, কেলুবনের ফাঁকে নীল আকাশের চাঁদ, একটি নির্ঝরের শীর্ণ ধারা, আর পর্বত ছেয়ে দুর্গম বনের নিবিড় রহস্য; প্রাতঃসন্ধ্যায় ভ্রমরের গুঞ্জন, সায়ংসন্ধ্যায় পাখিদের গানের শেষে অন্ধকারের সেই ঝিম্‌ঝিম্‌ যা শুনছি কি বোধ করছি বলা কঠিন।

এই পথের একটা জায়গায় একখানা প্রকাণ্ড সাইন্‌ বোর্ড, তাতে লেখা আছে—'সাধারণ শড়ক নয়। অনধিকার প্রবেশ দণ্ডিত হইবে।' পর্বতের কোলে এই 'সাইন্‌'টা আমাকে প্রথম দিন বড়োই ভয় দিয়েছিল। কিন্তু, সন্ধানে জানলেম, যারা এই কয়েদের ভয় দিয়ে সারা পাহাড় ঘিরে নিতে চেয়েছিল তাদের মেয়াদ অনেকদিনই ফুরিয়েছে। পথটা এখন আর অনন্যসাধারণ নেই। এবং সাধারণেও এই পথটার আশা অনেক দিন ছেড়ে দিয়ে এক ধাপ নিচে স্কুলবাড়ি কুয়োখানা প্রভৃতির গা ঘেঁষে আর একটা ঘুরুনে রাস্তা—সার্‌কুলার রোড—ক্লব-ঘর, ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড ও বাজার পর্যন্ত, জিলাপির পাকের ধরনে রচনা করে নিয়েছে। সুতরাং এ রাস্তাটার ভবিষ্যতেও পথ হয়ে ওঠবার কোনো আশা নেই। এ বিপথ হয়েই রয়ে গেল; মানুষের কাজে লেগে পথ হয়ে ওঠা এর ভাগ্যে আর ঘটল না।

অনেকদিন আনাগোনায় এই বিপথটার একটা মানচিত্র আমার মনে আঁকা হয়ে গেছে। পাহাড়ের পশ্চিম গা বেয়ে প্রথমটা সে ঠিক পশ্চিম

মুখে সুন্দর বাঁক নিতে নিতে 'সহস্র-ধারা'র উপত্যকার দিকে কাত হয়ে চলেছে। ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নিচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে অকস্মাৎ আবার পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে। একটু দূর গিয়েই হঠাৎ পর্বতের পুবের দেয়াল ঘেঁষে আবার পশ্চিমে দৌড়। সেখানে একদল মহিষ চোখ রাঙিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেই, পাহাড়ের একটা গড়ানে ভাঙন দিয়ে সে দ্রুত নেমে গিয়ে, সোজা আকাশের দিকে উঠেই, সহসা মোড় নিয়ে পর্বতের পূর্বগায়ে দিগন্ত-জোড়া হিমালয়ের সম্মুখে দেবদারু বনের ছায়ায় এসে লুকিয়ে পড়েছে। এই দিকটাতে সে শৈবাল-কোমল নির্ঝর-শীতল পর্বতের বাঁকে বাঁকে একলাটি খেলা করতে করতে পর্বতের পুব পিঠে আর একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে টিন-মোড়া দোকান-ঘরে দর্জি কোট সেলাই করছেন; রাস্তার এক পাশে কাদের এক-গাড়ি জ্বালানি কাঠ খরিদ্দারের অপেক্ষায় পড়ে আছে; হতভাগা চেহারার দুখানা ভাঙা ডাণ্ডি আড্ডার দাওয়ার বাহিরে চড়ায় বাঁধা পান্‌সির মতো কাত হয়ে পড়েছে। এই পর্যন্তই বিপথের দৌড়। বাকি যেটুকু অতিক্রম ক'রে আমাদের বাসায় উঠে যেতে হয়, সেটা বিপথ না হলেও বিপদ যে তার আর সন্দেহ নেই। মানুষ সেটাকে পর্বতশিখর পর্যন্ত এমন তিন-চারটে বিশ্রী মোচড় দিয়ে টেনে তুলেছে যে, সেখানে কোনো যানও যান্ না, পা-ও চান্ না যে চলি।

বিপথের শেষে পথের এই মোড়টা যেন ইস্কুল-মাস্টার, নয় তো ধর্ম-প্রচারক। তার বুলিই হচ্ছে, 'এইবার পথে এসো!' নয় তো সে বলছে, 'বিপথ হইতে পথে আইস।' এই যে রোড—সেইণ্ট ভিন্‌সেণ্ট বা তপস্বী ভিন্‌সেণ্ট মহোদয়ের রাস্তা—এখানে নিরালা একটুও নেই; মানুষের সকৌতুক তীক্ষ্ণদৃষ্টির চোরকাঁটা এখানে আমার মতো বিপথের পথিকদের জন্য শরশয্যা রচনা করে রেখেছে। পেন্‌শন্‌ভোগী এক কাবুলি আমিরের নূতন বয়ঃপ্রাপ্ত দুই-চারি বংশধর, যাদের মাথায় শিখ-পাগড়ি, গায়ে সাহেবি কোট ও পায়ে যোধপুরি পাজামা ও ডসনের বুট, তারা আজ কদিন ধরে আমার লম্বা চোগা ও গোর্খা টুপিটার উপরে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে এবং দুই বেলা আমার গা ঘেঁষেই বলাবলি করে চলেছে, 'আজব টোপি! আজব চোগা!' আজবের মধ্যে আমার দুটিমাত্র পদার্থ; দুইটিই তিব্বতীয় এবং শীতের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু, আজবের সংগ্রহ এ গরিবের

চেয়ে আমির-পুত্র কয়টির অনেক বেশি ছিল। সুতরাং যুদ্ধে আমারই হার লেখা গেল। এক মেমসাহেব শিলাতলে বসে মসুরি ভ্রমণের নোট ক'রে খাতায় কী-এক লাইন টুকে নিলেন। তাঁর সে নোট ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুই-একজন নিকট বন্ধু ছাড়া আর কারুর হাতে পড়ছে না। যাই হোক, এই রকম সব ছোটো-খাটো উৎপাত এড়াতে মানুষের পথে আমি চোগা ছেড়ে একটা প্রকান্ড সোলার টুপি ও তদুপযুক্ত চাঁদনির কোট-প্যান্ট পরিধান করে বিচরণ ক'রে বেড়াই। তাতে মানুষেরা আমায় আর তাড়া দিচ্ছে না বটে, কিন্তু মানুষের উল্টো পিঠের জীব যারা তারা আমাকে তরুশাখার উপর থেকে একটা আয়না দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে ছাড়ে না। সুতরাং বলার জ্বালায় আমার চলা দুর্ঘট হয়েছে—কী পথে কী বিপথে। অথচ ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন চলবারই।

পথে যাই কি বিপথে, চলি কি না চলি—এই দো-টানার মধ্যে যখন আমি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় কোনো রকমে পথ-বিপথ দুইয়েরই মান রেখে দিন যাপন করছি, সেই সময় দেখি, পর্বত একেবারে আপাদমস্তক ফুলের সাজ প'রে সহসা বসন্তের বাসর জমিয়ে বসেছেন। 'ফুলন ফুলত ভার ভার!' যত পাতা তত ফুল! যেখানে যত ধরা ছিল—পাথরের বুকে. শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়—সূর্যের উদয়-অস্তের যত রঙ, আজ তারা ফুল হয়ে বাহিরে এসেছে। ঋতুরাজের বাঁশির ডাকে পৃথিবীর সমস্ত সবুজ রঙটা দেখছি বিপুল হিল্লোলে মেঘ অতিক্রম ক'রে গিরিশিখর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মেঘের বুক থেকে ইন্দ্রধনুর ফোয়ারা সাত রঙের পিচ্‌কারি আকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে। আর সন্ধ্যার কুঙ্কুমে, সকালের হলুদে হিমালয়ের সাদা আর গেরুয়া বসনের দুই পিঠই দুই বেলা রঙের প্লাবনে ডুবিয়ে দিয়ে বইছে উত্তর তীরের বসন্ত বাতাস।

বসন্তের সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়ের আনন্দটা আমার পথ-বিপথ দুটোরই ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমি আজকাল যখন যে সাজটা হাতের কাছে পাই সেই বেশেই ঋতুরাজের দরবারে ত্রিসন্ধ্যা হাজিরা দিচ্ছি, একেবারে নির্ভয়ে।

ইনি এই পর্বতের এক নামজাদা মহিলা আর্টিস্ট। আজ কদিন ধরে আমার যাবার আসবার পথ আগ্‌লে হিমালয়ের একটা দৃশ্যপট লিখতে বসেছেন। সমস্ত উত্তর দিক জুড়ে তুষারের উপরে সন্ধ্যা মুঠো মুঠো ইন্দ্রধনুচূর্ণ ছড়িয়ে আল্‌পনা টেনে যাচ্ছেন—মনেই ধরা যায় না, সে এমন

বিচিত্র। এক টুকরো সাদা কাগজে এরই নকল নিচ্ছেন আমাদের এই মহিলা আর্টিস্ট।

উপাহসকে সেদিন আর পুরু পাহাড়ি চোগার মধ্যে ঢেকে রাখা গেল না। সে একটা অকাল বাদলের আকার ধরে বাতাসে কুয়াশার ও জলের ঝাপ্‌টায় চিত্রকারিণীর রঙ তুলি কাগজপত্র উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে তাঁর অতি-আবশ্যকীয় রঙ-মেশাবার জলপাত্রটি পর্যন্ত উল্‌টে দিয়ে, দুরন্ত একটা পাহাড়ি ছাগলের পিছনে পিছনে পলায়ন করলে একেবারে গিরিশৃঙ্গে।

এই দলের এক আর্টিস্টের কতকগুলো ছবি নিয়ে একটা লোক কোন্‌-একটা পাহাড়ে শিল্প প্রদর্শনী খুলেছে। যিনি কবি, যিনি কর্মী, তিনি ঐ নীল আকাশপটে আলো-অন্ধকারের টান দিয়ে ছবি সৃষ্টি করছেন; আর আমরা যারা কবিও নই, শিল্পীও নই, ঐ আসল ছবিগুলো দেখে এক-একটা জাল দলিল প্রস্তুত ক'রে নিজেদের নামের মোহরটা খুব বড়ো করেই তাতে লাগিয়ে দিচ্ছি নির্লজ্জভাবে।

মানুষ যে মানুষই, বিধাতা তো নয় যে তার সৃষ্টিটা বিধাতারই সমান ক'রে তুলতে হবে। মানুষের শিল্প মানুষকে আগাগোড়া স্বীকার ক'রে বিশ-হাত দশ-মুণ্ডু অথবা বিধাতার গড়া নরনারী-মূর্তির চেয়ে সুন্দর হয়ে যদি দেখা দেয় দিক্‌, তার মধ্যে প্রবঞ্চনার পাপ তো ফুটে ওঠে না। কিন্তু, তুষারপর্বত না হয়েও যেটা তুষারের ভ্রম জন্মে দিয়ে যেতে চায়, সেটাকে আমরা কী বলব? সে যে বিধাতা এবং মানুষ দুয়েরই সৃষ্টির বাহিরে থেকে দু' জনকেই অপমান করতে থাকে।

আমার এ বাগানে ফুল আর ধরছে না। প্রতিবেশী সাহেব-সুবার ছেলেমেয়েরা—তাঁদের আঁচল নেই—খড়ের টুপি ভরে ফুল লুট করে নিয়ে চলেছে। আমাদের গয়লা-মালী, তার অনেক যত্নের এ ফুল। ওই শিশু-পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সে আমার কাছে নালিশ জানায় বটে, কিন্তু ফুলের মকদ্দমা তার দিনের পর দিন মুলতুবিই থাকে।

সেদিন এই গয়লার একটা কালো বাছুর খাদ্যাখাদ্য বিচার না ক'রেই নিতান্ত ছেলেমানুষিবশত সাহেবদের বাগানের একটা ফুলগাছ সমূলে নিঃশেষ করে ধরা পড়েছে। সাহেবের চৌকিদার বাছুরকে থানায় দিতে চলেছে। পথে বেচারা অবোধ জীব মানুষের এই আইনের বিরুদ্ধে বিষম আপত্তি জানাচ্ছে এবং দেখছি, তার বড়ো বড়ো দুটো চোখ চারি দিককে কেবলই প্রশ্ন করছে সকাতরে, কী তার অপরাধ জানতে। গোরু-বাছুরের

উপরে চৌকিদারের একটা শ্রদ্ধা অনুমান ক'রেই যেন, সাহেব পুলিসের উপর একখানি জবাবি চিঠি দিয়েছিলেন; সুতরাং উৎকোচ দিয়ে যে নিরপরাধ জন্তুটিকে খালাস করে দিই, এমন উপায়ও ছিল না। তখন গয়লাকে তার বাছুরের হয়ে ত্রুটি স্বীকার ক'রে মার্জনা ভিক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলের দুটা মকদ্দমা একই দিনে নিষ্পত্তি করলেম। এমনি ক'রেই নির্বিবাদে পর্বতে পর্বতে ফুল-ফোটার দিন অবসান হল।

যে পর্বতটাকে ঘিরে চঞ্চল হরিণশিশুর মতো আমার চলার পথটি নৃত্য ক'রে খেলা ক'রে চলেছে, তারই মেরুদণ্ডের ঠিক উপরে সজারুর কাঁটার মতো ঘন দুই সারি দেবদারু। শরতের বাতাস এখান থেকে শব্দের একটা জাল নীল আকাশে দিবারাত্রি নিক্ষেপ করছে। একদিকে হিমালয়, আর একদিকে সহস্র-ধারার উপত্যকা—যেখানে সূর্য-উদয় এবং যেখানে সূর্যের অস্তগমন—এ দুই দিকই আমি দেখি এইখানটিতে ব'সে।

ফুলের রাজত্ব শেষ হয়েছে। আকাশের চোখে রঙের নেশা আর তেমন ক'রে লাগে না। সূর্যের আলোতে ঝরা পাতার কস্ ধরেছে। তুষারের সাদা দিনে দিনে নীল আকাশে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোর সঙ্গে সঙ্গে।

হিমালয়ের দিনগুলিতে বিজয়ার সুর লেগেছে। এই সুর লোহার কসের মতো পাথরের গায়ে, ঘাসের সবুজে, সন্ধ্যার সিঁদুরে মিশিয়ে গিয়ে দিনান্তেরও পরপারে রাত্রির অনেক দূর পর্যন্ত আকাশের গায়ে গেরুয়ার টান দিয়ে দিয়ে বাজছে। দিন যেন আর যায় না! শরতের চাঁদনি রাতের তীরেও নীলাকাশের বিরহী নীলকণ্ঠ আপনার একটি মাত্র সুরে বেদনার নিশ্বাস টানছে শুনি—উঃ উঃ।

আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল। এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল আকাশে ছাড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে-আসার পথ চেয়ে পর্বতের চারিদিকে কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় দেখছি, ঠিক সহস্র ধারার উপত্যকার মুখে—পর্বতের পশ্চিম গায়ে তৃণে গুল্মে, লতায় পাতায়, পাথরের গায়ে, পথের ধুলায়, ফুলের মতো, আবীরের মতো, মানিকের আভার মতো একটা আলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মনে হচ্ছে, যেন তুষারের হৃদয়-রক্ত গলে এসে হিমালয়ের এই পশ্চিম দুয়ারের সোপানে আল্‌পনার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এরই উপর দিয়ে দেখছি, সন্ধ্যা-তারার মতো একটি বনবিহঙ্গী—আলোয়-গড়া সোনাল পাখি সে—চলে

গেল পায়ে পায়ে গিরিশিখর অতিক্রম ক'রে চাঁদনি রাতের প্রাণের ভিতরে। আজ দেখলেম, তুষারের শিখরে চাঁদ উঠেছে আলোর একটা সুকোমল ছটা আকাশে বিকীর্ণ ক'রে। হিমালয়ের আর-সমস্তটা আজ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ঘরে এসে দেখছি, এ পাহাড়ের এক ভিখারি আমার জন্যে তার শরৎকালের উপহারটি রেখে গেছে—এক-গোছা সোনালি কুশ আর কাশ। সুদূর পাহাড়ের কোন্ নিরালা পথের ধারে এরা নত হয়ে পড়েছিল, চলে যেতে কার সোনার আঁচল উড়ে উড়ে এদের স্পর্শ ক'রে কনক-চূর্ণের বিভূতি দিয়ে এদের সাজিয়ে গেছে।

ভেঙে পড়া দেবদারুর নির্যাসগন্ধ দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আজকাল বরফের হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছে। পথ দিয়ে ক্রমাগত কম্বল-পরা পাহাড়ির দল কাঠের বোঝা, ভালুকের আর বন-বেড়ালের ছাল নিয়ে—গহন বন থেকে সোনাল পাখির সোনার পাখা আর মৌচাকের সোনালি মধু চুরি ক'রে ঘরে ঘরে ফেরি দিচ্ছে। কোনো দিকে কুয়াশার লেশ মাত্র নেই; দিনরাত্রি সমান পরিষ্কার। কেলুগাছের ফলন্ত শাখায় প্রশাখায় গিরিমাটির একটা রঙ লেগেছে।

পার্বতী রুক্ষ রক্তবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে, যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো—এরই উপরে চির-তুষারের ধবল মূর্তি সারাদিন সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির পর একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা ক'রে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি। পর্বতে পর্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা ক'রে আলোর ফুল্‌কি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে; আর, নীল আকাশে দীপালি-উৎসব ক্রমেই জমে উঠছে। এখানকার হাট ভাঙবার পালা শুরু হয়েছে; পুজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে ডাণ্ডিতে ক্রমে পর্বত খালি ক'রে দিয়ে নেমে চলেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তটা দৈন্য এবং অশোভনতা—দেশী বিদেশী নির্বিশেষে—তার মুরগির ঝুড়ি, আধ-পোড়া হাঁড়ি ছিট-মোড়া ময়লা বিছানা, দড়ি-বাঁধা বাক্স, কড়ি-বাঁধা হুঁকা, হলুদের ছোপ-ধরা চিনের বাসন নিয়ে ঘর ছেড়ে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে এবং ময়লা জলের একটা নালার মতো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে।

এই যে-কটা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল, বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে, আবার

চলে গেল দূর-দূরান্তরে, আকাশ-পথে দলে দলে,—কী সুন্দর, কী স্বাধীন, এদের গতিবিধি। আর, মানুষ যে জলে স্থলে আকাশে আপনার রাজত্ব বিস্তার করলে তার যাওয়ায় কী অশোভনতা। সিন্ধবাদের বিকটাকার বুড়োটার মতো সে আপনার সঞ্চিত কাজের বাজের মূল্যবান অথচ মূল্যহীন আসবাবের আবর্জনাকে বয়ে চলেছে দেখছি, বোঝার ভারে নুয়ে প'ড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে। পাখি চলে গেল, সে তার বাসার একটি কুটোও নিয়ে গেল না; আর মানুষ যেতে চাচ্ছে আস্তাবলের খড়কুটোটা এবং আস্তাকুঁড়ের ভাঙা ঝুড়িটা, এমন কি রাস্তার কাঁকরগুলো পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে মোট বেঁধে নিয়ে।

প্রথমে এসে পর্বতে পর্বতে পথ হারিয়ে আমি প্রায়ই অন্যের বাগানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে লজ্জিত হয়েছি, এখন সে-ভয় গিয়েছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়িরই ফাটক বন্ধ এবং পর্বতের গভীর থেকে গভীরতম প্রদেশের পথ একেবারে খোলা হয়ে গেছে। আমি সেখানে অবাধে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছি। চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে দিয়ে ছবির পর ছবি, কিন্নরীর ঝাঁকের মতো চিত্র-বিচিত্র আলোর পাখনা মেলে এ-কয়দিন আমার অন্তরে বাহিরে সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এদের ধরতে গিয়ে দেখি, এদের সমস্ত শ্রী লজ্জাবতী লতার মতো আমার আঙুলের পরশে ম্লান হয়ে গেল। শীত এসেছে। হিমের অভিযানের পূর্ব থেকেই গাছগুলো তাদের পাতার অনাবশ্যক বাহুল্য ঝেড়ে-ঝুড়ে আপনাদের সমস্ত শক্তি ভিতরে-ভিতরে সঞ্চয় ক'রে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্তে ফুলের ভারে এরা নুয়ে পড়েছিল দেখেছি, আর আজ দুদিন পরে বরফের পীড়ন সুদীর্ঘ শীতের দিন-রাত্রিতে বহন করবে এরাই অনায়াসে —ফুলেরই মতো, পাতারই মতো। পর্বতের সক্ষম সহিষ্ণু সন্তান এরা, পাথরের বুকের ভিতরকার স্নেহ এদের বড় করে তুলেছে; অটুট এদের প্রাণ!

আর, মানুষ যাদের যত্নে বাড়িয়েছে সেইসব ক্ষীণপ্রাণ গাছদের মালীরা, দেখছি, আজকাল তুষারের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য কাঁচ-মোড়া গরম ঘরে নিয়ে তুলছে, শুকনো ঘাসের রক্ষা কবচ তাদের সর্বাঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে।

এখানকার পাহাড়িগুলো মোটেই পাহাড়ি নয়, তারা আসলে চাষি— যখন ক্ষেতের কাজ নেই, ডাণ্ডিতে এসে কাঁধ দেয়। পাহাড়ের পথগুলো চেনে কিন্তু পাহাড়কে চেনে না, বরফকে এরা ভয় করে। পর্বত যেখানে

খেতের উপরে নদীর জলে আপনার ছায়া ফেলেছে সেখান থেকে উঠে এসেছে এরা; আবার সেইখানেই ফিরে যেতে চায়। আজ কদিন ক্রমাগত এরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, বরফ পড়ল ব'লে! কাল আমাদের যেতে হবে; কালো মেঘের ভ্রূকুটি বিস্তার ক'রে একটা ঝড় দূর পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে আজ আমাদের দিকে চেয়ে দেখছে। দিনের আলো নিষ্প্রভ, ধূসর আকাশ দুর্বহ হিমের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে।

আমি পর্বতের চূড়ায় একটা বন্ধ বাড়ির বাগানে একলা উঠে এসেছি। ঠাণ্ডা দিনটির ভিতর দিয়ে একটানা বরফের হাওয়া মুখে এসে লাগছে। একেবারে ছায়ার মতো ঝাপসা কালো-কালো পাহাড়গুলোর উপরেই আজ তুষারের সাদা ঢেউ যেন এগিয়ে এসে লেগেছে—চোখের সামনেই দাঁড়িয়েছে যেন। এ বাগানটা যাদের তারা চলে গেছে; টিনের ঘরে তালা দিয়ে বাগানের যত ফুলগাছ সব রেখে গেছে। এদের বুড়ো মালী একটা কেলুগাছের তলায় কতকগুলো চারাগাছের উপর খড়ের ঝাঁপ আড়াল দিচ্ছিল। সে আমাকে তার কাজ ফেলে বাগান দেখাতে লাগল।

কাঁচের ঘরে সাহেবের যত মূল্যবান শৌখিন ফুলের গাছ, জাল দিয়ে ঘেরা; টেনিস্ খেলার একটা চাতাল, এর উপরে এক হাত বরফ সেবারে পড়েছিল; এইটে মেম-সাহেবের চা-পানের মণ্ডপ; এই রাস্তা দিয়ে সাহেবের ঘোড়া পর্বতের উপর আসতে পারে; ওখানে সাহেবের কাছারির তাম্বু পড়ে; বাড়ির এই দিকটা পুরানো আর ঐ দিকটা সাহেব অনেক ব্যয়ে নূতন করে বানিয়েছে। ইত্যাদি।

অনেক দেখিয়ে মালী আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে বললে, 'ঐ যে ভাঙা বাংলাটা ঐটেই যে এ-বাগান প্রথম বানিয়েছিল তার; ওদিকে আরো অনেকটা বাগান ছিল, বরফে ধ্বসিয়ে দিয়েছে; আমি ছোটোবেলায় সেই বাগান দেখেছি।'

মালী যেদিক দেখালে সেদিকে তুষারপর্বত পর্যন্ত নির্মল একটি শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরই ধারাটিতে সেই ভাঙা বাংলা; ভাঙনের গা বেয়ে একটি গোলাপ-লতা ভাঙা ঘরখানার চালের উপর দিয়ে একেবারে তুষার পর্বতের দিকে ঢলে পড়েছে—ফুলের একটা উৎস! এর কাঁটায় কাঁটায় ফুল,—গাঁটে গাঁটে ফুল—পর্বতের শিখরে এ যেন একটা ফুলের স্বপ্ন! বসন্তের বুলবুল নয়, তুষারের সাদা পাখি একে ডাকছে শূন্যতার ঐ ওপার থেকে!

"পথে বিপথে"। চৈত্র ১৩২৫

পুরীর সমুদ্রতীর

সরলাবালা সরকার

পুরীর অপর নাম শ্রীক্ষেত্র—অর্থাৎ সৌন্দর্য-নিকেতন।

১৩০৭ সালে ভাদ্র মাসের শেষ অথবা আশ্বিনের গোড়ায় আমার প্রথমবার বহুবাঞ্ছিত পুরীধাম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল; ইহার পর বহুবার পুরী গিয়াছি, কিন্তু পুরীধাম কখনও পুরাতন হয় নাই। সমুদ্রতীরে বেলাভূমে বসিয়া বসিয়া সমুদ্র দেখিয়াছি, দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটে নাই। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, একটি ঢেউ সাপের মত ফণা ধরিয়া ক্রমশ উচ্চ হইতে হইতে সমুদ্রবেলায় আছড়াইয়া পড়িতেছে, পিছনে পিছনে আবার একটি ঢেউ মাথা তুলিয়াছে। নীল জল যখন প্রাচীরের মত ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে তখন দেখা যায় সেই স্বচ্ছ জলে মাছের ঝাঁক খেলা করিতেছে; সেই ঢেউ যখন মাথা নত করিতেছে, তখন তাহার মাথায় সাদা ফুলের মত ফেনারাশির মালা কি অপরূপ শোভাই ধারণ করে! নুলিয়া মাঝিরা মাছ ধরিবার জন্য নৌকা ভাসায়, তখন বার বার সমুদ্র তাহার প্রবল তরঙ্গবাহুর আন্দোলনে তীরের দিকে নৌকা ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়। অবশেষে নৌকা ভাসিল; তখন দেখিতে পাওয়া যায় ঢেউয়ের চূড়ায় চড়িয়া নৌকা একবার অতি উচ্চে উঠিতেছে, আবার জলের গর্ভে যেন একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

বিভিন্ন ঋতুতে সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ। কখনও বা শান্ত, কখনও অতি দুর্দান্ত। আবার দিনের বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রের ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন।

পুরীর সমুদ্রে সূর্যের উদয় অতি সুন্দরভাবে দেখা যায়। প্রত্যুষে কুয়াশার অন্তরাল হইতে সূর্য যখন সমুদ্রের জলে স্নান করিয়া একটি ঘোর রক্তবর্ণ অগ্নিময় গোলকের মতো প্রথম আবির্ভূত হন তখন সে কী অপরূপ দৃশ্য। আবার যেদিন পূবের আকাশে প্রত্যুষে গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ আসিয়া জমিতে থাকে তখন মেঘান্তরাল হইতে সূর্যের কিরণচ্ছটা কী অপূর্ব দীপ্তিতে ঝলকিত হইয়া উঠে! বাবা একদিন সেই দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'দ্যাখ্, দ্যাখ্, সমুদ্রের মঙ্গল আরতি হচ্ছে।'

বাস্তবিক জগন্নাথের মঙ্গল আরতির মতো এও এক মঙ্গল আরতি! সমুদ্র আর জগন্নাথ পুরীর এই দুই পরম ঐশ্বর্য। কার্তিক মাসে নিয়ম সেবা, সে সময় অতি প্রত্যুষে জগন্নাথের মঙ্গল আরতি হয়। জগন্নাথের তখন রাত্রিকালীন পুষ্পসজ্জাই থাকে; নাকের উপর ফুলের বেশর, কপালে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুষ্পমাল্য কপালের মণিকে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছে, গলায় স্তবকে স্তবকে ফুলের মালা। আরতির দীপালোকে নিদ্রোত্থিত সে এক আশ্চর্য রূপ। আমার মনে হইত মঙ্গল আরতির যেন এক বিশেষ আকর্ষণ আছে, তাই রাত্রি-শেষে পুরীর নির্জন পথে প্রতিদিন কতই না আগ্রহে মন্দিরে ছুটিয়া গিয়াছি মঙ্গল আরতি দর্শনের জন্য। আবার সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিবার জন্য ঠিক সেই রকম আগ্রহেই সমুদ্রতীরে ছুটিয়া গিয়াছি।

সমুদ্রের সঙ্গে মানব হৃদয়ের যেন এক গূঢ়তম মিল আছে, সমুদ্রতীরে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহা অনুভব করিয়াছি। যাহার কুলকিনারা পাওয়া যায় না, সেই সীমাহীনত্বের দিকে মনের যেন এক স্বাভাবিক নিকটত্ব রহিয়াছে।

সমুদ্রের আকর্ষণের ন্যায় জগন্নাথ মন্দিরেরও এক আশ্চর্য আকর্ষণ আছে, পুরীতে থাকিবার সময় তাহা অনুভব করিয়াছি। মহাপ্রভু যখন সন্নাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করেন, তখন জননী শচীদেবীর ইচ্ছানুসারে তিনি পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা যাত্রার সময় আঠারো নালার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া যেমনি দেখিতে পাইলেন, অমনি তিনি ভাবে বিভোর হইলেন। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন মন্দিরের চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া,—

"কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়!"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভুর এই নীলাচল বাসের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। এক হিসাবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই বর্ণনাকে ইতিহাসও বলা যাইতে পারে।

পুরীর সমুদ্রতীরে, পথে পথে সেই ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কাশী মিশ্রের বাড়ি, আর সেই গম্ভীরার পাথরের দেয়াল ঘেরা ঘরখানি, যে ঘরে প্রভু কত রাত্রি কৃষ্ণ-বিরহ-অনল-দহনে দগ্ধ হইয়া অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। প্রাণের ব্যাকুলতায় ঘর হইতে বাহির হইতে গিয়া পথ না পাইয়া পাথরের দেয়ালে মুখ ঘষিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে পড়িয়াছিলাম, "গম্ভীরার তিন

দ্বার"। তখন মনে হইয়াছিল, যদি তিনটি দরজাই থাকে তবে প্রভু বাহির হইতে পারেন নাই কেন? একটি দরজায় না হয় প্রভুর সেবক গোবিন্দ দুয়ার আগলাইয়া থাকিতেন, অন্য দুটি দরজাও তো ছিল। কিন্তু গম্ভীরায় গিয়া দেখিলাম—আর দুটি "দ্বার"কে দুয়ার না বলিয়া দুটি ছোট ছোট গর্ত বলাই সঙ্গত। গুহার মতো আলো বাতাস বর্জিত এই ঘর, এই ঘরেই নবদ্বীপচন্দ্র আঠারো বৎসর কাটাইয়াছেন।

কাশী মিশ্রের বাড়ির শেষ প্রান্তে বাগানে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের বাসের জন্য স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বাগানটির এখন "সিদ্ধবকুল মঠ" নাম হইয়াছে। কাশী মিশ্রের বাড়ির নাম হইয়াছে "রাধাকান্ত মঠ"। দুই মঠের মধ্যে মাত্র একটি মাটির প্রাচীরের ব্যবধান, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একই বাড়ি উত্তরাধিকারসূত্রে দুইভাগে এইভাবে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

আবার রাস্তার ও-পাশে শ্বেতগঙ্গা নামে এক পুষ্করিণী বা কুণ্ডের কাছাকাছি বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়ি "গঙ্গামাতা মঠ"। এই বাড়িতেই বাসুদেব সার্বভৌম সাতদিন ধরিয়া মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন এবং পরিশেষে প্রভুর পদপ্রান্তের সমস্ত বিদ্যাগৌরবের সঙ্গে নিজেকেও সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন।

কাশী মিশ্রের বাড়ির পথটি মন্দিরের পাশ দিয়া একটি গলিপথ। বাংলাদেশ হইতে প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীধামে আসিতেন, অবশ্য জগন্নাথ দর্শন এবং তীর্থকৃত্যাদিও ইহার আনুসঙ্গিক ছিল কিন্তু সমস্ত পথ তাঁহারা অতিবাহিত করিতেন সেই একই ধ্যানে যে, পুরী গিয়াই প্রভুর দর্শন পাইবেন।

তাই আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে পাই—

'সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখি যত ভক্তগণ,
কাশী মিশ্রের গৃহপথে করিলা গমন।'

বাংলাদেশ হইতে একদল যাত্রী দীর্ঘ হাঁটাপথে উড়িষ্যায় আসিতেছেন, সকল তীর্থযাত্রীরই একটি বিশেষ নিয়ম 'ধুলাপায়ে দেবদর্শন'। এই তীর্থযাত্রীদল আঠারো নালার পথ ধরিয়া আসিতেছিলেন মন্দিরচূড়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথে নিশ্চয়ই পড়িয়াছিল, একটু অগ্রসর হইলেই সম্মুখে অরুণস্তম্ভ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার। কিন্তু গৌড়দর্শনের জন্য ব্যাকুল পথশ্রান্ত যাত্রিদল সেদিকে না চাহিয়া সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া কাশী মিশ্রের বাড়ি যাইবার পথ ধরিলেন। আমি সেই পথে

দাঁড়াইয়া দেখিলাম কাশী মিশ্রের বাড়ির পথে যাইতে হইলে সিংহদ্বার ডান দিকেই থাকে।

স্বর্গদ্বারের সমুদ্রতীর, যেখানে সন্ন্যাসের নিয়ম অনুসারে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন, যেখানে জগদানন্দ বাংলাদেশ হইতে অতি কষ্টে বহিয়া আনা গন্ধতৈলের কলসী প্রভুর উপর রাগ করিয়া বালির উপর আছাড় দিয়া ভাঙিয়াছিলেন, যেখানে প্রভু তাঁহার অতিপ্রিয় হরিদাসকে সমাধি দিয়াছিলেনঃ—

'আপনে শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায়।'

আবার এই সমুদ্রের পথেই সনাতন গোস্বামী দ্বিপ্রহরের তপ্ত বালুকার উপর দিয়া টোটা গোপীনাথে প্রভুর আহ্বান পাইয়া পরম উল্লাসে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, আগুনের মতো গরম বালিতে পায়ে যে ফোস্কা পড়িতেছে সেদিকে তাঁহার অনুভূতি ছিল না।

চন্দনপুকুর বা নরেন্দ্র সরোবর; বৈশাখ মাসে এখানে জগন্নাথের চন্দন যাত্রার উৎসব হয়। ওপারে স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—সন্ন্যাসাশ্রমে যিনি জটিয়াবাবা,—তাঁহার সমাধি-মন্দির। এই নরেন্দ্র সরোবরে প্রভুর ভক্তসঙ্গে জলকেলীর বর্ণনা, জগন্নাথ বল্লভ উপবনে ভক্তসঙ্গে প্রসাদ গ্রহণের বর্ণনা, রথের সময় দলবল সঙ্গে নিয়া গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনা করিবার বর্ণনা, চৈতন্য চরিতামৃতে সমস্ত বিস্তারিতভাবে আছে, সবই ঠিক ঠিকভাবে মিলাইয়া লইতে পারা যায়।

আরও মিলাইয়া লইতে পারা যায় দীর্ঘ চরণচিহ্ন দুটি। একখানি চতুষ্কোণ পাথরের উপরের এই চরণচিহ্ন দুটি শ্রীশ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয় স্থাপনা করিয়াছেন মন্দির প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে। চরণচিহ্নটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, এটি খোদাই করা সাধারণ চরণচিহ্ন নয়, এটি কোনো দীর্ঘকার পুরুষেরই চরণের চিহ্ন। আর সে চিহ্ন অবিরত একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবার ফলে এবং লবণাক্ত অশ্রুজল ও ঘর্মজলে পদতলের পাথর ক্রমশ ক্ষয় হইয়া যাইবার ফলে পাথরের উপর এই চিহ্ন স্বাভাবিকভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ পাথরখানি কোথায় ছিল, কোথা হইতে আনা হইল? দেখিলাম গরুড়স্তম্ভের নিচে এটি চতুষ্কোণ গর্ত; পাণ্ডারা বলিল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আঠারো বৎসর এই গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নেত্রে জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার চোখের জলে এই গর্তটি হইয়াছে, এটি মহাপ্রভুর নয়ন-জলের খাল। কিন্তু যথার্থপক্ষে যেখানে প্রভু দাঁড়াইয়া থাকিতেন ঠিক সেইখানেরই চতুষ্কোণ

পাথরে তাঁহার চরণ-চিহ্ন ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছিল, আর সেই পাথরটি তুলিয়া নিয়া যাওয়াতেই গরুড়স্তম্ভের নিম্নে চতুষ্কোণ গর্তটি হইয়াছে।

আঠারো বৎসর প্রতিদিন সমুদ্রস্নান করিয়া আসিয়া সকাল হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত একইভাবে জগন্নাথ দর্শন, আবার সায়ংস্নানের পরও গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেই একই স্থানে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন,—জানি না কী এত তিনি দেখিতেন?

যেবার প্রথম পুরী যাই, সেবারের কথা এখনও মনে পড়ে। শুনিয়াছিলাম, এমন অনেক অভাগা আছে যাহাদের ভাগ্যে দর্শন মিলে না। তাহারা হয়তো কেবল অন্ধকারই দেখে, না হয় পথে যে বিষয় ভাবিতেছিল তাহাই দেখিতে পায়। শুনিয়া শুনিয়া আমার বিষম ভয় হইয়াছিল, 'আমি যদি দর্শন না পাই?" তাহার পর যেদিন পুরী আসিয়া পেঁৗছিলাম, রাত্রি অন্ধকার, দারুণ ঝড়। সমুদ্রের জাহাজঘাটায় সাইক্লোনের কালো নিশান উড়ানো হইয়াছে। স্টেশন হইতেই সমুদ্রের ভীষণ গর্জন শোনা গেল, ঝড়ে যেন গাড়িশুদ্ধ উল্টাইয়া ফেলিতে চায়।

হরিবল্লভবাবু ছিলেন কটকের খুব বড় উকীল। তাঁহারই বাড়ির পাশে একটি বাংলো বাড়ি ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল। বাংলোর কম্পাউন্ড পার হইয়া ঘরের বারান্ডায় পেঁৗছিতে গিয়া বালির বর্ষণে আমাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, দু' একবার আছাড় খাইতেও হইল, সুতরাং সেদিন আর জগন্নাথের চন্দ্রবদন দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই মন্দিরের পথে চলিলাম, ঝড় তখন কমিয়া গিয়াছে। আর সকলের মনের ভাব কি হইতেছিল জানিনা, আমার মনে দারুণ উদ্বেগ—সে উদ্বেগের কথা আজও মনে পড়ে। ভোর বেলায় মণিকোঠায় ঢুকিয়া দর্শন করা যায়, পান্ডা মুকুন্দ পালঙ্কধারী আমাদের একটি সরু গলির ভিতর লইয়া গেলেন, সেটি শ্রীমন্দিরের পিছনের দিক। নিবিড় অন্ধকার—পাশে একটি পাথরের উঁচু প্রাচীরের মত। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। হায় হায়, কি হইল, কোথায় জগন্নাথ? অন্ধের মত পান্ডার হাত ধরিয়া চলিতেছি, হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্তন হইল, আলোকে ঝলমল একটি ঘর আর সম্মুখেই শ্রীজগন্নাথ, ওপাশে বলরাম, আর দুই ভাইয়ের মাঝখানে ক্ষীণাঙ্গী সুভদ্রাদেবী। পান্ডা চেঁচাইয়া বলিতেছেন, 'দেখ, দেখ, নয়ন ভরিয়া দেখ। কপালে মানিক জ্বলে ওই দেখ মহাপ্রভু জগন্নাথ, মাঝে সুভদ্রা ওপাশে বীর বলভদ্র।'

তখন বুঝিতে পারিলাম, এতক্ষণ আমরা শ্রীবিগ্রহ মূর্তির পিছন দিকে

ছিলাম এবার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। যাত্রীরা জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করে এ জন্য তাহাদের পিছন দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়, আর পিছনেই সেই অন্ধকারময় সুঁড়িপথ।

জগন্নাথ মাঝে মাঝে নানা সাজে সজ্জিত হন। সমস্ত কার্তিক মাস নিয়ম সেবা, এসময় জগন্নাথ প্রতিদিন স্নানান্তে রাধা-দামোদর বেশ ধারণ করেন। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন বক পঞ্চরাত্রি। এ সময় জগন্নাথের এক-এক দিন এক-এক বেশ হয়, আর পূর্ণিমায় সোনার হাত পা পরিয়া জগন্নাথ রাজবেশ ধারণ করেন। আবার মাঝে মাঝে বৎসরের যে কোন সময়ে কখনও বা "গজ উদ্ধারণ" কখনও "কালীয়-দমন" কখনও "পদ্মবেশ" এক বা দুই বৎসর পরে পরে তিথি অনুসারে এক-এক রকম বেশ হয়। "রঘুনাথ বেশ" প্রতি দ্বাদশ বৎসরে একবার হয়।

বার বার পুরী যাওয়ার ফলে নানা সময়ের বিভিন্ন বেশ ও উৎসব প্রভৃতি দেখিতে পাইয়াছি।

এখন প্রথমবার দর্শনের কাহিনীই অনুসরণ করি। জগন্নাথ দর্শন করিয়া যে পথে বাহির হইলাম সেটি চন্দনগড়ার পথ। মণিকোঠার সম্মুখেই একটি দালান, সেটির সম্মুখে মোটা দুটি আস্ত চন্দন গাছের কাঠ দিয়া আগড় দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর খানিকটা দালান আবার সেই রকম আর একটি চন্দনগড়া, সেই চন্দনগড়ার ওপারে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানেই গরুড়স্তম্ভটি ঠিক জগন্নাথের মুখামুখি-ভাবে দণ্ডায়মান। জগন্নাথের প্রথম ভোগ হয় সকাল বেলা। তাহার পর ক্রমাগত ভোগ চলিতে থাকে। সুতরাং ভোগ আরম্ভ হইবার পর আর মণিকোঠায় প্রবেশের অধিকার থাকে না, তখন যাত্রীরা চন্দনগড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করেন।

আমরা দর্শন করিয়া বাহির হইতেছি আর একদল যাত্রী ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে দেখিতে পাইলাম, শুনিলাম তাহারা মণিপুরবাসী। দলে স্ত্রী ও পুরুষ এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে। "আহে মহাপ্রভু!" "করুণানিধান!" ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা যেন পাগলের মত আগাইয়া আসিতেছে, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে, কেহ গান করিতেছে আবার কেহ নৃত্য করিতেছে। পাণ্ডাদের সাধ্য কি যে তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লইয়া আসে। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে যে ভাব হইল তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

অতি বিস্তৃত মন্দির প্রাঙ্গণ, থাকে থাকে সিঁড়ি উঠিয়াছে। দেখিলাম

সেই সিঁড়িতে বসিয়া আছেন দুটি অবগুণ্ঠিতা রাজপুতানী, একজন আর একজনের মুখের কাছে তাঁহার কঙ্কনপরা সুন্দর হাতখানি নাড়িয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন "দরশণ মিল গয়ী।"

অঙ্গনের সব শেষের সিঁড়ির বাঁ দিকে ছোট একটি মন্দির, সেটি বিশ্বনাথের মন্দির। সেখান হইতে সব সময় সুগন্ধি পুষ্পগন্ধ উঠিয়া প্রাঙ্গণের সম্মুখ গন্ধময় করিতেছে।

সিংহদ্বার হইতে মন্দিরে প্রবেশ করিবার যে পথ বা প্যাসেজ, তাহার দুই পাশে আছে পাথরের তৈরী দুটি বেঞ্চির মত। ডানদিকের বেঞ্চিতে স্থাপিত রহিয়াছে ঠিক জগন্নাথ মূর্তির অনুরূপ একটি মূর্তি। ইনি শ্রীশ্রীপতিতপাবন। যাহারা অন্ত্যজ জাতি, মন্দিরে প্রবেশের অধিকার যাহাদের নাই তাহারা সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই পতিতপাবন দর্শন করিয়া জগন্নাথ দর্শনের আশা মিটায়।

প্রতিদিন আমরা যখনই জগন্নাথ দর্শনে যাইতাম ছেলেমেয়েরা সকলেই সঙ্গে যাইত। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে রামানুজ সম্প্রদায়ী সাধুরা জমায়েত হইত। সে সময়ে কর্‌মা বাঈয়ের খিচুড়ি প্রসাদ সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হইত, সাধুরা আবার নিজ নিজ প্রসাদ উপস্থিত সকলকেই বিতরণ করিতেন। আমার চারি বৎসরের বোনটি মন্দিরের বামদিকের দুয়ারের পাশে বসিয়া অনবরত "জগন্নাথ স্বামী কি জয়" "সুভদ্রা মাতা কি জয়" "বলভদ্র জীউ কি জয়" আবৃত্তি করিতেছে দেখিয়া অনেক সাধু আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আর যেমন সে 'জয়' উচ্চারণ করিতেছে সঙ্গে সঙ্গে সাধুরাও "জয়" শব্দে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছেন।

এদিকে লক্ষ্মীর মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরে কীর্তন হইতেছে, "কানু অনুরাগ বাঘ সম পইঠিল মন ঘন কানন মাঝে।" শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের প্রকাণ্ড অঙ্গনের চারিপাশে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেব-বিগ্রহের মন্দির আছে। তাহার ভিতর লক্ষ্মীদেবীর ও বিমলাদেবীর মন্দির দুইটিই প্রধান। লক্ষ্মীর মূর্তিটি অবশ্য কালো পাথরের, কিন্তু মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ধানের গুচ্ছ ঝুলিতেছে। সমস্ত কার্তিক মাস সারাদিন এখানে পদাবলী কীর্তন হয়, কীর্তনীয়া সকলেই বাঙালী।

দক্ষিণ দুয়ারের কাছে একটি মন্দিরে মহাপ্রভুর বিগ্রহ আছে। এই মন্দিরের সম্মুখের দালানে জগন্নাথের প্রতিদিনের ফুলের মালা গাঁথা হয়। অনেক বাঙালী ক্ষেত্রবাসিনী এই মালা গাঁথায় যোগদান করেন। এক সময় বঙ্গবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভগ্নী এই মালা

গাঁথা কার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন, পাণ্ডারাও তাঁহাকে মানিয়া চলিত।

যাঁহারা পুরী যান, আমার মনে হয় সমুদ্রকে তাঁহারা কোনদিনই ভুলিতে পারেন না। দক্ষিণাঞ্চলে আরও অনেক দেবালয় আছে। বিশেষ করিয়া সেতুবন্ধে কন্যাকুমারী এবং বিশাখাপত্তনম্ বা ওয়ালটেয়ারে নৃসিংহ মন্দির। কিন্তু পুরীর সমুদ্রের যে মাধুর্য ও গাম্ভীর্য তাহা বোধ হয় আর কোনখানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"হারানো অতীত"। মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬০

পা ষা ণে র ক থা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার সময়ের ধারণা নাই। সুতরাং আমার জন্ম-মুহূর্ত হইতে কত কাল অতীত হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। যতদূর স্মরণ আছে তাহাই বলিতেছি। শৈশবের কথা এইমাত্র মনে পড়ে যে, প্রশস্ত সমুদ্র-সৈকতে আমি ও আমার ভ্রাতৃবর্গ খেলা করিয়া বেড়াইতাম—বায়ুভরে উড়িয়া যাইতাম, ঘূর্ণবাত্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতাম; কখন বা সমুদ্রের জলে পতিত হইতাম; জল সরিয়া গেলে—ভূমি শুষ্ক হইয়া গেলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতাম। সে সমুদ্রের বিশালতা ধারণা করিবার শক্তি তোমাদের নাই; সে সমুদ্রসৈকতের বিস্তৃতি তোমাদিগের মহাপ্রদেশ সমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অধিক। যে সকল জলজন্তু সেই মহাসমুদ্রে বাস করিত যৌবনের মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। আমার শৈশবে আমি একবার মূর্ছিত হইয়াছিলাম। মূর্ছাভঙ্গে দেখি, আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তোমাদিগের এই সংগ্রহশালায় সেই মহাসমুদ্রের জীবজন্তুর অস্থি আছে। কিছুকাল পূর্বে শ্বেতকায়, বিরলকেশ একজন সাধক পর্বত ভেদ করিয়া সেই সকল জীবজন্তুর অস্থি লইয়া আসিয়াছিলেন।

কতদিন সমুদ্রসৈকতে উড়িয়া বেড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। অবস্থান্তর প্রাপ্তির পূর্বের কথা সামান্যমাত্র আমার মনে পড়ে। একদিন মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্যতপ্ত বায়ু আমাকে অপর কতকগুলি বালুকণার সহিত সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সে দিন যত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, জীবনে আর কোন দিন তত দূরে আসিতে পারি নাই। আমার জীবনযাত্রার সেই প্রথম পদক্ষেপ। সেদিন বুঝিতে পারি নাই যে, পরে অতীতকালের সাক্ষিস্বরূপ বহুযুগের ইতিহাস বহন করিয়া আমাকে সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সেদিন যে স্থানে আসিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে সমুদ্রের জল সরে না, সুতরাং শৈশবের আবাসভূমি আর কখনও দেখি নাই।

সমুদ্রগর্ভে অপরাপর বালুকণার সহিত বহুকাল বাস করিয়াছি। কত

অপরূপ জলজন্তু আমাদিগের বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যাইত! আমরা তাহাদিগের জন্মমৃত্যু দেখিতাম। বালুকাময় সমুদ্রগর্ভে তাহাদিগের জন্ম হইত। তাহারা আমরণ সেই বালুকাক্ষেত্রেই বাস করিত। জীবনান্তে তাহাদিগের অস্থিগুলি শুভ্র বালুকাক্ষেত্রটিকে শুভ্রতর করিয়া তুলিত। সেই সকল অস্থি তোমাদিগের অতীত জীববিদ্যার মূল। তোমরা সেই যুগের কোন জীবেরই সমগ্র কঙ্কাল সংগ্রহ করিতে পার নাই, একখানি দুইখানি অস্থি লইয়া তোমরা অতীত যুগের জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে চাহ; কিন্তু তাহা হয় না। অতীতের সাক্ষী, আমি—সেই সকল জীব দেখিয়াছি। আমি তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি; তাহাদিগের জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাহাদিগের চৈতন্যের শেষ সীমা পর্যন্ত তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছি; জীবনান্তে বহুযুগ তাহাদিগের অস্থিনিচয় বক্ষে ধারণা করিয়াছি—আমি বলিতেছি, তাহা হয় না। তোমরা অতীত যুগের জীবন সমূহের যে চিত্রাবলী রাখিয়াছ তাহা হাস্যোদ্দীপক। বালুকণার যদি উচ্চহাস্য করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমার উচ্চহাস্যে তোমাদিগের এই গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিত। আমি দেখিয়াছি, আমার স্মরণ আছে, কিন্তু আমার মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তোমাদিগের মত বলিবার বা লিখিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং সব জানিয়াও আমার কিছু বলা হইল না।

সমুদ্রগর্ভস্থ বালুকাক্ষেত্রে কত দিন বাস করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না; কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, আমার সময়ের ধারণা নাই। শৈশবে যে আমার মূর্ছা হইয়াছিল তাহাও পূর্বে বলিয়াছি। একদিন সূর্যাস্তকালে কোনো দারুণ আঘাতে সমুদ্রগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গভীর আলোড়নে বিশাল জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, বহু জলজন্তুর জীবনান্ত হইল—আমি মূর্ছিত হইলাম। তাহার পর কালপ্রবাহ কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব? অজ্ঞান অবস্থায় আমি যেন অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতাম, যেন দুর্বিসহ যাতনা অনুভূত হইত, বোধ হইত যেন কেহ ভীষণ বলে আমার ক্ষুদ্র দেহখানি ক্ষুদ্রতর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ততদ্ব্যতীত আর কিছুই স্মরণ নাই। মূর্ছাভঙ্গে দেখি, অজ্ঞাত শক্তির প্রয়োগে বালুকাক্ষেত্রে বিষম বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সেই সমুদ্রসৈকতে, সেই বিশাল জলরাশি, সেই সব জীবজন্তু উদ্ভিদ্ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। সে জগৎ আর নাই; অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বালুকাকণা একত্র হইয়া রক্তবর্ণ প্রস্তরে

পরিণত হইয়াছে, আমার শৈশবের দেহ তখন বিশাল অশ্মখণ্ডের কণিকামাত্রে পরিণত হইয়াছে,—আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে।

চেতনার প্রারম্ভে দেখিলাম. নূতন জগতে তৃণশষ্প, তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতি সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছে। সে নূতন জগতের আকার অনেকটা বর্তমান জগতের ন্যায়। তাহার পর স্থানে স্থানে পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। আমি তখন যে প্রস্তরখণ্ডের দেহে লীন হইয়াছিলাম মূর্ছা অবসানে দেখি, তাহার দেহ স্নিগ্ধ শ্যাম দূর্বাদলে আচ্ছাদিত; নূতন আকারের চতুষ্পদ জীব তাহার উপরে বিচরণ করিতেছে। সময়ে সময়ে মসীকৃষ্ণবর্ণ ছাগ চর্মাচ্ছাদিত তোমাদিগের স্বশ্রেণীর জীবগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত। তাহারা নখ, দন্ত, বা উপলখণ্ডের সাহায্যে চতুষ্পদ জীবগুলিকে জয় করিবার চেষ্টা করিত ও লোকবলের আধিক্যে অনেক সময় তাহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইত; কিন্তু কখনও কখনও শৃঙ্গের তাড়নায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হইত। আমার নিকটে ইহাই মানব-জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত। মনুষ্য আমার নিকটে তখন নবজাত জীব। আমি যখন জ্ঞানলাভ করি তখন মনুষ্যজাতি উন্নতির পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভের কথা বলিতে আমি অক্ষম। আমি সর্বপ্রথমে মনুষ্যজাতীয় যে সকল জীব দেখিয়াছিলাম, তাহারা অত্যন্ত খর্বাকৃতি ছিল এবং মৃগয়াই তাহাদিগের উপজীবিকা ছিল বলিয়া বোধ হইত। শুনিয়াছি তদ্বংশীয়েরা দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে অদ্যাপি বাস করিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বলবান জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া তাহারা এখন বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়াছে; বৃহদাকার জন্তুর অভাবে তাহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা এই দেশের প্রকৃত অধিপতি, কারণ মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভে ইহারাই শুষ্ক ভূমির এই অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে তোমাদিগের পূর্বপুরুষ প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়া এ দেশে বাস করিতেছে তাহারা সকলেই দস্যু ও অধর্মচারী। যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় মনুষ্য জাতির কথা বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প ছিল—শতাধিক ব্যক্তিকে কখনও একত্র হইতে দেখি নাই। তাহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, শিলাখণ্ডই তাহাদিগের একমাত্র আয়ুধ ছিল। কিছুকাল পরে সে জাতীয় মনুষ্য এ প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। তাহারা কোথায় গেল, কেন গেল. তাহা বলিতে পারি না, কারণ তখনও আমরা ভূগর্ভনিহিত ছিলাম। তোমরা অনুমান কর, সভ্যতর জাতি আসিয়া তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের

সাহায্যে কৃষ্ণবর্ণ খর্বকার মনুষ্যজাতির ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। তাহার কতকটা সত্য হইতে পারে, কারণ ইহার পরবর্তী মনুষ্যেরা উজ্জ্বল ধাতুময় অস্ত্রের সাহায্যে মৃগয়া করিত। একদিন একজন ঐরূপ অস্ত্রের সাহায্যে আমাদিগকে ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দূরে পাটলীপুত্রবাসী ভিক্ষুদত্ত যে স্তম্ভ দেখিতেছ উহার এক পার্শ্বে অদ্যাবধি সেই অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্তমান আছে। পরে জানিয়াছি, ঐ ধাতু তাম্র। শুনিয়াছি, যে জাতীয় মনুষ্য তাম্রনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাদিগের বংশধরেরা বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্যে এখনও বাস করিতেছে। তোমাদের সংগ্রহশালায় তাম্রনির্মিত আয়ুধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু তুমি বোধ হয় এই জাতীয় অস্ত্র অনেক দেখিয়াছ। তোমাদিগের পূর্বপুরুষেরা যখন লৌহ-নির্মিত অস্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখন পূর্ববাসীরা তাড়িত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে বিজেতারাও লৌহ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাম্রের ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। একদিন রাত্রিকালে তাম্রনির্মিত অস্ত্রধারী কতকগুলি লোক আমাদিগের বক্ষের উপর আসিয়া কয়েক স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। বহুকাল পরে সেই দিন ঐ আলোক দর্শন করিলাম। ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা যাহা বলিয়াছি তাহা পার্শ্ববর্তী বালুকণার নিকট শুনিয়াছিলাম। অগ্নির সাহায্যে ক্রমে আমাদিগের বক্ষ ও পার্শ্বস্থিত তৃণক্ষেত্র ভস্মে পরিণত হইল। দারুণ উত্তাপে আমরা বিদীর্ণ হইয়া গেলাম ও জনগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ক্ষণকাল পরেই শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুদীর্ঘ পিঙ্গলবর্ণ কেশধারী কতকগুলি মনুষ্য পার্শ্ববর্তী বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিল। তাহারা আসিবা-মাত্র চতুর্দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণ, তাম্রনির্মিত অস্ত্রধারী পুরুষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া মৃত্যুকালে অগ্নি ও আকাশকে লক্ষ্য করিয়া নূতন ভাষায় গম্ভীর শব্দে কি বলিয়া গেল। সেই শব্দমালার গাম্ভীর্য এত অধিক যে, আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন ভীত হইয়া পালায়ন করিল। শ্বেত-কৃষ্ণ মনুষ্যের বিবাদের ফলে আমি অগ্নির আলোক দর্শন করিলাম। পরে কতবার সেরূপ আলোক দেখিয়াছি, কতবার উজ্জ্বলতর অগ্নি আমার নিকট প্রজ্বলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম সে আলোকদর্শনে যে আনন্দ তাহা পরে আর করি নাই। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রজতশুভ্রবর্মাবৃত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রধারী শ্বেতকায় সৈনিকগণ দলে দলে আসিয়া ভস্মরাশি বেষ্টন করিয়া

ফেলিল—বিলাপে পর্বতের সানুদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দলে দলে সৈনিকবর্গ কাষ্ঠ অন্বেষণে চলিয়া গেল। কেবল কয়েকজন মাত্র মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল মধ্যে চিতাধূম গগন স্পর্শ করিল, অরণ্যবাসী শ্বেতকায় মনুষ্যগুলির দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দগ্ধবিশিষ্ট অস্থিগুলি একটি ক্ষুদ্র মৃণ্ময় পাত্রে রক্ষিত হইল, দলে দলে শ্বেতকায় মনুষ্য আসিয়া তাহাতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে একটি গুরুভার দণ্ডের সহিত ভস্মাধারটি ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। ইহার পর কয়েক দিবস চারি পার্শ্বে পর্বতশ্রেণী হইতে গভীর আর্তনাদ উত্থিত হইত। শুনিতে পাইতাম কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যজাতির শোনিতে পর্বতের সানুদেশ রঞ্জিত হইতেছে, ভীষণ প্রতিহিংসার প্রাবল্যে শ্বেতকায় সৈনিকগণ কৃষ্ণকায় জাতির ধ্বংসসাধন করিতেছে, বৃদ্ধ ও বালক, স্ত্রী ও পুরুষ দলে দলে নিহত হইতেছে, পর্বতের উপত্যকাগুলি ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। বায়ু আসিয়া ভস্মরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল, ভস্মসিঞ্চিত ভূমির উর্বরতা বর্ধিত হইল, অতি অল্পকালের মধ্যে উপত্যকা আবার স্নিগ্ধশ্যাম বনরাজিতে আবৃত হইল। ইহার পর আমরা আর সর্বদা মানুষের মুখ দেখিতে পাইতাম না, কৃষ্ণকায় মনুষ্যেরা অতি সাবধানে মৃগয়া করিতে আসিত, অধিক সংখ্যক কৃষ্ণকায় মনুষ্য আর কখনও দেখি নাই। কখন অরণ্যবাসী জটাশ্মশ্রুধারী পুরুষগণ সমিধপুষ্পাহরণের জন্য গভীর বনে আসিতেন, কখন বা প্রতিহিংসাপরবশ কৃষ্ণকায় অনলক্ষ্য শ্বেতকায় বনচারীর পশ্চাদগমন করিত। কিন্তু সে পর্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় বহুকাল পর্যন্ত মনুষ্যের বাস ছিল না।

শুনিয়াছি, ক্রমে শ্বেতকায় মনুষ্যে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল, কৃষ্ণকায় মানবজাতি ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়া নবাগত জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল ও ক্রমে শ্বেত জনসঙ্ঘে মিশিয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ জনগণের চরম উৎকর্ষের অবস্থা দেখি নাই। আমি যখন পুনরায় মনুষ্যসমাজের সংসর্গে আনীত হইয়াছিলাম, তখন শ্বেতকায় জাতির অবনতি সূচিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, এই জাতির যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, এতদ্দেশবাসী অপর কোনো জাতিরই সেরূপ হয় নাই। তাহারা বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা গৃহ নির্মাণ করিত, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হর্ম্যাবলী সুদৃশ্য চিত্রশোভিত করিত; ক্রমে কাষ্ঠের পরিবর্তে পর্বতগাত্র ছেদন করিয়া গৃহনির্মাণের জন্য পাষাণ লইয়া যাইত,

অস্ত্রসাহায্যে তাহার মলিনত্ব দূর করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য সাধন করিত। তাহারা কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে জলরাশি উত্তীর্ণ হইত, বৃহদাকার কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে বর্তুলাকার কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন করিয়া গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি বনবাসী জীবসমূহকে ভারবহনে নিযুক্ত করিত। যে ব্যক্তি বর্তুলের পরিবর্তে রথে চক্র যোজন করিয়াছিল তাহার নাম অদ্যাপি তোমরা করিয়া থাক। ক্রমে সূর্যের প্রখর উত্তাপে ও কৃষ্ণকায় জাতির সহিত মিশ্রণে তাহাদের বর্ণের পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন মনুষ্যসমাজে নীত হইলাম তখন দেখিলাম, নবাগত জাতির বর্ণের বৈষম্য ঘটিয়াছে, আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলেরও লাঘব হইয়াছে।

বহুকাল পরে পার্শ্বদেশে দারুণ ক্লেশ অনুভব করিলাম। শুনিয়াছি, পাষাণ যে ক্লেশ অনুভব করে তাহা তোমরা এখন স্বীকার কর। দেখিলাম, মলিন বেশধারী জনৈক মনুষ্য আমার পার্শ্বে লৌহকীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর, অনেকগুলি কীলক ভগ্ন হইবার পর একটি কীলকের কিয়দংশ আমার পার্শ্বে প্রবেশ করিল। আমার যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই, রোধ করিবার ক্ষমতা নাই, সমস্ত ঘটনা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তথাপি বলিতে পারি, এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা কখনও ভোগ করি নাই; এরূপ অসহনীয় যন্ত্রণা সমুদ্রগর্ভে বাসকালে মূর্ছার প্রারম্ভেও বোধ হয় অনুভব করি নাই; পরবর্তী জীবনে একবার মাত্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমে সংবাদ আসিল যে, পর্বতের নানা স্থানে মনুষ্যগণ কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করিতেছে; দারুণ যন্ত্রণায় সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটি, দুইটি, তিনটি, ক্রমে দশটি কীলক সমরেখায় প্রোথিত হইল। আমাদিগের আক্রমণকারী লৌহদণ্ডধারী আরও কয়েকজন মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া আনিল। কীলকমূলে লৌহদণ্ড প্রয়োগে ও মনুষ্যবর্গের সমবেত চেষ্টায় আমরা সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেলাম। আমাদিগকে অপসারিত করিয়া আততায়ীরা পুনরায় কীলক প্রোথিত করিতে লাগিল। ক্রমে পর্বতের সানুদেশে সমস্ত স্থান হইতেই এই নিষ্ঠুর বিদারণের শব্দ আসিতে লাগিল; আমরা জানিতে পারিলাম যে, উপত্যকার সর্বস্থানেই পাষাণের উপর অত্যাচার হইতেছে। এইরূপে সন্ধ্যাগমের পূর্বেই পর্বতসানুর আকার অন্যরূপ হইয়া গেল। অন্ধকারের আগমনের সহিত চতুর্দিকে অগ্নি-প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, বনভূমি বহুকাল পরে মনুষ্য কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পরে জানিয়াছিলাম, স্তূপনির্মাণের জন্য নগর হইতে সহস্রাধিক ব্যক্তি পাষাণ ছেদন করিতে পর্বতের নিকটে আসিয়াছিল। তাহারা সমস্ত দিন পাষাণ ছেদন করিয়া পর্বতের সানুদেশে রাত্রিযাপন করিত। সূর্যোদয় হইতে সন্ধ্যার সমাগম পর্যন্ত পাষাণ ছেদনের শব্দে ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনিতে শৈলশ্রেণী কম্পিত হইত। শ্বাপদসঙ্কুল বনাবৃত সানুদেশ জীবশূন্য হইয়া উঠিল। মানবগণ মাসদ্বয় পর্বতপার্শ্ব হইতে শিলাছেদনে ব্যাপৃত ছিল। শিলাছেদন শেষ হইলে নগর হইতে শত শত গোযান আসিয়া উপস্থিত হইল; গোযান যাতায়াতের জন্য উপত্যকা হইতে নিম্নভূমি পর্যন্ত পথ প্রশস্ত করা হইয়াছিল। দলে দলে বৃহৎকায় হস্তিগণ পর্বত-নিম্নে আনীত হইল ও দিনের পর দিন হস্তিগণ বৃহৎ পাষাণখণ্ডসমূহ শুণ্ডে উঠাইয়া গোযানে স্থাপন করিতে লাগিল।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে হীনবল মানবজাতি কিরূপে এই গুরুভার পাষাণরাশি পর্বতশ্রেণী হইতে বহু দূরবর্তী নগরের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছিল, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গুরুভার পাষাণ কিরূপে ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া তোমরা বিস্মিত হও, কিন্তু আমি তখন আশ্চর্যজনক বিশেষ কিছুই দেখি নাই। আমি কিসে বিস্ময় বোধ করি শুনিবে? আমার বিস্ময় বোধ হইয়াছিল গোশকট দেখিয়া, গোশকটের চক্র দেখিয়া, চক্রের প্রবর্তন দেখিয়া। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র চক্র গুরুভার পাষাণের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে না; ভারবহনেও যদি সমর্থ হয়, শকট চালিতে সমর্থ হইবে না; নিশ্চয় কোনো-না-কোনো বিপদ ঘটিবে। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই শকট চলিল, চক্র প্রবর্তিত হইতে লাগিল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পথ অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেরূপ গোশকট তোমরা এখন আর ব্যবহার কর না, দুই একজন মাত্র, তাহার পাষাণে খোদিত চিত্র দেখিয়া থাকিবে। তাহা বর্তমান কালে প্রচলিত গোশকটের ন্যায় নহে। বর্তমানের গোশকট দ্বিচক্র, কিন্তু সেগুলি চারি বা ততোধিক চক্রের উপরে স্থাপিত হইত। রথচক্র কোনো স্থানে ভূমিতে প্রবেশ করিলে বা পথের কোনো স্থান কর্দমাক্ত থাকিলে হস্তিবৃন্দ আসিয়া সাহায্য করিত, শুণ্ডে রথচক্র মুক্ত করিত, কখনো বা ভারবাহী গোসমূহকে সাহায্য করিত। এইরূপে গোশকটে সহস্রাধিক শিলাখণ্ড নূতন পথ ধরিয়া শতাধিক যোজন পথ আনীত হইল। শিলাবাহী শকটসমূহ যেদিন নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল, সেদিন নগরে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দলে দলে নগরবাসিগণ

আসিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ দীর্ঘকায় প্রস্তর পূর্বে কখনও দেখে নাই; তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে শকটশ্রেণী নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। ক্রমে পথরোধ করিয়া ফেলিল। মুষ্টিমেয় রাজপুরুষের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল না; তখন অতি বৃদ্ধ, লোলচর্ম, মুণ্ডিতশীর্ষ কাষায়বস্ত্র পরিহিত একজন মনুষ্য আসিয়া ভগবান বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করিয়া পথ মুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধের ও রাজপুরুষগণের চেষ্টায় পথ মুক্ত হইল। শকটসমূহ নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নগরপ্রাকারের বাহিরে এক প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল।

এই সময়ে দেখিলাম, মনুষ্যজাতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; অনেক উন্নতি হইয়াছে, অনেক বিষয়ে অবনতিও হইয়াছে। নূতন নাম, নূতন আচার-ব্যবহার, নূতন অস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী আসিয়া আমার পূর্বপরিচিত শ্বেতকায় জাতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। বৃদ্ধ, স্থবির, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, সঙ্ঘারাম, চীবর, কাষায় প্রভৃতি কথা পূর্বে কখনও শুনি নাই। মনুষ্যজাতির আবাসস্থল নগরসমূহ সুদৃশ্য গগন-স্পর্শী আবাসভবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে; রাজপথসমূহ প্রস্তরাচ্ছাদিত হইয়াছে, বিশাল নগরে জলাভাব দূর করিবার জন্য কৃত্রিম নদীসমূহ খনিত হইয়াছে; হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি জীবগণ নরজাতির বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে বহন করিতেছে; উষ্ট্র ও অশ্ববাহিত শকটের শব্দে শ্রুতিরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। নগরমধ্যে জলপথে বিচিত্র তরণীসমূহ ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। আমি এরূপ নগর পূর্বে কখনও দেখি নাই, ক্রমে হস্তিযূথের সাহায্যে শকট হইতে প্রস্তরসমূহ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সমুদয় প্রস্তর নামাইতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। শকটের পশ্চাতে যে বিশাল জনসঙ্ঘ প্রান্তরে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে নগরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল।

ক্রমে বিশাল প্রান্তর জনশূন্য হইয়া গেল। পূর্বে নগর ও নাগরিক কখনও দেখি নাই। সেদিন সহস্র সহস্র নাগরিকের কথোপকথন কর্ণগোচর হইয়াছিল; তাহার কতক বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কতক পারি নাই। তবে এইমাত্র নিশ্চয় জানিয়াছিলাম যে, মানবজাতির ভাষার অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। পূর্বে কৃষ্ণকায় বনবাসী মনুষ্যজাতির মুখে যে ভাষার প্রয়োগ শুনিয়াছিলাম, সে ভাষার অবিমিশ্র প্রয়োগ আর শুনি নাই। পূর্বে নবাগত শ্বেতকায় জাতির মুখে যে ভাষা শুনিতাম, সে ভাষাও আর শুনি

নাই। এখন নাগরিকগণকে যে ভাষা ব্যবহার করিতে শুনিলাম, তাহা প্রাচীন শ্বেতকায় জাতির ভাষার ন্যায়, কিন্তু সেরূপ পুরুষ নহে, তাহা অপেক্ষাকৃত কোমল ও সুশ্রাব্য।

বহুকাল পরে মনুষ্যজাতি দেখিলাম। আমি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ; আমার বয়সের পরিমাণ করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে, আমার বয়স শুনিয়া তোমরা বিস্মিত হইতে। বৃদ্ধগণ সাধারণতঃ প্রগল্ভ হইয়া থাকে; নগরবাসী মনুষ্যজাতিকে কি প্রকার দেখিলাম তাহা বলিতেছি, তুমি চিত্ত সংযত কর, আমার প্রগল্ভতায় বিরক্ত হইও না। শকটবাহিত পাষাণ দেখিতে নানাবিধ মনুষ্য আসিয়াছিল। যাহারা রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও বালক, শ্বেত ও কৃষ্ণ সর্ববিধ মনুষ্যই দেখিয়াছিলাম। যাহারা আমাদিগকে ছেদন করিতে পর্বতপার্শ্বে গমন করিয়াছিল, তাহারা শ্রমজীবী, কঠোর পরিশ্রমে পটু, পরুষভাষী, বহুভাষী ও বহুভোজী। শকটে প্রস্তর আসিতেছে শুনিয়া যাহারা নগরপ্রান্তে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমজীবী, তবে তাহাদিগের মধ্যে দুই একজনকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারা যেন অপর কোনো জগতের মনুষ্য, তাহাদিগের সুদীর্ঘ বপু ও কোমল মুখকান্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন তাহারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নহে। তাহারা সুদৃশ্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করে; তাহারা যে স্থান দিয়া চলিয়া যায় সে স্থান সুগন্ধে পূর্ণ হইয়া উঠে; তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ন অথচ যেন আলস্যজড়িত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা বিলাসপ্রিয় নাগরিক। নগরপ্রাকার অতিক্রমকালে আর এক শ্রেণীর মনুষ্য দেখিয়াছিলাম; তাহারা দীর্ঘকায়, সুদর্শন, কোমল অথচ কঠোর। তাহারা পরিচ্ছদের উপর লৌহবর্ম ধারণ করিয়াছিল, কোমল হস্তে শাণিত লৌহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ন ও বলদীপ্ত। পরে জানিয়াছিলাম, তাহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। পূর্বে যে শ্বেতকায় জাতি দেখিয়াছিলাম, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ করিত, তাহারাই দেবসেবা করিত, তাহারাই হলকর্ষণ করিত; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বিলাসিতা ছিল না। বর্তমানকালে একথা তোমাদিগের নিকট শ্রুতি-কঠোর হইবে। সহস্র সহস্র বর্ষকাল ব্যাপিয়া তোমরা জাতিভেদ—জাতি অনুসারে কর্মভেদে অভ্যস্ত, সুতরাং একথা তোমরা হয়ত বিশ্বাস করিবে না। তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের প্রাচীন প্রথায় অবশেষ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে তোমরা জানিয়া আসিতেছ যে, জাতিভেদ বহুকালের।

কিন্তু আমি জাতিভেদ অপেক্ষাও প্রাচীন, আমি মনুষ্যজাতি অপেক্ষা প্রাচীন, আমি সর্বজীব অপেক্ষা প্রাচীন—আমার কথা বিশ্বাস করিও।

নগর কাহাকে বলে তাহা সেই দিন দেখিলাম। দেখিলাম, তাহা মনুষ্যের অরণ্যবিশেষ। যতদিন পর্বতের পদপ্রান্তে পড়িয়াছিলাম ততদিন দেখিয়াছি, জীব দেখিলে জীব হয় তাহার নিকট আসিয়া মিলিত হয়, নহে ত দূরে পলায়ন করে, হয় আলাপে প্রবৃত্ত হয়, নহে ত পরস্পরের প্রাণহরণের চেষ্টা করে। এত অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে এত অধিক জীব পরস্পর বিবাদ না করিয়া, হিংসা না করিয়া কিরূপে বাস করে, তাহা আমার নিকট অতীব বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু শুনিয়াছি, বিবাদ ও হিংসার প্রকারভেদ হইয়াছে ; যে স্থানে জীবের অস্তিত্ব আছে বিবাদ ও হিংসা এখনও সে স্থানে বিদ্যমান আছে। যখন নগরপ্রাকার অতিক্রম করিয়া নগরমধ্যে গমন করিতেছিলাম তখন দেখিতেছিলাম, জনস্রোত নানাপথ হইতে আসিয়া একত্র মিলিত হইতেছে। পরস্পর অভিভাষণ না করিয়া, এমনকি পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া যে যাহার গন্তব্যপথে চলিয়া যাইতেছে। প্রথম দিন নগর দেখিয়া ইহা আমার নিকট একান্ত বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণীশ্রেণী, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, বিপুল পণ্যের সমাবেশ প্রথম দেখিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। বিপণীর উপরে গবাক্ষপথে শকটশ্রেণী দর্শনলোলুপ অবগুণ্ঠনশূন্যা অন্তঃপুরিকাগণকেও দেখিয়াছিলাম। ইহার পূর্বে কখনও এত অধিক স্ত্রীলোকের একত্র সমাবেশ দেখি নাই। সেদিন কত অলঙ্কার, কত বস্ত্র, কত বেশবৈচিত্র্য দেখিয়াছি তাহা আর কি বলিব! শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রথম নগর দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সেরূপ আনন্দ আর কখনও উপভোগ করিব কিনা সন্দেহ। আমাদিগকে দেখিতে নগরের প্রায় সমুদায় লোকই আসিয়াছিল ; রাজাও আসিয়াছিলেন, তিনি নগরের মধ্যভাগে অষ্টাশ্বযোজিত সুবর্ণনির্মিত রথারোহণে আসিয়াছিলেন। অশ্বারূঢ় রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ছিল ; তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দধ্বনি করিতেছিল ; বাতায়নপথে নাগরিকাগণ পুষ্প ও লাজ বৃষ্টি করিতেছিল। রাজসমাগম যেন একটি স্বতন্ত্র উৎসব হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপথে দেখিয়াছিলাম, সুন্দরী রমণীগণ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নাগরিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহাদিগের আকার-ইঙ্গিত, আচার-ব্যবহার তখন আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। পরে শুনিয়াছি তাহারা বারাঙ্গনা।

নগর অতিক্রম করিয়া দেখিয়াছিলাম নগর-প্রাকারের বহির্ভাগে সুসজ্জিত পুষ্পবাটিকাসমূহ নরনারীতে পরিপূর্ণ। বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, নানা আভরণে ভূষিত সুন্দরীগণের কলহাস্যে নগরোপকণ্ঠ যেন নূতন শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আসবপানে ঈষদরক্ত আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন কটাক্ষ-পাতে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেরূপ বিলাসবিহ্বল দৃষ্টি পরে আর কখনও দেখি নাই। যাহারা কাদম্ব পান করিত, তাহাদিগের কাদম্বের সহিত তাহারাও অন্তর্হিত হইয়াছে। লোকে নিত্য যাহা দেখিয়া থাকে, তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যাহা নূতন দেখে তাহা দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না। নগর, নাগরিক, নাগরিকা, উপনগর, পুষ্পবাটিকা, উৎসব সকলই তখন আমার নিকট নূতন। সেদিন যেভাবে মনুষ্যজাতিকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পূর্বে কখনও সেভাবে দেখি নাই, আর কখনও সেভাবে দেখিব না। যখন পর্বতের সানুদেশে ছিলাম, তখন দেখিতাম সন্ধ্যাগমে বনরাজি নিঃশব্দ হইত। যেদিন চন্দ্রোদয় হইত না, সেদিন খদ্যোতের আলোকে পর্বতমালা ভীষণ বোধ হইত। নগর দেখিয়া আমার সেই কথা মনে হইত। আমরা যে প্রান্তরে পড়িয়াছিলাম, সন্ধ্যাগমে সেই স্থান হইতে দেখিতাম, দূরে বিশাল পর্বতমালার ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন সৌধশ্রেণীর অস্পষ্টমূর্তি দৃষ্ট হইতেছে, পর্বতগাত্রে খদ্যোতশ্রেণীর ন্যায় নগরে অসংখ্য দীপশ্রেণী প্রজ্বলিত হইয়াছে। দীপ কাহাকে বলে পূর্বে তাহা জানিতাম না। অগ্নির আলোক দেখিয়াছি, কিন্তু পূর্বে দীপালোক দেখি নাই। দূর হইতে স্নিগ্ধ দীপালোক স্নিগ্ধতর বোধ হইত। নিশাগমে নগরের নানা স্থান হইতে গীতবাদ্যের রব আসিত। ক্রমে নদীবক্ষে দুই একখানি তরণী দেখা যাইত; ক্ষুদ্র তরণীতে যুবক যুবতী একত্র নৈশ বায়ু সেবনে নির্গত হইয়াছে; যুবতী গান গাহিতেছে, যুবক ক্ষেপনি চালনা করিতেছে। কোনো কোনো বৃহদাকার তরণীতে বিলাসীরা আসবোন্মত্তা বারনারী পরিবৃত হইয়া কলরব করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদিগের আমোদ-প্রমোদ আশা-ভরসা সুখ-দুঃখ লইয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে; কেবল সুদূর অতীতের সাক্ষীরূপেই যেন আমাকে রাখিয়া গিয়াছে।

"পাষাণের কথা"। বঙ্গাব্দ ১৩২১

ক্যাবলের পত্র

সুকুমার রায়

শ্রীমান বাঞ্ছারাম

উন্নতিশীলেষু—

তুমি যে আমার কোন চিঠি পাওনি তার একটা কারণ এই যে, আমি তোমায় চিঠি লিখিনি। কারণ ছাড়া যখন কার্য হয় না, তখন চিঠি না লেখবারও অবিশ্যি একটা কারণ থাকা উচিত। তবে কিনা, চিঠি না-লেখাটাকে কার্য ব'লে ধরা যায় কি না, সেটা একটু ভাবা দরকার। কিছু না-করাটাও যদি একটা কাজ হয়, তবে তোমরা পৃথিবীতে কেজো মানুষ আর অকেজো মানুষ ব'লে যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছ সেটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে পড়ে। তোমরা করেছ বলছি এইজন্যে যে ও দ্বন্দ্বটিকে আমি বরাবরই অস্বীকার ক'রে এসেছি। আমার ধারণা এই যে, আমসত্ত্ব হ'লেই যেমন আমের আমসত্ত্ব, তেমনি মানুষ মানেই কাজের মানুষ। ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব এ দুটোর মধ্যে তফাৎটা কেবল কৃ-ধাতু আর অস্‌-ধাতুর তফাৎ—আর ব্যাকরণ-মতে সব ধাতুই ক্রিয়া-বাচক। "আমি আছি" এই তত্বটিকে ফুটিয়ে বলার নাম কার্য এবং প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই এই যে সে আপনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ফুটিয়ে বলে। জলকে ফোটাতে হ'লে তাকে আগুনে চড়িয়ে গরম করতে হয়—কিন্তু তাই ব'লে ফুলকে ফোটাবার পক্ষে ও-উপায়টি খুব প্রশস্ত নাও হ'তে পারে। জীবনটাকে কাজের মধ্যে দিয়ে যাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা টানাটানি করেন, তাঁরা এই সহজ কথাটি বোঝেন না যে, ওতে করে জীবনটা ফুটে বেরোয় না—কেবল প্রাণটাই ছুটে বেরোয়।

উপনিষদ্‌ বলেছেন আত্মা অব্যয়, আর ব্যাকরণেও দেখতে পাই যে অব্যয়ের রূপ নেই। কিন্তু জীবনের একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ। কেননা, জীবনের ক্রিয়া সমাপ্ত হ'লেই মৃত্যু এবং মৃত্যুটা আর যাই হোক সেটা জীবন নয়। অসমাপিকা হলেও ক্রিয়া-পদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটাই হচ্ছে আর্ট। রোসো, আগেই তর্ক কোরো না। আর্ট কাকে বলছি সেইটে আগে বুঝবার চেষ্টা কর।

তুমি বলতে চাইছ যে বিজ্ঞান পলিটিকস্ বা ফিলসফি প্রভৃতি ভারি ভারি কর্মগুলো কি কর্ম নয়? আমার মতে ওগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার উপসর্গ মাত্র। "উপসর্গস্য যোগেন" ক্রিয়ার অর্থ যে ওলট-পালট হ'য়ে যায়, এটা ব্যাকরণের বিজ্ঞতা এবং সংসারের অভিজ্ঞতা এই দুই তরফেরই সাক্ষী। জীবনের ক্রীয়ার ওপর ওরা মোচড় দেয়, কিন্তু কোথাও আঁচড় দিতে পারে না। জীবনের ওপর আঁচড় দেওয়া, অর্থাৎ আপনার ছাপ এ'কে দেওয়া, অর্থাৎ এক কথায় নতুন করে রূপ সৃষ্টি করা, এই জিনিসটাই হচ্ছে আর্ট— অর্থাৎ ব্যার্গ্সঁ যাকে বলেছেন Creative evolution.

আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি বাংলাদেশে কেউ ব্যাকরণ পড়ে না এবং পড়তে জানে না। অর্থাৎ আমাদের দেশে রসবোধ ছাড়াও আর-একটি বোধের বিশেষ অভাব রয়েছে—সেটা ঐতিহাসিক বোধ নয়, সেটা হচ্ছে মুগ্ধবোধ। তার কারণ, আমাদের দেশে ইতিহাসের মালমশলা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, মাল এবং মশলার পার্থক্য তাঁরা বোঝেন না। ব্যাকরণের মধ্যে তাঁরা ভাষাষতত্ত্বের মশলা দেখেন—কিন্তু ইতিহাসের মাল দেখতে পান না। অথচ এটা অস্বীকার করবার জো নেই যে ও-বস্তুটি হচ্ছে জাতীয় খোসখেয়ালের আস্ত একটি তোষাখানা। সকলেই জানি, ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সবচাইতে বড় তফাৎ হচ্ছে আকারের তফাৎ। অর্থাৎ তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাক মাত্র ভরসা। ইংরেজের ব্যাকরণে ও আচরণে first person হচ্ছেন আমি এবং আমরা। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাকরণটাও বেদাঙ্গ, সুতরাং তাতে পরমার্থ না থাকুক পরার্থতত্ত্বের কোন অভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ইনি এ'রা তারা। এর মধ্যে দীনতা থাকলেও কোন রকম হীনতা নেই, কারণ আমি-ব্যক্তিটিকে আমরা বরাবর উত্তমপুরুষ ব'লেই প্রচার করে আসছি। এইখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের আসল তফাৎ। ওরা অহঙ্কারী বলেই স্বার্থপর হ'য়ে থাকে, আর আমরা পরার্থপর ব'লেই অহঙ্কার করতে পারি।

অধ্যাপক Kuhmre তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, মিথ্যেটাই হ'ল সাহিত্যের আসল সৃষ্টি—কেননা, সত্যকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল এইটুকু না ব'লে তিনি আরও বলতে পারতেন যে, আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেটা সৃষ্টি ছাড়া সেইটেকে সৃষ্টি করা। বিজ্ঞানের সব সত্যিই যে সত্যি এইটে দেখানই হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবসা। সত্যিটার যে কোন সত্তা নেই আর মিথ্যেটা যে মিথ্যে নয়, এইটেই হচ্ছে দর্শনের সাক্ষী। কেবল

আর্টের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সত্য-মিথ্যার স্বত্বসাব্যস্তের কোন বালাই নেই, কেননা সাহিত্য হচ্ছে সত্য-মিথ্যার সব্যসাচী। অর্থাৎ এক কথায়, বিজ্ঞান না পড়েই বোঝা যায়, দর্শন পড়লেও বোঝা যায় না, আর সাহিত্যের বেলা বোঝা-পড়ার কোন প্রয়োজনই হয় না। একেই আমি বলেছিলুম "সাহিত্যের অনাসক্তি"। দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা কারও প্রাণে লাগেনি, অর্থাৎ কানে লাগেনি। কেননা, আমাদের দেশের বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরাও পড়াশোনা করেন না, তাঁরা কেবল লেখা-পড়াই ক'রে থাকেন। আর তাতে ক'রে যে জিনিসটা গজায় সেটা আক্কেল নয়, সেটা হয় টাক নয় টিকি—অর্থাৎ হয় নাস্তিকতা নয় অদ্বৈতবাদ।

দেখ কোথাকার কথা কোথায় গড়িয়ে পড়ল। কথা বলবার একটা মস্ত অসুবিধে এই যে বেশী কথা বললে কেউ শুনতে চায় না, আবার অল্পের মধ্যে সংকীর্ণ ক'রে বললেও কেউ বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, অল্প কথার মধ্যে যতটা বাহুল্য থাকে, বেশী কথায় ততটা থাকে না। তাই সাহিত্যের একটা বড় কাজ হচ্ছে সামান্য কথাকে চালিয়ে চালিয়ে, অর্থাৎ exercise করিয়ে, তার বাহুল্য নষ্ট করা। এক্ষেত্রে যাঁরা সংযমের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁদের এই সহজ তত্ত্বটি বুঝিয়ে বলা একেবারেই অসম্ভব যে সাহিত্যের শব্দকে মেরে ভাষাকে জব্দ করা যায়, কিন্তু ও-কাজটি সম্যকরূপে যমের উপযুক্ত হ'লেও তাকে সংযম বলা চলে না।

আমাদের গুরুমশাইরা বলেন যে ভাষাটার বাড়াবাড়ি হ'লে তার গুরুত্ব থাকে না, কেননা তাতে ক'রে ভাষাটা হয় ভাসা-ভাসা, অর্থাৎ হাল্কা। ও সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ভাষার মধ্যে যে জিনিসটা যথার্থই ভাসে, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে, তাকে ডুবিয়ে দিলে যে ডোবা সাহিত্যের—অর্থাৎ বোবা সাহিত্যের—সৃষ্টি হয়, তাকে শোভন বলা আর মূর্খ বলা একই কথা, কেননা সে "কিঞ্চিন্নভাষতে"। ওর মধ্যে আরেকটু কথা আছে, সেটা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সে কথাটা এই যে, যে-টাকা বাজে সেই টাকাই চলে, যেটা বাজে না সেটা অচল; সুতরাং সাহিত্যের বাজারে বাজে কথাই চলে ভাল—অর্থাৎ সেই কথাটাই চলে যার শব্দের জোর আছে। তুমি ভাবছ এটা নেহাৎ বাজে কথা। তা হওয়া খুবই সম্ভব, কেননা কথাটা সত্যি।

আমার একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলুম যে, সাহিত্যের উক্তির মধ্যে যুক্তি থাকলেই তার মুক্তি হয় না—তাতে সাহিত্যের বিস্তার হ'তে পারে,

কিন্তু তার নিস্তার হওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমি এই কথাটির একটি চমৎকার উদাহরণ আবিষ্কার করেছি। "পল্লী-সাহিত্য" ব'লে একটা কথা আমি অনেক দিন ধরে শুনে আসছি, কিন্তু ও-বস্তুটা যে কি তা আমার জানা নেই, অর্থাৎ কাল পর্যন্ত জানা ছিল না। সেইজন্য কাশীরাম পণ্ডিতের পল্লী-সাহিত্য প্রবন্ধটি আমি আগ্রহ ক'রে—অর্থাৎ নিজের পয়সা খরচ ক'রে—কিনে এনেছিলুম। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ওতে ক'রে আসল যে কথাটি বলা হচ্ছে, সেটা ওর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি। বলা কথাটির অর্থই হচ্ছে কিছু কথা বলা, কিন্তু কথার উপর অসামান্য বলপ্রয়োগ করলেই যে বলা কাজটি খুব ভাল ক'রে সম্পন্ন হয়, আমার অন্তত এরকম বিশ্বাস নেই। সাহিত্যকে তাজা করবার জন্য পণ্ডিতমশাই যে রকম তেজ প্রকাশ করেছেন,—তাতে তাঁর প্রবন্ধটিকে পল্লী-সাহিত্য না বলে মল্লীসাহিত্য অর্থাৎ মেয়েলি কুস্তির সাহিত্য বলা উচিত ছিল—কেননা, ওর মধ্যে প্রতাপের চাইতে প্রলাপের মাত্রাটাই বেশী।

পণ্ডিতমশাই বলতে চান যে সাহিত্যটাকে শহরের বদ্ধ বাতাসে আবদ্ধ না রেখে, তাকে "সহজ সুস্থ পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন" অর্থাৎ তাকে ঘন ঘন হাওয়া খেতে পাড়াগাঁয়ে পাঠান দরকার। পণ্ডিতমশাই বলেন, "আমি মনে করি ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব"। প্রস্তাবের মাঝখানে "আমি মনে করি" ব'লে উত্তম পুরুষের অবতারণা করলেই যে প্রস্তাবটা উত্তম হ'য়ে পড়ে এ রকম যুক্তির জন্য ন্যায়শাস্ত্রে অনেক উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা আছে। পণ্ডিতমশাই ভরসা করেন যে তাঁর ব্যবস্থা-মত চললে পরে সাহিত্যের ভাব এবং ভাষা হৃষ্ট এবং পুষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঠিক তার উল্টো। শহুরে সাহিত্যকে গ্রামের হাওয়া খাইয়ে gram-fed করে পুষতে গেলে যে জিনিসটা পুষ্টিলাভ করে, সেটা 'গ্রামার' নয়, সেটা হচ্ছে গ্রাম্যতা।

ব্যার্গ্‌সঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের ওপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও-বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত, তাহলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। কতগুলো ইংরিজিপড়া মাথাকে বাংলা-সাহিত্যের ঘাড়ের উপর বসতে দেখে, পণ্ডিতমশাই তার মুণ্ডপাত করতে চান, কিন্তু এটা তিনি ভেবে দেখেন নি যে তাতে করে তাঁর নিজের প্রবন্ধকেই তিনি কবন্ধ করে ফেলেছেন। যা হাক, এ প্রবন্ধের একটা গুণ আছে, সেটা

আমি অস্বীকার করিনে—সেটা এই যে, সাহিত্য বলতে পণ্ডিতমশাই কি বোঝেন সেটা না বুঝলেও, তিনি কি না-বোঝেন সেটা ওতে খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

আমার কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখাটা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। তাই শুনলুম সেদিন একজন আক্ষেপ করে বলেছেন যে, আমার কথাগুলো নাকি "সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না"। বোঝা যে যায় না, এই কথাটুকু একেবারে বৈজ্ঞানিক সত্য, কেননা সংসারের কোনো বোঝাই আপনা থেকে যায় না—তাকে কষ্ট করে বয়ে নিতে হয়। কিন্তু সহজ বুদ্ধি বস্তুটা যে কি, সেটা আমি আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারলুম না। আমার বরাবর ধারণা এই যে, বুদ্ধি জিনিসটাই সহজ—অর্থাৎ ও-বস্তুটি ভগবান যাকে দেন তাকে জন্মের সঙ্গেই দিয়ে দেন। এবিষয়ে যাঁদের কিছু কমতি আছে তাঁরা বোধ হয় এইটে বোঝেন না যে, ঐ অভাবদোষটা তাঁদের স্বভাবদোষ।

ক্যাবল।

'প্রবাসী'। ভাদ্র ১৩২৫

অ ভি সা র

দিবাকর শর্মা

বি-এ ফেল করিয়া ঘর ছাড়িলাম। মাতৃকুল পিতৃকুলের ত্রি-সীমানায় কেহ ছিল না; সুতরাং গতি আমার অবাধ।

ফেল করিয়া দুঃখ করি নাই; সংবাদ শুনিয়া কবিতার খাতার প্রথম পাতা খুলিয়া কহিলাম, "ওগো তোমারই জন্যে এই যে ব্যর্থতা—এ তো আমার পুরস্কার। কোনো দুঃখ কোনো ক্ষোভ নাই!" অক্ষরগুলি কথা কহিল না; কিন্তু যাহার উদ্দেশে রচিত এই ছন্দের মালা, তাহার প্রসন্ন উজ্জ্বল তৃপ্তি ভরা চক্ষু দুটি স্পষ্ট খাতার পাতায় ফুটিয়া উঠিল।

সে আমার কৈশোরের আনন্দের স্বপ্ন—মঞ্জুলতা। মঞ্জুলা বলিয়া ডাকিতাম। আমার প্রতিবেশীনির তেরো বৎসরের কন্যা। এন্ট্রান্স পাশ করিয়া শহরে গেলাম। এফ-এ পাশ দিয়া ফিরিয়া শুনিলাম, মঞ্জু অপরের গৃহ আলো করিতে চলিয়া গিয়াছে। সে দিনের সেই আঘাত। সে কী নির্মম!

কবিতার মধ্যে স্বস্তি খুঁজিলাম। দিনের পর দিন বিচিত্র ছন্দে আমার খাতার পাতায় জীবনের এই মূর্তিমতী কামনার স্তব ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু এই খাতাখানি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন বন্ধন ছিল না। কলেজের বাহির দিকে চাহিতেই মনে হইত ইহাদের জন্যই মঞ্জুকে হারাইয়াছি। পুঁথির পাতায় মন বসিত না। বি-এ ফেল করিলাম।

(২)

ঘর ছাড়িয়া যেদিন বাহির হইলাম, সেদিন প্রদোষে কেবল প্রথম দক্ষিণের হাওয়া মুকুলিত তরুলতাকে আন্দোলিত করিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার শেষে জ্যোৎস্না রাত্রে বাহির হইলাম। দূর হইতে ফিরিয়া একবার পিছনে চাহিলাম—নিরুদ্দেশের যাত্রী, জীবনে আর এ গৃহে ফিরিব কিনা জানি না। যদি কখনও মঞ্জুকে ভুলিতে পারি......কিন্তু সে ব্যর্থ প্রয়াস কেন? আজ এই মরুজীবনের যাহা কিছু আনন্দ, সে তো তাহারই কল্পনায়। মঞ্জু আজ ষোল বছরের। ষোলটি বসন্তের রূপ ও আনন্দের অপূর্ব

সঞ্চয় আজ অপরের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আছে। শুধু আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব, আমি একা। কোনো লক্ষ্য ছিল না; দুই বৎসর ভারতের নানা-স্থানে ঘুরিলাম। হৃদয়ের রিক্ততা ঘুচিল না, শুধু কবিতার খাতা মঞ্জুলতার নব নব রূপ-বন্দনায় ভরিয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে মনে একটি খোঁচা লাগিত—মঞ্জু পরস্ত্রী। পরমুহূর্তেই মনের এ দুর্বলতা মুছিয়া ফেলিতাম। শাস্ত্র আর হৃদয়ের বিরোধ চিরকালকার। জানিতাম হৃদয় যাহাকে চাহে, শাস্ত্র তাহার বিচিত্র বিধি-নিষেধের যবনিকা দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিতে চায়। তারপর প্রেম! সে কোনো বন্ধন, কোনো সংস্কার, কোনো নিষেধ মানে না। মঞ্জু আজ পরস্ত্রী, দুর্লভ। মনে ভাবিতাম ইহাই বিধাতার বিধান......আমার হৃদয়কে ব্যর্থতায় ভরিবার জন্য, আমার কবিতাকে সার্থক করিবার জন্য।

দিনগুলি কাটিত এক রকমে, কিন্তু রাত্রি? সে তার অপার নিস্তব্ধতা দিয়া বাঞ্ছিতার অঞ্চলের মত আমাকে ঘিরিয়া রাখিত। কখনও গভীর নিশীথে আবিষ্টের মত উঠিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া ডাকিতাম, "ওগো এস, এস! দুর্বহ এ জীবন তোমা ছাড়া!"

হৃদয়ের ক্ষুধা যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন কাব্য খুলিয়া বসিতাম। উচ্চকণ্ঠে পড়িতাম কিনা জানিনা! তবে একদিন বাড়ির মালিকের মুখে শুনিলাম যে, আমার নৈশ অধ্যয়ন অপর সকলের অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। কথা কহিলাম না, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম ধন্য আমি! যুগ যুগ সঞ্চিত রস-আনন্দে ভরা এই যে কাব্য ইহার উপভোগের সৌভাগ্য শুধু আমার একেলার! কি সৌভাগ্য! কি গৌরব!!

সে গৃহ ছাড়িলাম।

(৩)

নগাধিরাজ হিমালয়! তাহারই সানুদেশে এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়া বাস লইলাম এক মুদীয়ানীর গৃহে। মুদিয়ানীর দোকানের পাশে একটি চালা ঘর প্রবাসী তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই ঘর অধিকার করিলাম। মুদীয়ানীর বিগত জীবনের কাহিনী শুনিলাম—সংক্ষিপ্ত অথচ করুণ। সাহারানপুরে তাহার পিতৃগৃহ হইতে প্রথম যৌবনে এক বাল-বিধবাকে যে পুরুষ ভুলাইয়া আনিয়াছিল, তাহার ক্ষুধা নারীর যৌবন ফুরাইতেই ফুরাইয়া গেল; আজ সে কোথায়, হতভাগিনী

তাহা জানে না। মুদীয়ানী চক্ষু মুদিল। আমার জীবনের কাহিনী তাহাকে বলিলাম। সে কহিল, "তাহাকে পাইবে বাবু। স্বপ্নে, কল্পনায়, ধ্যানে আজ যাহাকে পাইতেছ, সত্য হয় যদি তোমার প্রেম, তবে একদিন নিশ্চয় তাহাকে পাইবে।" সার্থক হোক্ নারী, তোমার আশীর্বাদ।

গিরিমূলের সেই নিভৃত চালাঘরে মঞ্জুলতার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইত যেন মঞ্জু আসিতেছে—সুদূরের পথ বাহিয়া আসিতেছে সে, কত মরু অরণ্য পার হইয়া আমারই এই কুটীরখানির দিকে। মুদীয়ানীকে কহিলাম। সে কহিল, "এ কথা সত্য বাবুজী, এমন ব্যাপার পূর্বেও ঘটিয়াছে। এই গ্রামেই......" তারপর গ্রামেরই এক বিরহী গোপ প্রণয়ীযুগলের মিলনের ইতিহাস। সে এক জ্বলন্ত প্রেমনিষ্ঠার কাহিনী।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। সেই কৃষ্ণ গিরিমালার প্রতিচ্ছবি আকাশের দর্পণে ফুটিয়া উঠিল আষাঢ়ের মেঘে, গিরি-কদম্বের শাখা-প্রশাখা ফুলে ফুলে শিহরিয়া উঠিল। অশ্রান্ত বর্ষণ! প্রকৃতির কি অভিনব চমৎকার রূপ এ! যক্ষ বিরহীর মিলন ঘটিয়াছিল, সেও কি এমনই বর্ষায়? প্রতিদিন মনে হইতে লাগিল, এ বর্ষা ব্যর্থ যাইবে না, মিলন হইবেই। এই পুঞ্জ কদম্বকেশর দিয়া রচিত হইবে আমাদের মিলন-শয়ন গিরি-পল্লীর এই নিভৃত কুটীরে! রাত্রিতে যেন মঞ্জুর কিঙ্কিণী ধ্বনি শুনিতাম, প্রতিদিনই যেন সে ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যায় গিরি বনানী পূরব হাওয়ার তান্ডব তালে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, তরু আর লতায় নিয়ত আলিঙ্গন, মেঘ আর বিদ্যুতে সঙ্গ, গিরিনদীটির নব যৌবনস্রোতে উপলখন্ডগুলি ডুবিয়া মরিতে চাহিতেছে। শুধু আমি একা! আমি একা!

আমি এই মিলন-চঞ্চল প্রকৃতির মধ্যে সে কি আসিবে না? ক্ষুধিত রহিয়া যাইবে এই বুক, শূন্য রহিয়া যাইবে এই শয়ন!

মুদিয়ানী কহিল, "এমন রাতেই মিলন হয় বাবুজী। আশা ছাড়িও না।"

মঞ্জুর কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; সহসা ঘুম ভাঙিগয়া গেল। গভীর রাত্রি। শব্দ কিসের! টুং টুং! এ যে তাহারই কিঙ্কিণী ধ্বনি, এতো আমি চিনি; আমি চিনি! শৈশব হইতে এ শব্দ আমি চিনিয়াছি। টুং-টুং-টং! ওগো এস! ওগো এস! যে বাহু

আলিঙ্গিয়া ও কনক-কিঙ্কিনী ধন্য হইয়াছে, সে বাহু আমার কণ্ঠে জড়াইয়া দাও, ওগো এস !

রাত্রি দ্বিপ্রহর। টুং-টুং-টুং! সেই ধ্বনি একেবারে আমারই গৃহতলে! এত কাছে! আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠিল সর্ব অঙ্গে; আবিষ্টের মত উঠিলাম, বাহু মেলিয়া কহিলাম, "যদি আসিয়াছ তবে আর কেন লজ্জা, কেন দ্বিধা। বুকে এস, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হোক !"

আবার সেই কিঙ্কিণীর ধ্বনি অতি স্পষ্ট, অতি মধুর আমারই দ্বার-প্রান্তে। দুয়ার খুলিয়া কহিলাম, "এস! ওগো এস, এই মুক্ত দ্বার পথে—মুক্ত হৃদয়ের পথ দিয়া এস !"

টুং টুং! এবার স্পষ্ট শুনিলাম, এই কিঙ্কিণী ঝণৎকারে বাঞ্ছিতার আমন্ত্রণ! বাহিরে আসিলাম, গভীর অন্ধকার! আমার ঘরের বারান্দায় এক কোণে তাহাকে দেখিলাম অতি সঙ্কুচিতা, আসন্ন মিলনের আনন্দ-লজ্জায়। আবার কিঙ্কিণী ধ্বনিয়া উঠিল টুং-টুং-টুং!

আর পারি না গো আর পারি না! একটি চুম্বনে আজ সুদীর্ঘ ব্যাথাতুর বিরহের সমাপ্তি হোক্। বাহু মেলিয়া চির-বাঞ্ছিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দ-উদ্বেল স্বরে কি কহিলাম জানি না।

এমন সময় মুদীয়ানী বাহিরে আসিয়া ডাকিল "বাবুজী" ?

স্বপ্নাচ্ছন্ন চক্ষু দু'টি মেলিয়া প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দেখিলাম— আমার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধকণ্ঠ মুদীয়ানীর বিরাট শ্বেত রামছাগলটি! বেচারী তখনও মুক্তির জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহার গলার ঘণ্টা বাজিতেছে টুং-টুং-টুং।

আমার ঘরের পিছনে এটা বরাবর বাঁধা থাকিত। আজ ঝড়ের উৎপাতে বারান্দায় উঠিয়া আসিয়াছিল।

সেই অবধি রাত্রে কাব্য-চর্চার অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছি।

"দিবাকরী"। বঙ্গাব্দ ১৩৬১

আমার সুন্দর

কাজী নজরুল ইসলাম

আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোট গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তারপর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। "ধূমকেতু", "লাঙল", "গণবাণী"তে, তারপর এই "নবযুগে" তাঁর শক্তি-সুন্দর প্রকাশ এসেছিল ও এল রুদ্র-তেজ বিপ্লবের, বিদ্রোহের বাণী হয়ে। বল্‌তে ভুলে গেছি যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে সৈনিকের সাজে দেশে ফিরে এলাম, তখন সর্বপ্রথম এই হক্‌ সাহেবেরই "দৈনিক নবযুগে"ই কি লেখাই লিখলাম, আজ তা মনে নেই, কিন্তু পনর দিনের মধ্যেই কাগজের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

এই গান লিখি ও সুর দিই যখন, তখন অজস্র অর্থ, যশঃ-সম্মান, অভিনন্দন, ফুল, মালা—বাংলার ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা পেতে লাগলাম। তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে চল্লিশ দিন অনশনব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্য। এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকমের শৃঙ্খলবন্ধন ("লিঙ্ক-ফেটার্স", "বার-ফেটার্স", "ক্রস-ফেটার্স" প্রভৃতি) ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদী মালা পেয়ে আমি জেলের সর্ব জ্বালা যন্ত্রণা অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই। আমার মত নগণ্য তরুণ কবিতা-লেখককে কেন তিনি এত অনুগ্রহ ও আনন্দ দিয়েছিলেন, তিনিই জানেন। আমিও কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, তিনিও বলেন নাই। আজ এই প্রথম মনে হ'ল, তাঁর দক্ষিণ হস্ত দিয়ে আমার "সুন্দরের" আশীর্বাদ এসেছিল, জেলের যন্ত্রণা-ক্লেশ দূর করতে। তখন কিন্তু একথা মনে হয়নি।

তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার লেখা নয়, এ লেখা আমারি মাঝে আমার পরম বন্ধুর, আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মাবিজড়িত আমার পরমাত্মীয়ের।

জেলে আমার সুন্দর শৃঙ্খলের কঠিন মালা পরিয়েছিলেন, হাতে পায়ে,

জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আমার অন্তরের অন্তরতম সুন্দরকে সারা বাংলা দেশকে দিয়ে দিলেন ফুলের শৃঙ্খল, ভালোবাসার চন্দন, আত্মীয়তার আকুলতা। আট বৎসর ধ'রে বাংলা দেশের প্রায় প্রতি জেলায়, মহকুমায়, বড় গ্রামে ভ্রমণ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য গান গেয়ে, কখনো কখনো বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। এই প্রথম আমার মাতৃভূমি বাংলা দেশকে ভালোবাসলাম। মনে হ'ল এই আমার মা। তাঁর শ্যামস্নিগ্ধ মমতায়, তাঁর গভীর স্নেহ-রসে, তাঁর উদার প্রশান্ত আকাশের কখনো ঘন, কখনো ফিরোজা নীলে আমার দেহমনপ্রাণ শান্ত উদার আনন্দ-ছন্দে ছন্দায়িত হ'য়ে উঠল। আমার অন্তরের সুন্দরের এই অপরূপ প্রকাশকে এই প্রথম দেখলাম প্রকাশ-সুন্দর রূপে, আমার জননী জন্মভূমি রূপে। আমি সেদিনের ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও নেত্রীদের আহ্বানে বাংলা দেশ পরিক্রমণ করেছি, আমি তরুণদের সাথে মিশেছি বন্ধু বলে, আত্মার আত্মীয় মনে করে, তারাও আমায় আলিঙ্গন করেছে বন্ধু বলে, ভাই বলে—কিন্তু কোনোদিন আমার নেতা হওয়ার লোভ হয়নি, আজও সে লোভ হয় না। আমার কেবলই মনে হ'ত, মানুষকে ভালবাসতে পেরেছি। জাতি-ধর্মভেদ আমার কোনোদিন ছিল না, আজও নেই, আমাকে কোনোদিন তাই কোনো হিন্দু ঘৃণা করেননি। ব্রাহ্মণেরাও ঘরে ডেকে আমাকে পাশে বসিয়ে খেয়েছেন ও খাইয়েছেন। এই আমি প্রথম আমার যৌবন-সুন্দর, প্রেম-সুন্দরকে দেখলাম।

তারপর আমার সুন্দর এলেন শোক-সুন্দর হয়ে। আমার পুত্র এল নিবিড় স্নেহ-সুন্দর হয়ে। বাহিরে মমতার মোমের মত ছিল সে সুন্দর, মমতার মধু-মাধুরী রস-সুরভি ছিল তার অন্তরে। সে আমাকে আত্মার মত জড়িয়ে ধরল। যেখানে যেতাম, সে আমার সাথে যেত। আমার সাথেই খেলত, মান-অভিমান কর্‌ত। যে সুর শিখাতাম, সে সুর দু'বার শুনেই সে শিখে নিত। তখন তার তিন বছর আট মাস বয়স। একদিন রাত্রে বলল, "বাবা, চাঁদের মধ্যে কে একটি ছেলে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে ডাকছে।" হঠাৎ আমার দেহে মনে কি যেন বিষাদের বিরহের বেদনার ঢেউ দুলে উঠল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। সেই রাত্রে তার প্রবল জ্বর এল। ভীষণ বসন্তরোগে ভুগে হাসতে হাসতে আনন্দধামের শিশু আনন্দধামে চলে গেল!

আমার সুন্দর পৃথিবীর আলো যেন এক নিমেষে নিভে গেল। আমার আনন্দ, কবিতা, হাসি, গান যেন কোথায় পালিয়ে গেল আমার বিরহ, আমার বেদনা সইতে না পেরে। এই আমার শোক-সুন্দর।

এই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগল—কোন্ নিষ্ঠুর এই সৃষ্টি ক'রে, কেন সে শিশু-সুন্দর কেড়ে নেয়? এই শোকের মাঝে জেগে উঠল স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রগাঢ় অভিমান, সেই অভিমান ঘনীভূত হ'য়ে আমার সর্বঅস্তিত্বে দেখা দিল ভীষণ মৌন বিদ্রোহ হয়ে, বিপ্লব হয়ে। চারিদিকে কেবল যেন ধ্বনি উঠ্‌তে লাগল, "সংহার কর! ধ্বংস কর! বিনাশ কর!" কিন্তু শক্তি কোথা পাই, কোথায় কোন্ পথে পাব সেই প্রলয়-সুন্দরের, সংহার-সুন্দরের দেখা? আমি বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কোথা হতে একজন সাথী এসে বললেন—"ধ্যান কর, দেখতে পাবে।" আমি বল্‌লাম, "ধ্যান কি?" তিনি বল্‌লেন—"একমনে তাঁকে ডাকা ও তাঁর চিন্তা করা।" এই প্রথম এলেন আমার ধ্যান-সুন্দর! মাঝে মাঝে ভালো লাগত, মাঝে মাঝে লাগ্‌ত না। মাঝে মাঝে ভ্রান্তি মায়া আমাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাতে লাগল। তারা বল্‌লে, আমরা তোমার প্রলয়-সুন্দরের প্রলয়-শক্তি; আমাদের সাথে পথ চল, তা'হলে স্রষ্টাকে দেখতে পাবে—তাকে আমাদের শক্তিতে সংহার করতে পারবে। আমার যে সহজ-সাবলীল আনন্দ-চঞ্চলতা, যৌবনের মদির উন্মাদনা, গান, কবিতা ও সুরের রস-মাধুরী ছিল, এদের সাথে পথ চলে যেন সে সব শুকিয়ে গেল। আমি আমার প্রলয়-সুন্দরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগলাম, "পথ দেখাও, তোমার পথ দেখাও।" কে যেন স্বপ্নে এসে বলল, "কোরাণ পড়, বেদান্ত পড়, ওতে যা লেখা আছে, তা পড়লে তোমার প্রলয়-সুন্দরকে—আমারও ঊর্ধ্বে তোমার পূর্ণতাকে দেখতে পাবে।" আমি নমস্কার করে বল্‌লাম, "তুমিই কি আমার কবিতায় লেখায় বিদ্রোহ হয়ে বিপ্লব-বাণী হয়ে আমার কল্পনায় আমার চেতনায় প্রকাশিত হয়েছিলে?" তিনি আমায় বললেন, "হ্যাঁ, আমি তোমারই পূর্ব-চেতনা, 'প্রিকন্‌শাস্‌নেস'। ইংরিজিতে বললেন, বোধ হয়, আমি যদি 'পূর্ব-চেতনা'র অর্থ না বুঝি। আমি বললাম, "আবার তোমার সাথে দেখা হবে?" তিনি বললেন, 'আমি যে নিত্য তোমার মাঝে আছি—আমি যে তোমার বন্ধু!" তিনি চলে গেলেন! সুখ-স্বপ্ন ভেঙে গেল, শিরায় শিরায় অণুপরমাণুতে সেই আনন্দ-অমৃতের শিহরণ সর্ব অঙ্গে জড়িয়ে রইল প্রিয়ার পুষ্প-মালার মত হয়ে।

গোপনে পড়তে লাগলাম বেদান্ত, কোরাণ! আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন্ বজ্রনাদ ও তড়িৎলেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগ্‌লাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ

স্বর্ণসুন্দর জ্যোতিঃ! এই আমার স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।

সহসা যেন কোন করাল ভয়ঙ্কর-শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, "তোমার মাতৃ-ঋণ,—তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?" আমি বললাম, "সাবধান! আমার মাঝে আমার প্রলয়-সুন্দর আছেন!" সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধশক্তি প্রবল বেগে নিম্নপানে টানতে লাগ্‌ল। বল্‌লে, "সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাংলার ঋণ, মানবরূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না করে তুমি যেতে পারবে না।" আমি বললাম, 'তুমিই কি কোরাণে লিখিত অভিশপ্তশক্তি শয়তান?" সে হেসে বল্‌লে, "হাঁ, চিনতে পেরেছ দেখে আনন্দিত হলাম! কোরাণে কি পড় নাই, আমার ঋণ শোধ না ক'রে তুমি স্রষ্টার কাছে যেতে পারবে না, তাকে দেখতে পাবে না! আমার বাধাকে অতিক্রময় করে যেতে পারবে না!" অনুভব করতে লাগলাম, আমার প্রলয়-সুন্দর আর যেন সাহায্য করছেন না। মাটির মানুষ মাটিতে ফিরে এলাম। এই পৃথিবীর মাটির মায়া আমাকে মায়ের মত প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরলেন, চুম্বন করতে লাগলেন, কাঁদতে লাগলেন। আমি বিদ্রোহ করে এই বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সেই ভয়ঙ্কর শক্তি পৃথিবীর কোল কেড়ে নিয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগলেন। আমার সহধর্মিনী অর্ধাঙ্গিনী শক্তিকে অর্ধপঙ্গু করে শয্যাশায়ী করে দিলেন। অর্থ কমিয়ে দিলেন, ভীষণ ঋণ দেনার রজ্জুবন্ধন ক'রে প্রহার করতে লাগলেন।

আমার পৃথিবী এসে আমাকে ধরে আমার জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন। এমন সময় এলেন আমার এক না-দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফতে আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন! আমি আবার এই প্রথম ধরিত্রী-সুন্দর মাকে ভালোবাসলাম, জড়িয়ে ধরলাম। আমার সকল জ্বালা যেন ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল! আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম, দৈন্যে, দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নাই, দেহে শক্তি নাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললাম, "আমি ব্রহ্ম চাইনা, আল্লাহ্ চাইনা, ভগবান চাইনা। এই সব নামের কেউ যদি থাকেন, তিনি নিজে এসে দেখা দেবেন। আমার বিপুল

আছে, আমার অপার অসীম এই ধরিত্রী-মাতার ঋণ আছে। আমার বন্দিনী মাকে অসুরের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করে আবার পূর্ণশ্রী-সুন্দর আনন্দ-সুন্দর না করা পর্যন্ত আমার মুক্তি নাই, আমার শান্তি নাই।"

ভয়ঙ্কর শক্তি আনন্দে হেসে উঠল। আমি বললাম, "এ তোমার অভিনয়!" সে বলল, "এই আমি প্রথম তোমার কাছে সত্যি করে হাসলাম, অভিনয় করিনি।" চেয়ে দেখি আমার পানে চেয়ে পৃথিবীর ফুল আনন্দে ঝরে পড়ল। আমি মাটি থেকে তাকে বুকে তুলে বল্‌লাম, "কেন তুমি ঝরলে?" ফুল বললে, "আমার মা লতাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার রূপ-রস-সুরভি-মধুকে জিজ্ঞাসা কর! তুমি যে এই পৃথিবীর সুন্দর মানুষ, তোমার মাঝে আমার সুন্দর আছেন, এই সুন্দরকে দেখে আমি আনন্দে ঝরে পড়লাম!" আমি ফুলকে চুম্বন করলাম, অধরে, বক্ষে, কপোলে রেখে আদর করলাম। ফুল বলল, "আমার সুন্দরকে পেয়েছি, আমার এই রূপ-রস-মধু-সুরভি নিয়ে তোমার মাঝে নিত্য হ'য়ে থাকব।" এই আমি প্রথম পুষ্পিত-সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকাল সন্ধ্যার অরুণ কিরণ ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গ-হিল্লোলিতা ঝর্ণা, তটিনী, কুলহারা নীল-ঘন সাগর, দশ-দিক-বিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল, আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মত সখার মত কথা কইল। আমায় "আমার সুন্দর" বলে ডাকল!

সহসা এল ঊর্ধ্ব গগনে বৈশাখী ঝড় প্রগাঢ়-নীল কৃষ্ণ মেঘমালাকে জড়িয়ে। ঘন ঘন গম্ভীর ডমরু ধ্বনিতে, বহ্নি-বর্ণা দামিনী নাগিনীর ত্বরিত-চঞ্চল সঞ্চরণে আমার বাহিরে অন্তরে যেন অপরূপ আনন্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠল। সহসা আমার কণ্ঠে গান হয়ে সুর হয়ে আবির্ভূত হ'ল—"এলরে প্রলয়ঙ্কর-সুন্দর বৈশাখী ঝড় মেঘমালা জড়ায়ে!" আমি সজল ব্যাকুল চীৎকার করে উঠ্‌লাম। "তুমি কে—কে?" মধুর সজল কণ্ঠে উত্তর এল—"তোমার প্রলয়-সুন্দর বন্ধু।" আমি বললাম—"তুমি ত আমায় ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলে, আবার কি জন্য এলে?" সে আমার আত্মাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, "তুমি স্রষ্টাকে সংহার করে তোমার মাকে সংহার করতে, মাতৃহত্যা করতে চেয়েছিলে, আত্ম-সংহার করতে চেয়েছিলে। তাই আমি তোমায় দু'ধারী তলোয়ার দিয়ে কেড়ে নিয়ে অভিমানে ফিরে গেছি। তোমার চৈতন্য ফিরে এসেছে। তোমার মাঝেই তোমার স্রষ্টাকে দেখতে পাবে আজ সৃষ্টিতে, পৃথিবীতে আকাশে-বাতাসে, রস-ভরা ফলে, সুরভিত ফুলে, স্নিগ্ধ মৃত্তিকায়, শীতল জলে, সুখ-দায়ী সমীরণে তোমার

সৃষ্টি-সুন্দরকে প্রকাশ-স্বরূপে দেখেছ। তোমার না-দেখা পরম প্রিয়তম পরম বন্ধুকে বিপুল অসহ তৃষ্ণা স্বপ্ন সাধ কল্পনা বাধা-না-মানা অসীমের পানে প্রবল প্রবাহ নিয়ে উজান গতিতে ঊর্ধ্বের পানে চলেছিলে, আজ সেই পরম পূর্ণতার, পরম শান্তির. পরম মুক্তির আনন্দ-বাণী নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমার বন্ধু হয়ে। এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে তোমার অপরূপ পূর্ণ মিলন হবে। তার আগে তোমাকে এই অসুন্দর পৃথিবী সুন্দর করতে হবে, সর্বঅসাম্য ভেদকে দূর করতে হবে। মানুষ যে তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তারপর হবে তোমার সুন্দরের সাথে পরম-বিলাস পরম-বিহার। আমি অপরূপ আনন্দে মাভৈঃ ধ্বনি ক'রে বললাম, "তবে দাও বন্ধু দাও আমায় দু'ধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙ্গা, দাও আমায় অসুর সংহারী ত্রিশূল ডম্বরু-ধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝা জটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর। দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি। দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুর দানব সংহারের শক্তি! দাও আমার কণ্ঠে এই পৃথিবীর বিষ, কর আমায় বিষ-সুন্দর নীলকণ্ঠ। দাও আমায় দামিনী তড়িতের কণ্ঠমালা। দাও আমার চরণে নটরাজের বিষম তালের নৃত্যায়িত ছন্দ!"

বন্ধু হেসে বললেন, "সব পাবে, তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই! আর কিছুদিন দেরী আছে, তুমি অভিমান ক'রে বিদ্রোহ ক'রে নিজের কি ক্ষতি করেছ নিজে কি কখনো চেয়ে দেখেছ? তুমি অরণ্যকণ্টক-কর্দমাক্ত পথে নিজের সর্বাঙ্গকে ক্ষত-বিক্ষত শক্তিহীন ক'রে ফেলেছ। তোমার এইসব অপূর্ণতা পূর্ণ হোক, তখন তোমার প্রলয়-সুন্দর তোমার সর্বদেহে আবির্ভূত হবেন। তোমার সুন্দরকে তুমি লতার মত জড়িয়ে ধরবে, তাঁর না-শোনা বাণী তোমার লেখায় ফুলের মত ঝরে পড়বে।" আমি বললাম, "তথাস্তু।" বন্ধু বললেন, "সাধু! সাধু! তথাস্তু!"

'দৈনিক নবযুগ'। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

বৈ কা লী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে কুঠীর মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে। মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেছে। অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা, আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছের সারী, নীচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্তি ধরেছে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েছে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো-মেঘে-ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোন্ দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না। কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, মুগ্ধ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম। ওঃ! সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্যের কথা মনে এলে এখন সারা গা কেমন করে ওঠে।

তার পরই সাঁ-সাঁ রবে ওপারের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠ্‌লো। দৌড় দৌড় দৌড়। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছেছি, আমাদের গ্রামের কোলে তখন বৃষ্টি পড়্‌তে শুরু করেছে। জেলি আর প্রিয় জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্ছে। একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কী দিয়েছে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েছে। অতিরিক্ত ভোগে ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায়নি।

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখিরা ডাকছে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল। আর একটা কি পাখি--পিড়িং পিড়িং করে ডাক্‌ছে, কত কি অস্ফুট কল-কাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি!......

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুল গাছের এত অপরূপ শোভা তা ত' জানতাম না। ঝোপের মাথায়

মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্যের ভারে। চারিধারে চেয়ে এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখির গানের সঙ্গে, মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তের সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন-বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কত দিনের কত স্মৃতি যে জড়িত! সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আদুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা, ইন্দির ঠাকরুণ। কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা পানকারী দরিদ্র বালকের, পীল্লবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরেজ বালক-বালিকারা, গাং-চিল পাখির ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wanএর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত। শান্ত সন্ধ্যা, কেউ নেই ঘাটে। ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেছে। একটি নক্ষত্র উঠেছে মাথার ওপর, কোন্ অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্য সংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্ধে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েছি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না; বিশেষ করে, বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি যেদিন সূর্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে হাল্‌কা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়, সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা-আলো, ডাঁসা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখি-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে কত অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়। দু'-একটা পাখি ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে। কি উদাস করুণ হয়ে ওঠে তখন চারিদিকের ছবিটা। বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুরমাদের বেল-তলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম—তার আর কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্বত্র। পাখির ডাকের তো কথাই নেই। সোঁদালি ফুল এখনও আছে তবে পূর্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্ছে।

এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া ভেবে দেখলাম যত স্থানে বেড়িয়েছি, আনন্দ সবচেয়ে বেশি গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্ছি শুধু এই এখানে। কোনো Cosmic thoughts আটকায় না বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান্‌ করে, রাত্রিতে কাজে মন বসে না। এ যেন Land of Lotus-eaters, কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়। সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্ছি দু' একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখির ডাকে ভরপুর। আর বৈকাল তো ওই রকম স্বর্গীয় অপরূপ, এ-পৃথিবীর নয় যেন। তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরণের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি। এই তো পাশেই চাল্‌কী, ওখানে এ রকম বৈকাল হয় না। এত পাখি সেখানে নেই, এ ধরণের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই। বনজঙ্গল বড় বেশি, কাজেই অন্ধকার। এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব সৃষ্টি। এতদিন তত লক্ষ্য করিনি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখিনি তো! দেখবোও না। কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজনাবাদ লাগে না এর কাছে। সে অন্য ধরণের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য। সেখানে কারুকার্য কম—বিপুলতা বেশি, মুখরতা বেশি।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরণের পাখি, বিশেষ ধরণের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরণের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরণের বৈকাল সম্ভব হয়েছে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ। মাঠে ও অরণ্যে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়, বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয় ওকে। এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেছে তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না।...........

বৈকালে নলে জেলের নৌকাতে বেড়াতে গেলুম মোল্লাহাটীর দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকাখানা ছাড়া হল। নদীর দু'ধারে অপরূপ শোভা। কোথাও বাব্‌লা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দু'ধারে ঘাস-ভরা নির্জন মাঠ। ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটে

আছে, গাঙ-শালিকের দল কিচ্-মিচ্ করছে। বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওক্ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ। মাঝে-মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলেডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেছে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্ছে। ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গোরু চরছে। ঝাঁকের মোড়ে দূরে খাব্রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ Lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদী-জলের ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বেরুচ্ছে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘননীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্রাম সীমায় শিমুল ও কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্বত। মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্ত সূর্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু। বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্শালিকের গর্ত, নীল মাছরাঙা পাখি শ্যাওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজ্তে খুঁজ্তে একবার ওঠে একবার বসে। খেজুর গাছ, গাবভেরান্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্তি সাঁই বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, ষাঁড়া, নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলনা শিমুল গাছ, শালিখ পাখি, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইটিবি, বনমূলার ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাসা, উলুঘাস, টোকা-পানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দু'খানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে। ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব হীরাকসের রং ধরেছে—গাঢ় নীল।

আবার দু'পাড় নির্জন। এক এক স্থানে নৌকা তীরের অত্যন্ত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে, কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল। চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না। ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাব্লা গাছ, শিমুল গাছ, ষাঁড়া গাছ, পাখির দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করছে। দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপটা পেছনে পড়েছে, এক এক স্থানে নদী-জল ঘোর কালো, নিথর কলার পাখির মত পড়ে আছে; দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর, অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেছে। অনেকখানি দূর পর্যন্ত মেঘে আকাশে গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা। খাব্রাপোতার ঘাটের পাশে কোন্ দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম

শাক কোঁচড় ভরে তুলছে আর মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইছে।

আরও খানিক দূর গেলাম, আবার সেই নির্জনতা। কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘর বাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দু'ধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দু'খানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছে, তিন দিনে সেখানে নাকি পৌঁছুবে বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমীশাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ি বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখি বাসায় ফিরছে; বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো। কি অপরূপ শোভা! সামনে খাবরাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনের আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব শ্যামলতা। কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে। নলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটছে। কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস, জোলো গন্ধ বার হচ্ছে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্ত-দিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখির দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা? কেউ না। এই যে সৌন্দর্য দিশেহারা হয়ে পড়ছি, মুগ্ধ, বিস্মিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচি, এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়? আমি এ সব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধ দিন দিন এত কমে যাচ্ছে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবন-যাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সঙ্কীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী। নলবন বাতাসে

দুলছে, জ্যোৎস্না পড়ে দু'পাশের নদীজল চিক্‌চিক্‌ করছে। ঘাসের আটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখি, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব সৌন্দর্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। এ দেশেই তো এ সব ছিল, এতদিন, কেউ তো দেখেনি, কেউ তো ভোগ করেনি! কতকাল পরে আমি এদের বুঝ্‌লাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম। এই জ্যোৎস্না এই আকাশ, এই ইছামতি নদী আমারই জন্য তৈরি হয়েছে!

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎসরাজি, নির্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায় মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য, রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান করে, দিনরাত গায়ক পাখিদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখি, ফুলফল, সূর্য,—এদের,—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম। তারপর গেলুম জটামারির পুলটাতে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তার পর এত বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপূর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে উঠল যে সে পুলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না। গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ও রকম আনন্দ পাইনি।

আজ চলে যাবো তাই বিদায় নিলুম। বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী। আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানিনা, আর দেখা হবে কি না তাও জানিনা, কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েছি, তোমার অপরূপ সৌন্দর্য এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখির কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অঙ্ক শুরু। বিদায় বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুল্‌বো?...........

"তৃণাঙ্কুর"। খৃীস্টাব্দ ১৯৩৯

গো রু র গা ড়ি

প্রমথনাথ বিশী

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অচল প্রাচ্য এবারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমের লোকের চোখে এ দেশকে যে অচল মনে হয় তার প্রধান কারণ ও-দেশের চেয়ে এদেশের গতির তাল স্বতন্ত্র। এদেশ অচল নয়, মন্থর। যে ব্যক্তি এরোপ্লেনে উড়িয়া চলিয়াছে তার কাছে মাটির গোরুর গাড়িটাকে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু গোরুর গাড়ি তো অচল নয়—মন্থর মাত্র! এতদিনে সেই সনাতনী ভারতবর্ষীয় গোরুর গাড়িও বুঝি লোপ পায়। যন্ত্রবাহন যন্ত্র-বহুল ইউরোপের নিরন্তর কর্মব্যস্ততার হাঁসফাঁস আমাদের শান্ত জীবনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইউরোপের মেল গাড়িখানার পিছনে বাঁধা অনিচ্ছুক মালগাড়িখানার মতো ছুটিতে বাধ্য হইতেছি। নাগরিক ভারতবর্ষ ইউরোপের Parody হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সত্তা এখনো আছে পল্লী-ভারতের; স্বাধীন গতি এখনো আছে এদেশের গোরুর গাড়ির; পল্লীগ্রামের ধমনীর তাল এখনো স্পন্দিত ওই গোরুর গাড়ির গতিতে। গোরুর গাড়ির পরিবর্তে এদেশের পল্লীর শত সহস্র অখ্যাত জটিল পন্থায় একবার মোটর গাড়ি চালু করিয়া দাও। ব্যস্, আর কিছুই করিতে হইবে না। দেখিতে দেখিতে এখনো যেটুকু ভারতবর্ষীয়ত্ব আছে তাহা লোপ পাইবে—আমরা সর্বতোভাবে ইউরোপের Parody হইয়া উঠিব। সেই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব মার্কিন মিস্ত্রি এদেশে আসিয়াছে তন্মধ্যে একজন ভারতবর্ষের গোরুর গাড়ি দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছে। বোধ করি গোরুর কষ্ট দেখিয়া লোকটা গোরুর প্রতি অনুকম্পান্বিত হইয়া স্থির করিয়াছে শীঘ্রই একপ্রকার উন্নতধরনের গোরুর গাড়ি তৈয়ারী করিয়া আনিয়া এদেশে চালু করিবে। মানুষ যখন বিশেষ করিয়া পশুর প্রতি সমবেদনাপরায়ণ হইয়া ওঠে তখন দেখা যায় তার ফলে পশুর দুঃখ তো কমেই না—বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়িয়া যায়—প্রকৃষ্টতম উদাহরণ পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি। এই মার্কিন মিস্ত্রির সমবেদনার প্রস্তাবের ফলে

প্রতিদিন আশঙ্কায় কাটিতেছে—কবে বা উন্নততর ধরনের গোরুর গাড়ি এদেশের সনাতনী গোরুর গাড়িকে কোণঠাসা করিয়া পথঘাট জুড়িয়া বসে। এই উন্নততর গোরুর গাড়ি ঠিক কি রকম হইবে জানি না—তবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বস্তুটা নিম্নতর ধরনের মোটর গাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ও দেশের জখমী মোটর গাড়িগুলিকেই নূতন ধরনের গোরুর গাড়ি বলিয়া এদেশে চালাইয়া দেওয়া হইবে—কেবল তাহাতে Horse Power-এর বদলে Bullock Power যোগ করা হইবে। এদেশের গোরুর দুঃখ যে কমিবে এমন অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে ওদেশের কারখানার মালিকদের কিছু ঘাটতি কমিলেও কমিতে পারে। আর এ দেশের যে সব কারিগর গোরুর গাড়ি তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহাদের বৃত্তিহীন হইবার আশঙ্কাও অল্প নয়।

কিন্তু এ সব তো গেল অর্থনীতির হিসাব। এ ছাড়া আর একটা হিসাব আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে পরমার্থ নীতির হিসাব। সেই পরমার্থ বা গোরুর গাড়ির বিশেষ তত্ত্বটি কি? এ দেশের শাসন যন্ত্রটার চালক যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোক হয় সেজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়দের দ্বারা শাসনকার্য চালিত হইলে দেশের কিছু উন্নতির আশা করা একেবারে আবস্তব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ভারতীয়দের মন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়া থাকে, অর্থাৎ এমন যদি হয় যে, তাহারা দেহে ভারতীয় আর মনে ইউরোপীয় তবে সে রকম চালকের দ্বারা শাসনযন্ত্র চালিত হইলে এমন কি লাভ হইবে? ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, আমাদের মন কি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে না? মানুষের চেয়ে কলের উপরে আমাদের ভরসা কি ক্রমেই প্রবল আকার ধরিতেছে না? এ দেশের গোরুর গাড়িতে যে মোহ আছে, সৌন্দর্য আছে, তাহার ধীরমন্থর গতিতে ভারতবর্ষের ধীরমন্থর জীবনের যে স্পন্দন আছে তাহা কি আর তেমন করিয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে? সংস্কারের ঝোঁকে কি আমরা সংস্কৃতিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলি নাই? ভাঙনের নেশায় কি আমরা ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্যন্ত ভাঙিয়া বসি নাই? কালাপাহাড় আমাদের চেয়ে চতুর, সে হাতুড়িটা কখনো ভাঙে নাই।

ভারতবর্ষের প্রতীক ভারতবর্ষের সনাতন গোরুর গাড়ি। আমি যদি চিত্রকর হইতাম—আর, কখনো ভারতবর্ষের একটি প্রতীকী চিত্র আঁকিবার

প্রয়োজন হইত—তবে আর কিছু না আঁকিয়া একখানি গোরুর গাড়ি আঁকিতাম। উদার প্রান্তরের বুক চিরিয়া সরু একটি পথের ফালি, উচ্চাবচ তরঙ্গিত হইয়া নিরুদ্দেশের মুখে ধাবিত, সেই পথের উপরে একখানি গোরুর গাড়ি। গাড়োয়ান মাথায় জীর্ণ গামছা বাঁধিয়া একটি বাঁশের বাঁশি বাজাইতেছে! তাহার মুখে চোখে কিছুমাত্র ত্বরা নাই; গাড়ির মন্থর তালের সঙ্গে বাঁশির সুর মিশিয়া রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের গায়ে গায়ে সৌন্দর্যের আলোকলতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর শ্যামল মরকতের পাত্রের উপরে রৌদ্রে-মাজা আকাশের নীলার মুখাবরণ, আর তার উপরে বাঁশির সুর আর রোদের টানা-পোড়েনে-বোনা খুঞ্চাপোষটি কাহার নিপুণ হাতে সযত্নে টানিয়া দেওয়া!

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রাভিষেক অতিক্রম করিয়া কোন্ সন্ধ্যার স্বর্ণ-তোরণের অভ্যন্তর দিয়া নক্ষত্রভাস্বর নিশীথের অভিমুখে সেই গোরুর গাড়ির নিরুদ্দেশ যাত্রা! তাহার ত্বরা নাই, তাহার বিশ্রাম নাই। "Without haste, without rest!" ভারতবর্ষের পরিজ্ঞাত ইতিহাস, অর্ধজ্ঞাত পুরাণ ও অজ্ঞাত কিংবদন্তীকালের এমন প্রতীক আর কি হইতে পারে জানি না! এ গোরুর গাড়ির আবিষ্কার কে করিয়াছিল কেহ জানে না। আর্যগণ আসিবার আগে, আর্যেতর সভ্যতা ছিল, তারও আগে হইতে ছিল গোরুর গাড়ি। গোরুর গাড়ি ও বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বস্তু। আর্যবংশোদ্ভূত অগস্ত বিন্ধ্যপর্বতের মহিমাকে খর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লোপ করিতে পারেন নাই। আর্যরাজাদের পুষ্পক রথ গোরুর গাড়িকে দ্রুত অবজ্ঞায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সে পুষ্পক আজ কোথায়? বিন্ধ্যপর্বতের খর্বোন্নত অনাড়ম্বর অঙ্গমালা ধীর মন্থর গমনে ভারতবর্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত—গোরুর গাড়িও গুজরাট হইতে আসাম পর্যন্ত আপনার চলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছে। রেল, মোটর, এরোপ্লেন তাহার রাজ্যের প্রত্যন্তে আসিয়া বাধা পায়—প্রবেশ করিতে পারে না।

এবারে তাই কি কলের গাড়ির নাম ভাঁড়াইয়া গোরুর গাড়ির রাজত্ব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? মোটর গাড়ি এবার গোরুর গাড়ি সাজিয়া সমুদ্র-পার হইতে আসিতেছে। মার্কিনী পরিকল্পিত এই নূতন গোরুর গাড়ি যানবাহনের রাজ্যে 'পঞ্চম বাহিনী'। এবারে তাহার হাতে রক্ষা পাওয়া ভার!

ইতিহাসের যাত্রাপথে ভারতবর্ষের আর-একটি সঙ্গী আছে চীনদেশ।

চীনেরও প্রতীক গোরুর গাড়ি। পৃথিবীর ইতিহাসে দুইখানি গোরুর গাড়ি পাশাপাশি চলিয়াছে—চীন আর ভারতবর্ষ। গোরুর গাড়ির মানদণ্ডে দুইটি সভ্যতম দেশ। আবার মোটর গাড়ির মানদণ্ডে দুইটি অসহায়তম, পশ্চাদ্গামীতম দেশ। মোটর গাড়ির প্রচুর ধূলিজালে গোরুর গাড়ি অর্ধাচ্ছন্ন—বিকৃতভাবে চোখে পড়িতেছে। এরোপ্লেন বিদ্যুৎগতিতে উড়িয়া যায়—ওই গতির দ্রুতিই গোরুর গাড়িকে দেখিবার অন্তরায়; ওই গতির দ্রুতিতেই গোরুর গাড়িকে অচল বলিয়া মনে হয়। এই মানদণ্ডেই ভারতবর্ষ এবং চীন অসভ্য।

চীন এবং ভারতবর্ষ যত দুর্গতি সহ্য করিয়া জীবিত আছে এমন আর কোনো জাতি নয়। এর চেয়ে অনেক কম দুর্দশায় অনেক জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এই চিরজীবিতা সভ্যতার প্রধান প্রমাণ। আর এই চিরজীবিতার কারণ চীন ও ভারতবর্ষ গোরুর গাড়ির তত্ত্বকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। গোরুর গাড়ি প্রস্তুত করা সহজ; নষ্ট হইবে মেরামত করা কঠিন নয়, আর তাহাকে চালনায় কোনরূপ কৌশলের প্রয়োজন নাই। ক্ষেতের একটা গাছ আর খামারের দুটো গোরু এই তো তার সরঞ্জাম। এই দুই প্রাচ্য দেশ জীবনযাত্রার 'গর্ডন গ্রন্থি' গোড়া ঘেঁষিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই বহু আততায়ী জাতি এই দেশকে জয় করিয়াছে, কিন্তু কেহই বশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তাহার প্রাণকে সাত লক্ষ ভাগে দেশের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া দিয়াছে। সে প্রাণপুরুষকে পুঞ্জীভূত করিয়া নগর গড়ে নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতার লক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ; তাহার প্রাণ গ্রামে, আর গোরুর গাড়িতে গ্রামের রক্ত চলাচল করে।

ইউরোপ সভ্যতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শহর গড়িয়াছে। একটি শহরে দেশের প্রাণ পুঞ্জিত, সমস্ত দেশ সেখানে পৌঁছিতে চায়, কাজেই আবশ্যক তার দ্রুতি। আর এই চাহিদার ফলেই দ্রুত বাহনের সাধনায় সে রেল, মোটর, এরোপ্লেন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই ঐকান্তিক কেন্দ্রীকরণই তার মৃত্যুর কারণ। একটি শহরের পতন হইলেই কেন যে একটি দেশের পতন হইবে তা ভারতবর্ষ বুঝিতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লণ্ডন ও দুই-চারটা শহরের পতন ঘটিলেই ইংলণ্ড জার্মান-কবলিত হইত। প্যারিসকে রক্ষা করিতে গিয়াই ফ্রান্স গেল। বার্লিনের পতনের পরে আর জার্মানীকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। নেপোলিয়ান মস্কো অধিকার করিয়াও রাশিয়াকে পদানত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তারপর হইতে রাশিয়া কেন্দ্রীকরণের সাধনায় নিরত। এবারে মস্কো অধিকৃত হইলে যে তাহার পতন

ঘটিত না, এমন মনে করিবার কি হেতু আছে? একথা আর কেহ জানুক বা না জানুক স্ট্যালিন বিলক্ষণ জানিতেন। তাই জার্মানীর মস্কো-অভিযান সমস্ত পণে তিনি ঠেকাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সমস্তের মূলেই ওই কেন্দ্রীকরণের আতিশয্য। কেন্দ্রীকরণ কাচের ন্যায় কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর। কেন্দ্রীকরণ দেশকে প্রবল করে, কিন্তু যখন ভাঙে তখন আর রক্ষা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ রবারের মতো, নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক। তাহা দেশকে প্রবল করে না, কিন্তু সহিষ্ণুতার বল দান করে। মোটর দৌড়ায় খুব, কিন্তু একবার ভাঙিলে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া বহন ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর মন্থর গোরুর গাড়ি ভাঙিতে পারে সত্য, কিন্তু সারাইতে কতক্ষণ!

পাঠক, এসব কথা হয়তো তোমার ভালো লাগিবে না, খুব সম্ভব বুঝিতেও পারিবে না। কিন্তু এত গোলযোগে প্রয়োজন কি? শীতের রাত্রে দীর্ঘপথ গোরুর গাড়িতে করিয়া কখনো গিয়াছ কি? প্রচুর খড়ের গাদির উপরে বিছানাপাতা, দুদিকে মোটা পর্দা টানিয়া দিয়া, পথের তালে তালে দুলিতে দুলিতে যদি কখনো যাত্রা করিয়া থাকো—তবে বুঝিবে গোরুর গাড়ির মহিমা! তার কাছে রেল মোটর তুচ্ছ। গরুর গাড়ির মন্থরতায় একপ্রকার নবাবী আছে যাহার অধিকাংশই দিল্লীর বাদশাহী অম্বুরী তামাক প্রভৃতির সঙ্গে গত হইয়াছে। এই নবাবী প্রাচ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। ব্যস্তবাগীশ পশ্চিম এরোপ্লেনে চড়ে তো চড়ুক। এসো পাঠক, আমরা উদ্দেশ্যহীন গোরুর গাড়ির লক্ষ্যহীন যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি। প্রচুর অবকাশের ঢিলে-জামাটা গায়ে জড়াইয়া আসর জমাইয়া বসি। পশ্চিমের অচলতার অপবাদের উত্তরে আমরা বলিব—ওরা চঞ্চল, ওরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এত হাঁসফাঁসের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ত্বরা নাই, আবার বিরামও নাই।

"বিচিত্র উপল।" বাংগাব্দ ১৩৫৮

খো কা র খে ল না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আজ সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলতে গিয়ে আমি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হোলো অপসিয়মান ঘুমের সমুদ্রের ঢেউই বুঝি বাস্তবতার বালুবেলায় ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্নকে ভুলে ফেলে গিয়েছে; স্বপ্নের কোনো বিভীষিকাই বুঝি মুহূর্তের অসতর্কতায় জাগরণের জগতে আটকা পড়ে গিয়েছে।

ঘুম আর জাগরণের মধ্যে যে গোধূলি-ছায়ার অস্পষ্ট জগৎ সেইখানেই সবে তখন আমি প্রবেশ করেছি। কিন্তু যে জগৎ সাধারণতঃ আলস্যের মধুর অবসাদে আচ্ছন্ন থাকে, রাত্রের সুরভি যা থেকে সহজে মিলোতে চায় না সেই জগৎ আমার কাছে তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

নিদ্রাজড়িত অর্ধনিমীলিত চোখে, অস্পষ্ট অন্ধকারে আমি দুটি অগ্নিময় চোখের তীব্র জ্বালা প্রথম অনুভব করলাম। তারপর বুঝতে পারলাম আমার বুকের ওপর অপার্থিব কোনো ভয়ঙ্কর জীব চেপে বসেছে। পৃথিবীর কোনো প্রাণীবিশেষের সঙ্গে তার সুদূর সাদৃশ্য হয়তো আছে। কিন্তু সেই নামমাত্র সাদৃশ্যই তাকে দিয়েছে বিকটতম ব্যঞ্জনা; যেন শয়তানের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গনিপুণ হাতে বিধাতার সৃষ্টির সৌষ্ঠব রেখা বেঁকে গিয়েছে উন্মত্ত ভীষণতায়।

সে জীবকে শুধু ঘোড়ার মতো বললে যেন সমস্ত অশ্ব-জগৎকে নিদারুণ অভিশাপ দেওয়া হয়। দেহের প্রতি রেখায় অশ্বত্বের সীমাকে সে দানবীয় বীভৎসতায় প্রসারিত করে দিয়েছে। যদি তুরঙ্গ হয়, তাহলে সে প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গ; চোখে তার ধ্বংসের সেই দাবানল, ভঙ্গিতে তার সংহারের ক্ষিপ্ততা।

ধর্ম-বিশ্বাস আমার গভীর না হলে মনে করতে পারতাম যে যুগান্তরে সন্ধিক্ষণ বুঝি অকালে এসে পড়েছে, সৃষ্টিকে তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবার সুযোগ না দিয়েই শুরু হয়েছে শেষ সংহারলীলা, ঝঞ্ঝা-ধূসর দিগন্ত আড়াল করে কল্পান্তের প্রলয়-নায়ক কল্কিরই বাহন আছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এ আতঙ্কের দুর্বলতাকে আমি শেষ পর্যন্ত জয় করলাম, যেমন করে সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকাকেই জয় করতে হয়।

আমি ভাল করে চোখ খুলে তাকালাম এবং সেই মুহূর্তে ফুটো করা বেলুনের মতো চুপ্‌সে, সেই বিরাট বিভীষিকা অকিঞ্চিৎকর সামান্য একটা খেলনা হয়ে দাঁড়ালো।

আমার বুকের ওপর খোকার খেলবার একটা রঙীন কাঠের ঘোড়া। খানিক আগে আমার ঘুমের সুযোগে সে আমার বুকটাই খেলবার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বোধ হয় নির্বাচন করেছিল। খেলা সাঙ্গ করে খেলনাগুলি সে ভুলে ফেলে গিয়েছে। বুকের ওপর তাই কাঠের ঘোড়া দাঁড়িয়ে। খেলাঘরের বন্দুক প্রভৃতি পাশে রয়েছে সাজানো!

প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গকে খেলনার কাঠের ঘোড়াতে রূপান্তরিত হতে দেখে আমার কিন্তু ঠিক হাসি পেলো না। আমার মনে হলো এতদিনে যেন খেলার সত্যকার গূঢ় অর্থ আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সহসা আমি সমস্ত খেলা ও খেলনার মানে বুঝতে পেরেছি।

আমাদের কাছে খেলনা মাত্রেই কেমন একটু মজার। তার ভেতর জীবনের অনুকরণের চেষ্টা একটু হাস্যকর। যেমন হাস্যকর শিশুর আধো আধো ভাষা। কাঠের ঘোড়া আধো আধো ভাবে সত্যিকারের ঘোড়া হতে চায় এবং সেই জন্যেই সে কৌতুকের বস্তু। যে আড়ষ্টতার ফলে সে বাস্তবতাকে ধরি ধরি করেও ঠিক নাগাল পায় না, তা দেখলে আমাদের হাসিই পায়। কিন্তু হাসি জিনিসটা বদলে যায়। খেলনার হাসি অনায়াসে অট্টহাসি হয়ে উঠতে পারে।

আসলে খেলনা মাত্রই ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর তার বাস্তবতার বিকৃতিতে, ভয়ঙ্কর তার সম্ভাব্যতার বিস্তৃতিতে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যে যুক্তিহীন আকারহীন অন্ধকার অসীমতা আছে তারই ইঙ্গিত সে করে। সীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে না থাকলে জীবনে সবকিছু মূল্যবান জিনিস যে সেই অসীমতায় বিকৃত বিপুল বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, ধর্ম আর নীতি, আদর্শ আর পথ যে সীমার নিষ্ঠাতেই সত্য হয়ে থাকে খেলনা হয়তো ভয়ঙ্কর ইসারায় সেই কথাই জানায়।

খেলনার এই ভীষণতা আমাদের বয়স্ক অজ্ঞতায় আমরা না জানতে পারি কিন্তু তার দীপ্ত সারল্যে শিশু তা জানে। খেলনাকে সে বড় হতে দেয় না কারণ সে জানে লঘুভাবে নাড়াচাড়া করবার জিনিস এ নয়, অসীম তন্ময়তা দিয়ে তার সাধনা করতে হয়। শিশুর প্রতিভা ও গভীর তন্ময়তা

আমাদের নেই বলেই খেলনা আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য। ব্যবসা চালানো থেকে নগর-নির্মাণ বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো ছোট সহজ কাজ আমরা করতে পারি কিন্তু খেলা করার গুরুতর দায়িত্ব শিশুর জন্যে বরাদ্দ রাখাই আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয়। বাস্তবতা যেখানে তার সীমা লঙ্ঘনে উদ্যত, সেই অকূল অনির্দিষ্ট ছায়াময় জগতের ব্যাপার সামলাতে প্রত্যাদিষ্ট শিশুর সারল্যই পারে।

এই সত্য, মোহাচ্ছন্ন মনের আধ-অন্ধকারে যেদিন আমরা ভুলে যাই সে দিনই হয় সর্বনাশের সূত্রপাত। আমাদের খেলনা হঠাৎ সমস্ত সঙ্গতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভীষিকাময় অট্টহাসি করে উঠে। আমাদের খেলা হয়ে ওঠে আত্মঘাতী উন্মত্ততা।

খোকার খেলনাগুলি তাই আমি সভয়ে সশ্রদ্ধায় সরিয়ে রেখে দিলাম। সে খেলনা নাড়াচাড়া করতে আমার সাহস হয় না। আমি জানি বড়দের আনাড়ি হাতে খোকার কাঠের ঘোড়া সহসা বিপুল অশ্বারোহী-বাহিনী হয়ে শ্যামল-প্রান্তর বিধ্বস্ত করে চলে, খোকার খেলার বন্দুক বিশাল হাউইট্জার হয়ে মৃত্যু বর্ষণ করেও তৃপ্ত হয় না, আরো পৈশাচিক হত্যালীলার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।

মাত্রা রাখতে না জেনে খেলনার উন্মত্ত বিভীষিকাকে যেদিন আমরা হাতছাড়া করে ফেলি, নিজেদের খেলার ভয়ঙ্কর পরিণামে যেদিন আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠি, সেদিন ভালো করে চোখ মেলে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে খোকার খেলনায় ভুল করে আমরা হাত দিয়েছি।

খোকার খেলনা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নিরাপদ পৃথিবী ছেড়ে খোকার রহস্যময় খেলাঘরে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ না করি।

"বৃষ্টি এল।" অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

চি ঠি র ক থা

অন্নদাশঙ্কর রায়

চিঠি পেতে আমার এখনো ভালো লাগে, কিন্তু লিখতে? লিখতে ভালো লাগে না বললে বাড়িয়ে বলা হয়, অথচ ভালো লাগে বলতেও বাধে। অনেকদিন থেকে শরীরে এক প্রকার ক্লান্তি বোধ করে আসছি, বোধ হয় দোষটা তার। অথবা মনের, কেননা মনেও এক প্রকার নির্লিপ্ত ভাব। এমন হুজুগ বেশি নেই যা আমাকে উস্‌কে দিতে পারে। আর সমস্যা যা আছে তা যত সোজা ভেবেছিলুম তত নয়, সমাধান শোনাতে যাওয়া ছেলে মানুষী। এই ধরুন হিন্দু মুসলিম সমস্যা। এককালে এর জন্যে যত রক্ত ক্ষয় করেছি তা প্রায় রক্তপাতের সমান, সে সব চিন্তা চিতার মতো আমাকেই জ্বালিয়েছে, আর আমার প্রবন্ধ পড়ে পক্ষপাতী পাঠক পাঠিকারা জানিয়েছেন, "এর চেয়ে একটা গল্প লিখলে পড়ে তৃপ্তি হতো।"

দেহমনের এই অবস্থায় চিঠি লিখতেও উৎসাহ পাইনে। অবশ্য যে চিঠি সরকারী বা দরকারী তার জবাব দিতে হবে, তার বাঁধা ভাষা আছে, লিখতে কষ্ট যেটুকু হয় সেটুকু মানসিক নয়, শারীরিক। সরকারী হলে তো কোনো কষ্টই নেই, স্টেনোগ্রাফার আছেন, তিনিই শারীরিক ক্লেশ থেকে বাঁচান।

কিন্তু যে সব চিঠি নেহাৎ অদরকারী তাদের বেলায় আমার হাতের চেয়ে মাথার ঝঞ্ঝাট বেশি। একদা আমি অকাতরে চিঠির তুলো উড়িয়েছি, ওই যেমন শিমুলের তুলো উড়ছে তেমনি। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমার একটা তৈরি মত ছিল। আইনস্টাইন থেকে শুরু করে গ্রেটা গার্বো পর্যন্ত যে কোনো মানুষের সন্বন্ধে, তত্ত্বের সম্বন্ধে দু' কথা লিখতে ভীত হতুম না, গায়ের জোরে তর্ক করতুম ও কলমের জোরে কাগজ কালো করতুম। ধৈর্যও ছিল অসীম, কেউ যদি না বুঝত আমি চিঠির পর চিঠি লিখে বোঝাতুম। সে সব দিন গেছে।

এখন যে আমার তর্কের ঝোঁক নেই তা নয়। মত জাহির করার রোগও আছে। সেদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বারো বছর পরে দেখা হলো, যতক্ষণ একত্র ছিলুম দু'জনে তুমুল বকেছি, কেউ কাউকে ভজাতে পারিনি, সেই তো দুঃখ। কিন্তু শতং বদ, মা লিখ। সেই বন্ধু যদি চিঠি লিখতেন আমার অন্য রূপ

দেখতেন। কেননা এই বারো বছরে আমি যেমন লিখতে শিখেছি তেমনি না লিখতেও শিখেছি।

আমার কোনো কোনো চিঠি বন্ধুজনের নির্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে চিঠিরও সাহিত্যিক মূল্য থাকতে পারে। তেমনি ভয়ও জেগেছে যে আমার যে সব চিঠি ছাপবার মতো করে লেখা নয়, ফূর্তি করে লেখা, সে সব চিঠিও একদিন ছাপার হরফে উঠতে পারে। এখন চিঠি লিখতে বসলে অমনি সতর্ক হই, পাছে এমন কিছু লিখি যা ছাপার হরফে ধরা পড়লে আমাকে সুদ্ধ ধরা পড়িয়ে দেবে। পাঠকরা ভাববেন, "কই, এঁর বই পড়ে যেমন মনে হয় চিঠি পড়ে তো তেমন হয় না।" এতদিনের সাধনায় আমার যে সাহিত্যিক রূপটি দেশের পাঠকদের চোখে পরিচিত হয়ে এসেছে, একখানি চিঠি তাকে একদিনেই ধূলিসাৎ করতে পারে। অতএব শতংবদ, মা লিখ।

তারপর আরো আপদ আছে। সাহিত্য রচনার একটি উৎকর্ষ মান আছে, সেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবার একটা প্রয়াস আছে, সে প্রয়াস তো চিঠির বেলায় স্থগিত রাখতে পারিনে। দরকারী বা সরকারী চিঠি হলে অন্য কথা, কিন্তু যে চিঠি কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা হয়েছে তা সাহিত্যের স্বজাতি, কেননা সাহিত্যও কেবলমাত্র পড়বার জন্যে লেখা। তাহলে সাহিত্যের মান চিঠির উপরও আরোপিত হয়, চিঠিও হয়ে ওঠে সাহিত্য। তফাৎ শুধু এই, যে চিঠি লেখার একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে, সাহিত্যের তা নেই। অর্থাৎ প্রবন্ধ বা গল্প এক মাস পরে লিখলেও চলে, চিঠি ফেলে রাখলে চলে না। পত্র লেখকরা পত্র পাঠ উত্তর প্রত্যাশা করেন। আমি এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাইনে, এ সমস্যা হিন্দু মুসলিম সমস্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। যদি আমি রবীন্দ্রনাথ হতুম তবে যাই লিখতুম তাই হতো উৎকৃষ্ট, কিন্তু আজ যা লিখি কাল তা পছন্দ হয় না। সেই জন্যে আমার চিঠি যেদিন লেখা হয় সেদিন ডাকে না গেলে পরদিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে যায়। যাঁরা আমার চিঠি পান তাঁরা জানেন না যে হয় ও চিঠি কোনোমতে ডাকঘরে গিয়ে জান বাঁচিয়েছে, নয় ওর বহু জন্ম অতীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে চিঠি হয়ত আমার মনের মতো হয়নি। কী করি, একেবারে জবাব না দিয়ে তো পারিনে।

ফল হয়েছে এই যে আমাকে চিঠি লিখলে আমি তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত নিরুত্তর থাকি। এটার মূল কারণ কুঁড়েমি, কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয়। চিঠির যদি সাহিত্যিক মূল্য থাকে আর চিঠিতে যদি কেউ

সাহিত্যের স্বাদ আশা করেন তবে তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় নেই। দরকারী কাজ থাকলে জবাব লেখা দরকারের নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু যেখানে দরকারটা কাজের নয়, ভাবের, সেখানে মনোভাবের মর্জির উপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই। ভাবুকের চিঠি ভাবের অপেক্ষা রাখে, ভাব যদি তিন মাস আগে না আসে তবে ভাবের অভাব কি ভাষা দিয়ে পূরণ করা যায়? কিম্বা মামুলি কুশল সম্ভাষণ দিয়ে?

তাই আমার চিঠিতে প্রায়ই দেখা যায়, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে লজ্জিত।" দেরি না হলেও লজ্জার কারণ হতো, সে লজ্জাপত্র পাঠকের কাছে না হোক নিত্যকালের পাঠকের কাছে। কে জানে কোন চিঠির দৌড় কতদূর! কোন চিঠি কবে ছাপা হবে, কার চোখে পড়বে! এমন করে লেখাই শ্রেয়ঃ যাতে লেখার দিক থেকে ত্রুটি নেই, যা রসের তুলিকায় লেখা। তার জন্যে যদি তিন বছর দেরি হয়ে যায় তবে নাচার।

কিন্তু সামাজিক মানুষের লোকভয় আছে। যিনি চিঠি লিখেছেন তিনি কেন মার্জনা করবেন! তাঁর আত্মসম্মান আছে! সসীম সময়ের মধ্যে উত্তর না পেলে তিনি ধরে নেবেন যে লোকটা ভদ্রলোক নয়, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেয় না। সেই ভয়ে যাহোক একটা কিছু লিখে দিতে হয়। নইলে চিঠির পাহাড় নিয়ে আমি করি কী। এই তো ইতিমধ্যে একটি স্তূপ জড় হয়েছে। একদিন বসে যত পারি লিখব ও ছিঁড়ব, অন্তত জনকয়েকের কাছে ভদ্রতা বজায় থাকবে।

লিখব, "উত্তর দিতে দেরি হলো বলে মনে কিছু করবেন না।" লিখব, "আপনার চিঠি অনেক দিন আগে পেয়েছি, কিন্তু আমার শরীর মন ভালো ছিল না।" মিথ্যা নয়। তবু সত্যও নয়। সত্য হচ্ছে এই যে শিল্পী মন সজাগ থাকে না সব দিন। যেদিন জাগে সেদিন হয়তো তিন মাস বিলম্ব হয়ে গেছে। সে মন ভদ্রলোকের মন নয়, তাই ভদ্রলোক তার জন্যে লজ্জিত।

হাঁ, চিঠি পেতে আমার এখনো ভাল লাগে, মনের সঙ্গে মনের ছোঁয়া-ছুঁয়ি এখনো মধুর। এমন কি ঠোকাঠুকিও আমার মন্দ লাগে না। আমি মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিই নে, অতটা Self-righteousness আমার সাজে না। কিন্তু চিঠি লিখতে বসলে আমি হয় ভদ্রলোক, নয় ভাবুক। ধরা-ছোঁয়া দিতে সাহস হয় না, ফুর্তি করে লেখা বন্ধ। এর জন্যে দায়ী আমার সাহিত্যিক খ্যাতি, এ হচ্ছে খ্যাতির খেসারৎ! ছাপাখানার ভয়ে আমি আড়ষ্ট।

"জীয়ন কাটি"। বঙ্গাব্দ ১৩৫৫

চি ত্র ক লা

শিবরাম চক্রবর্তী

সঙ্গীত-বিদ্যা হচ্ছে স্বতস্ফূর্ত। সকলেই গাইতে পারে। স্বরকে নাকের ভিতর দিয়ে ছাড়লেই সুর। স্বভাবতই ঋ ঐ এবং ঔ বাদে অকারাদি যে কোনো স্বর নাসারন্ধ্রের পথ ধরলেই রাগরাগিণীর আকার ধারণ করে। হ্রস্বদীর্ঘের বালাই নেই। কেবল প্লুতস্বর হলেই হল— নিজগুণেই তা সঙ্গীত রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সরস্বতী নাকের গোমুখী দিয়ে নামলেই সুরধুনী।

কে ঠেকায়? তখন আপনি গুনগুন করেও গাইতে পারেন, আবার আপনার গানের গন্‌গনে আঁচও দেখা যেতে পারে। গুঞ্জনই হোক আর গঞ্জনাই হোক, আপনি তখন গাইয়ে। সুর নাড়তে থাকুন, (হাতী কিম্বা গণেশের মত) ঐশ্বরিক অবলীলায়—গানের ঐশ্বর্য আপনার গলায়। আপনিই গল্‌ছে, অথবা আপনিই গলাচ্ছেন।

গানকে ছিপের মতো একান্তে একজনের উদ্দেশেও ফেলা যায়, সেখানে একটি মাত্র উৎকর্ণকে খেলিয়ে তোলাই হবে লক্ষ্য। কেবল দেখতে হবে যেন সে পালিয়ে না যায়। গাঁথা যেন ভালো হয়। এই কারণেই গীতকে অনেক সময়ে গাথাও বলা হয়ে থাকে।

আবার গানকে সুরের জালের মতো বিস্তার করে একটা এস্‌পার-ওস্‌পার কান্ডও করা যেতে পারে। একসঙ্গে অনেকের কানান্ত করতে হলে সেইটেই রেওয়াজ। গান হচ্ছে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার, একটিই হোক বা একাধিক হোক, কর্ণবধেই তার সার্থকতা।

ছিপের মতই ছাড়ুন বা জালের মতই ছড়ান, সুরের ছলনাই হল আসল। শুঁড়ের জালিয়াতি। সুর আর শুঁড়—একই নাকের সীমান্ত থেকে হাম্‌লা দিতে বেরয়। নাসিকের ঢোল কর্ণাটে সহরৎ হতে থাকে। সভ্যতার বর্তমান সঙ্কটে তথাকথিত ভদ্রসমাজে হাতের সুখের জন্য কারো কান মলতে পাওয়ার সুবিধে নেই— কান প্রায় পরস্ত্রীর মতই—একজনের কান অপরজনের নাগালের বাইরে। এক্ষেত্রে কেবল সুর বাড়িয়েই পরের

কান পাকড়ানো যায়। পরকীয়া পরখের এইটিই পথ। আর এ যুগের কানাইরা ঐ ভাবেই জমিয়ে থাকেন।

অবিশ্যি আপনার গানের পটুতাই অপরকে পটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হতে পারে—শ্রোতার-কর্ণপটাহও জোরালো হওয়া দরকার। 'কেবল গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে!' কেবল গাইয়ের নয়তো দুধ, গোয়ালারও কিছুটা বইকি। কালাপাহাড়ের কাছে কালোয়াতির কোনো কদর নেই। না-কালাকে নাকাল করতে পারাতেই তার ওস্তাদি। গাইয়ে আর শুনিয়ের—নিজেদের নাকে-কানে খৎ দিয়ে, ক্ষত সৃষ্টি করে নিজেদের এই যে সাজা দেয়া, বিবাহিত জীবনের বাইরে এমন মজা, ঈদৃশ সমজ-দারি দুর্লভ।

কিন্তু গাইতে পারা যেমন সোজা, আঁকতে পারা তেমন না। আঁকের জগতে দুয়ে দুয়ে চার এবং গোরুর বাঁটে দুয়ে দুয়ে দুধ হতে পারে কিন্তু আঁক আর আঁকা এক নয়। আঁকিয়ের কাছে দুয়ে দুয়ে বাইশ। দুটি রেখায় লেখমালার মধ্যে কেবল দুটি মাত্র কথা নয়, আরো বিশটা কথা মুখর হয়ে উঠ্‌লেই সেটা ছবি। তাতে কুলো-পানা চক্করও যেমন, বিষও তেমনি।

অঙ্ক-বিদ্যা আর অঙ্কন-বিদ্যা এক নয়। একই কাগজের পিঠে উভয়ে ফলাও হলেও দুয়ের ভেতর ভয়ঙ্কর ফারাক। কাগজ এক হলেও ওদের আঁকবার ধরনও এক রকমের না। যদিও আঁকের মতই, আঁকারও অনেক সময় ফল মেলে না।—আঁকিয়েরা বলে থাকেন, তাহলেও, সমান নিষ্ফল হলেও, ওরা এক জাতের গাছ নয়। ওদের বীজ-গণিতে, অঙ্কুরে আর পাতাবাহারে পার্থক্য আছে।

অঙ্কের হচ্ছে কষাঘাত আর ছবির কাজ বশীকরণ। শিল্পীর স্থান আঙ্ককের উপরে। আঁক কষার চেয়ে তুলি কসানো কঠিন। এমন কি আপনার গীতকারের চেয়েও। কেবল নাক থাকলেই গাওয়া যায়, কিন্তু ছবি আঁকার knack থাকা চাই।

আঁকি-বুঁকির চর্চায় আমার অনেক আয়ু গেছে। আর্টিস্ট হিসেবে আমি কোন্ স্কুলের তা বলা হয়তো একটু দুরূহ হলেও ইস্কুলে পড়বার কালেই যে এই বিদ্যায় অধমের হাতে খড়ি, তা জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই। অঙ্কের খাতায় আঁকের বদলে আঁকের মাস্টারকে অঙ্কিত করেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। তারপরে অবিশ্যি আমি হেড পণ্ডিতকেও এঁকেছিলাম—হাত আর একটু পাকলে পরে।

তারপর থেকে আঁকার বদভ্যাস আমি বরাবর বজায় রেখেছি। এ'কে চলেছি—এ'কে, ও'কে, তাঁকে। লেখা আর রেখা চালিয়ে এসেছি সমানে। এখনো আমি ছবি আঁকি—এ'কে থাকি—সভাযাত্রার সুযোগে। সভাসমিতিতে গেলেই আমাকে আঁকতে হয়। সাধারণত সভাসমিতিই হচ্ছে ছবি আঁকার শ্রীক্ষেত্র।

লক্ষ্য করে দেখেছি, বক্তাদের বাগাড়ম্বরের কালে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছুই তেমন করবার থাকে না। তখন ঐ হচ্ছে একমাত্র কলা যার কারবার চলে। জুত করে ফলানো যায়। কারো বক্তৃতার ফাঁকে আপনি গান গাইতে পারেন না—পারলেও খুব কদাচ। অথচ কাগজ-পেনসিল্ নিয়ে ঐ অবকাশে অনায়াসেই ছবি আঁকা যায়। এন্তার— যত খুশি এবং আমিও ঠিক তাই করে থাকি। আমি যে চিত্রশিল্পে সিদ্ধহস্ত একথা বলি না, তবে আর কয়েকটা সভাসমিতিতে যোগ দিতে দিতেই পারদর্শী হতে পারব এমন আশা রাখি।

কাগজ-পেন্সিল্ বগলে নিয়ে সভায় তো গেলেন, কিন্তু আঁকবেন কী? আর আঁকবেনই বা কখন? কখন? যখন দেখবেন সভা বেশ জম্জমাট, আর বক্তৃতাও কিছুদূর গড়িয়েছে, তখনই আঁকা শুরু করতে পারেন। আর, কী আঁকবেন? কেন, মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য—এমন কি চিত্র-কলাতেও। মানুষকে চিত্রিত করাই সব আর্টিস্টের প্রথম দায়। খোদ সভাপতিকে নিয়েই আপনি শুরু করতে পারেন। বক্তাদের আঁকতেও বাধা নেই। শ্রোতাদের ভেতর থেকেও পছন্দ করে আঁকা যায়। অবিশ্যি এ'দের অনেকেই মানুষ কি না সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। আমার তো মশাই. মানুষ নিয়েই কারবার—যা কিছু কারুকাজ! প্রথমে তার মাথা নিয়েই আমি আরম্ভ করি। সব আগে তার কপাল আঁকি (শোনা যায় বিধাতা পুরুষও ঠিক তাই করে থাকেন। কপাল থেকেই তারও নাকি রেখায়ন। আর শিল্পী—যে কালে শ্রস্টার সগোত্র, খোদার মতই তার খোদকারি হবে, কিছু বিচিত্র নয়!) তারপর কপাল ক্রমে শুরু করে একেবারে তার চিবুক পর্যন্ত নেমে আসি। নিজের স্বচ্ছন্দে এ'কে যাই—এ'কে বে'কে চলে যাই।

তারপর বহির্দৃশ্য শেষ হলে তার চোখ নিয়ে পড়ি। মানুষকে চোখা করে তোলাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। চক্ষুদান করাই অঙ্কন বিদ্যার সর্বাপেক্ষা কষ্টকর অংশ। চোখটা যে কোথায় বসবে সহজে ঠিক করা যায় না। যদি ঠিক মত না বসে, বেখাপ্পা দেখায়, তখন সেই বিসদৃশ ব্যাপার থেকে একমাত্র বাঁচোয়া হচ্ছে মানুষটাকে চশমা পরানো। তাতে চোখের দোষ

কেটে গিয়ে তাকে বেশ চৌকোস দেখাতে থাকে। মানুষকে খাপ-সুরৎ করতে মশাই, চশমার তুল্য আর নেই।

মাথার সম্মুখ ভাগ শেষ হলে তখন তার বাদবাকি। কিন্তু মাথার পশ্চাদ্দিক আঁকাটা তত সহজ নয়। অনেকখানিই তার অনিশ্চিতের গর্ভে। অনেকটা জুয়াখেলার মতই। বেশির ভাগ, লোকটার বরাতের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা হলেও দক্ষশিল্পীর হাতযশ নেহাত ফ্যাল্‌না নয়। তবু সামনের সঙ্গে পিছন মেলানো ভালো নাপিতের বাহাদুরির মতই দুর্লভ কীর্তি। রীতিমত অধ্যবসায়-সাপেক্ষ।

এর পরের কাজ হচ্ছে লোকটির প্রতি কর্ণ পাত করা। তার কান বানানো। কানের কাজটা সারতে পারলেই বাকিটা তখন বিল্‌কুল্‌ কিছু না। কিন্তু কান দেওয়া সহজ নয়, চোখ দেওয়ার চেয়েও কঠিন। আরো এক প্রকাণ্ড ব্যাপার কানটাকে আমি ঠিক মত টানতে পেরেছি বলেই মনে করি। একটু ডানদিক-ঘেঁষা বলে ধারনা হতে পারে, কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে. চারা নেই! একবার কান দেবার পরে আর ফেরানো যায় না। ফেরার পথ তখন রুদ্ধ। পুরাকালের কর্ণও অযথাস্থানে রয়েছেন জেনেও ফিরতে পারেননি—মহাভারতে তার প্রমাণ আছে।

এইবার চুলের পালা। এটা বেশ আরামের কাজ—ফূর্তির সঙ্গেই করা চলে। খুব ঝাঁক্‌রা ঝাঁকরাও করতে পারেন, কুচ্‌কুচে কালো করতেও বাধা নেই, আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অতিশয় বিরল করাও কিছু শক্ত নয়। ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের জন্য বেশি দামের নরম পেন্‌সিল নিতান্ত জরুরি। মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপিত মেয়েটির মত, আমিও নিজে ঘন কালো চুল ভলোবাসি; কেন না তা হলে তার মধ্যেকার সিঁথির রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চুল না আঁকা পর্যন্ত মানুষের মাথা যে কত বড় তার কোনো ধারনাই গজায় না। চুল শুধু মাথার বাড় নয়, মাথাকে বাড়িয়ে বৃহৎ করে দেখানোও তার একটা কাজ। ও হচ্ছে মাথার মহাভারতে একাধারে বনপর্ব আর বিরাটপর্ব। চুল আঁকতে গিয়ে গোটা একটা বক্তৃতা কাবার হয়ে যায়—এমন কি, সভাপতির অভিভাষণ পর্যন্ত এই চুলেই চলে যেতে পারে। (চুলোয় নয়, এখানে মুদ্রাকর প্রমাদ হওয়া অবাঞ্ছনীয় হবে। ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য)।

এবার অন্য চিত্র। এত কাণ্ড করে যে আদ্‌মিটিকে আমি আমদানি করলাম তাকে একবার দেখা যাক্‌। গোড়াতেই বলে রাখি এটি আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। (এর চেয়েও ভালো মানুষ আমার হাতে এসেছে— ঢের ঢের

ভালো মানুষ। খারাপ মানুষও অবিশ্যি কিছু কম আসেনি। কিন্তু সে-উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক) বক্ষ্যমান লক্ষ্যটির দিকে তাকালে প্রথমেই ওর কানের খুঁত চোখে পড়বে। কানটা যেন একটু দক্ষিণাপথ নিয়েছে। কানটাকে ভারি পাতলা বলে জ্ঞান হবে—আমাদের নেতারা সচরাচর যেমন কান-পাতলা হয়ে থাকেন। তারপর এর চোখ। কালবিলম্ব না করে এই লোকটির চশমা নেয়া উচিত ছিল বলেই আমি মনে করি। দৃষ্টি এতই সূক্ষ্ম, আছে কি নেই বোঝাই দায়। কিন্তু চশমা নিলে সম্ভবত ওকে আধুনিক কবির মত দেখাতে পারতো এবং নেহাত মন্দ দেখাত না। সে ক্ষেত্রে, চুলচেরা ভাবে খতিয়ে, আরেকটা বৃহত্তর বাগ্মীতার সুযোগে, আধুনিক কবির চশমার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর খাতিরে ওর কেশ কলাপকেও ফলাও করে আরো একটু বেশি জাহির করার প্রয়োজন হয়তো ছিল মনে হয়।

আমার শিল্পকীর্তির পরাকাষ্ঠা, বেশির ভাগ মানুষই আমি দেখেছি পশ্চিম দিকে মুখ করে জন্মায়। কেন যে, সে-রহস্য এখনো আমার অজানা। অনেকটা আমাদের দেশের সেরা মানুষদের মতই—পশ্চিমদিকে মুখ ফেরানো। সাবেক কংগরসিক, প্যান্ইসলামিক বা আধুনিক মস্কো-পন্থী—পূর্ব এবং অপূর্ব-যুগের—জাতীয় ও বিজাতীয় যাবতীয় নায়কের মতই এগুলি যেন পশ্চিমদিকে মুখিয়ে রয়েছে।

পরিপ্রেক্ষিত ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত। ও-আঁকার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্চে, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত লম্বা আর ফাঁকা একটা রাস্তা টানা। আর তার ধার-বরাবর টেলিগ্রাফের তার লাগানো সারি সারি দাঁড়ি খাড়া করে দেয়া। আমি আবার সেই সাথে রাস্তার এক পাশে লম্বা বেড়া বেঁধে দিই। খুব মজবুত বেড়া হয়নি যদিও। নিসর্গদৃশ্য প্রধানত পাহাড়, উপত্যকা, গাছপালা ইত্যাদি অবলম্বনে আঁকতে হয়। তার মধ্যে গাছগুলিই হচ্ছে সবচেয়ে মজার।

অবিশ্যি, এই ধরণের মাস্টার-পিস্ রচনা করতে দস্তুর মত সময় লাগে। মহতী সভার অধিবেশন আর বৃহৎ পেন্সিল্ ছাড়া এরূপ মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

খতম্ করার আগে আরেকটি কথা বলা আমি আবশ্যক বোধ করি। কখনো যেন সামনে মুখ-করা কোনো মানুষ আঁকতে যাবেন না। ও আঁকাই যায় না।

"আমার লেখা"। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

দি ল্লী তে

পরিমল রায়

দিল্লীতে আছি কেমন? মন্দ কি, আছি ভালোই। স্বাধীন দেশের শীর্ষস্থানে বসিয়া আছে, নয়াদিল্লীর বৃত্তাভ্যাস এখন সহজ হইয়া আসিয়াছে; চক্রে পা পড়িলে চক্রান্ত বাহির করিতে কষ্ট হয় না, অনায়াসেই মুক্ত হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারি। প্রথম যখন আসিয়াছিলাম, বাংলা দেশের কথা ভাবিয়া বড় বিচলিত বোধ করিতাম। ইদানীং সেই দুঃখের সূচীমুখও প্রায় ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে, মনটা অতখানি হাহাকার করে না। তাছাড়া, আত্মীয়-বন্ধু সম্প্রদায়ের সভ্যগণ মাঝে-মাঝেই বঙ্গীয় দিগন্ত হইতে উদয় হইতেছেন,—কেহ বেড়াইতে, কেহ চাকুরির সন্ধানে, কেহ বা যুগ্ম অভিপ্রায়ে।

বহুদিন পর এক-এক জনের সঙ্গে দেখা, কত কথা কতদিন ধরিয়া জমিয়া থাকে, বলিয়া-বলিয়া শুনিয়া-শুনিয়া তাহা আর ফুরায় না। যিনি যখনই আসেন, দিন কয়েক আনন্দ-সাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকি।

কিন্তু—শুনিয়া যেন চমকাইয়া উঠিবেন না—আনন্দটা অমিত হইলেও ঠিক অমিশ্র নয়। ইহারা কেহ আসিতেছেন শুনিলে, সমস্ত মন জুড়িয়া আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে একটা আশঙ্কাও আন্দোলিত হইয়া ওঠে। আশঙ্কার রূপটি নেহাৎ অজানা হইলে হয়তো অতখানি পীড়া বোধ হইত না। কিন্তু এ আশঙ্কা সে-পর্যায়ের নয়, বরং নিতান্তই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং নির্দিষ্ট। ধরুন, চিঠিতে জানা গেল, নববিবাহিতা শ্যালিকা নবলব্ধ স্বামীসহ দিল্লী বেড়াইতে আসিতেছেন। আপনারা বলিবেন, এ তো একেবারে সোনায় সোহাগা। একে প্রিয়জন, তদুপরি শ্যালিকা, দেখা না হওয়া পর্যন্ত ছট্ ফট্ করিবার কথা। আমিও ঠিক তাহাই বলি। কিন্তু উহা বলিতে-বলিতেই আরেক কথা মনে উদয় হইয়া যায়—আবার কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে হইবে! অবশ্যই যাইতে হইবে, কোনো অজুহাত কেহ মানিবে না, শ্যালিকা হাত ধরিয়া টানাটানি করিবে, শ্যালিকাপতি সৌজন্য-বিচ্ছুরিত অনুরোধের ভঙ্গী হানিয়া বলিবেন 'আপনার কাজের ব্যাঘাত না হয় তো চলুন না একবার ঘুরে আসি' গৃহিণী বলিবেন 'আহা, কাজ না হাতী'। সুতরাং

গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হইতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। যিনি সত্যিকারের ধার্মিক তিনি স্বভাবতই পরধর্মে সশ্রদ্ধ। যে ব্যক্তির কোনো ধর্ম নাই, সে-ই সমস্ত ধর্মাশ্রমে মৃগয়া করিয়া ফেরে, অথবা ভণ্ড তপস্বীর বেশে মৃগচর্ম বিছাইয়া বসে।

পরধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা আত্মশ্রদ্ধারই বিকল্প। যে-কোনো বিদ্যা, যে-কোনো শিল্প—পারদর্শিতার ক্ষেত্রে বহু নিষ্ঠা ও সাধনা সাপেক্ষ। সে-সাধনায় একটি গোটা জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। এক জন্মের আয়ু নিঃশেষ করিয়া কতটুকুই বা জানা যায়। জ্ঞানের অসীমতা ও বিদ্যার বৈচিত্র্য হইতেই অধিকার ভেদের প্রশ্ন ওঠে। আমাদের মতো জনসাধারণের এ বোধ নাই। আমাদের সব কিছুতেই অধিকার, আমরা সবাই দেখিয়া ফিরিতেছি।

বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য, আমরা সব কিছুই 'দেখি'। আমরা হিমালয় দেখিতে যাই, হ্যামলেট দেখিতে যাই, আবার, ধরুন, কুস্তিও দেখিতে যাই। অথচ দৃষ্টি ও দর্শনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কুস্তির প্যাঁচ চোখের দেখাতেই সম্পূর্ণ, এবং আমার মতে, ধর্মহীন জনসাধারণের পক্ষে কুস্তি দেখাই প্রকৃষ্টতম চিত্ত-বিনোদন। দিল্লীতে মল্লযুদ্ধের আয়োজন আছে কিনা জানি না। না থাকিলে, পরিবর্তে ইহাদের জন্য পরবর্তী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিড়লা মন্দির। বিড়লা মন্দিরে পাহাড় বানানো হইয়াছে, গুহা তৈরি করা হইয়াছে, নির্ঝরিণী বহানো হইয়াছে; পাথরের হাতি আছে, বাঘ আছে, হনুমান আছে; বাগান আছে, ছবি আছে; অতি সুন্দর দেবমূর্তি, ঝকঝকে শ্বেত পাথরের প্রাঙ্গণ, বিরাট প্রাসাদতুল্য মন্দির—লক্ষ লক্ষ টাকার টঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপানো বৈভবের মূর্ছনা। ইহার পিছনে না আছে ইতিহাস, না কল্পনা, না সৌন্দর্যবোধের বালাই। বিড়লা ভাণ্ডারের একটি হীরকখণ্ড ধনীর রুচিবিকারের ধমকে শতধা বিভক্ত হইয়া হাতি ঘোড়া ও বাঁদরে পরিণত হইয়াছে। বিড়লা মন্দিরে প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের ভিড়, ছুটির দিনে লক্ষ লোকের সমাবেশ।

দিল্লীতে আসিয়া, বিড়লা মন্দির থাকিতে, কুতুবমিনারে যাওয়া কেন? কুতুবমিনারের উচ্চতা লক্ষ্য করিতে ঘাড় বিকল হইবে, সিঁড়ি ভাঙিতে দম আট্‌কাইয়া আসিবে। বরং বিড়লা মন্দির ঘুরিয়া আসুন। দেবদেবী দর্শন হইবে, পাশের কালিবাড়িটাও হইয়া আসিতে পারিবেন, ছেলেপিলেরা হাতির গায়ে হাত দিয়া সুখ পাইবে, বাঘের মুখে পড়িয়াও ভয় পাইবে না, মেয়েরা বহুরকমের কাচের চুড়ি কিনিয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরিতে পারিবেন।

"ইদানীং"। আশ্বিন ১৩৫৬

শো বা র ঘ র

প্রবোধকুমার সান্যাল

শোবার ঘরে বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। আমি পছন্দ করিনে আমার অনুপস্থিতিতে আর কেউ—যার সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ নেই, এমন একজন কেউ আমার ঘরে এসে সময় কাটায়। ঘরে আমার টাকা নেই, সোনা নেই. দামী পোষাক নেই, অথচ এমন কিছু আছে যা একান্ত নিজস্ব। আমার পরিচয়টা আছে সমস্ত ঘরময় ছড়ানো, আর কেউ সেখানে এসে দাঁড়ালে চমকে উঠি, ভয়ে আড়ষ্ট হই, লজ্জায় ঘরখানাকে ঢেকে রাখতে চাই। আমার বহুকালের অসংলগ্ন চিন্তা, উদ্ভট কল্পনা, অসম্ভব স্বপ্ন——সমস্তগুলো শোবার ঘরের সর্বত্র যেন চিত্রিত হয়ে রয়েছে। তাদের সঙ্গতিও নেই, সামঞ্জস্যও নেই। অসতর্ক মুহূর্তে বাইরের মানুষ হঠাৎ ঢুকে যদি তাদের দেখতে পায়?

টেবলটা অবশ্য বড়, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত একটা পিঁপড়ে হেঁটে যেতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগে। কতকগুলো অনাবশ্যক চিঠিপত্র—সেগুলোর মধ্যে কাজের কথা কম আছে, অথচ অনর্থক উত্তর চায় পদে পদে। খানকয়েক মাত্র বই,—শ' দুইয়ের বেশি নয়—সেগুলো ঘরময় এখানে ওখানে ছড়ানো। একখানা ভাল বই পড়তে আমার এক মাস লাগে। আলমারির মাথায় আমার এক শিল্পী বন্ধুর উপহার দেওয়া একখানা স্ত্রীলোকের ছবি। ডুরে-শাড়ি-পরা, বোকা বোকা চোখে চাওয়া একটি মেয়ে; মাথায় অল্প ঘোমটা, হাতে একগাছা চুড়ি,—মুখের উপরে হৃদয়-বৃত্তির কোনো ছাপ নেই, বরং নাকের গোড়ায় আর চিবুকে যেন একটি অস্পষ্ট অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে—কিন্তু বসবার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা শান্তশ্রী। আর একটি জলাভূমির চিত্র। বন্যায় চারিদিক ভেসে গেছে, একটি ছোট কুটির আত্মরক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জল, আকাশ, মাঠ সব একাকার। জনমানব নেই। ভরা বর্ষার এমন একটি স্বপ্ন চিত্রে রূপান্তরিত। পনেরো বছর আগে এক বাল্যবন্ধুর কাছে উপহার পাওয়া, —যে বাল্যবন্ধুটির সঙ্গে আমার কোনোদিন মতের আর পথের মিল হয়নি। মিল হয়নি বটে, কিন্তু মনোমালিন্যও হয়নি। দুজনে দুজনকে দেখলে

নিতান্তই অবধারিত, আবার কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে উনিশবার দেখা হইয়া গিয়াছে, এইবার কুড়ি পূর্ণ হইবে।

কুতুবমিনার দেখিতে আমার এত আপত্তি কেন? সে কথা বুঝাইয়া বলিতে হয়। আমি যে অতিথি-বিরূপ নই তাহা আগেই বলিয়াছি। তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে আমার কার্পণ্য নাই, বরং উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু ইহা সত্বেও কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে আমার ঘোরতম আপত্তি আছে। অনেকে অনুরোধ জানাইয়া বলেন, চলুন না, একটু হৈ হৈ করিয়া আসা যাইবে। এই হৈ-হৈটা প্রথমত আমার স্বভাববিরুদ্ধ, হৈ হৈ ওয়ালাদের সঙ্গে আমার মনের মিলই নাই। ঘরে বসিয়া আড্ডা হোক, প্রচুর চায়ের সহিত প্রচুরতর ধূমের সমারোহ হোক, আমি উদ্যোগী হইয়া অগ্রসর হইব; সাহিত্যচর্চা, পরচর্চা কিংবা অর্থনীতির আলোচনা হোক, আমি অগ্রণী হইয়া আসন গ্রহণ করিব। কিন্তু কুতুবমিনারে আমি যাইতে রাজি নই। প্রধান কথা, আমার স্থাপত্য কিংবা ইতিহাসজ্ঞান অতি পরিমিত ও অস্পষ্ট, এবং আমি মনে করি, অনৈতিহাসিক ও অশিক্ষিত চোখে, কুতুবমিনার একবার দেখা-ই যথেষ্ট। শ্যালিকা এবং শ্যালিকাপতি হয়তো এই একবারই দেখিবেন। কিন্তু আমাকে এই লইয়া কুড়িবার দেখিতে হইবে, আমার বিশেষ আপত্তি এখানেই। যে জিনিস চোখে দেখিবার বেশি দেখি না, তাহার বারম্বার বিড়ম্বনা। আপনি যদি চোখের বেশি দেখাইতে পারেন, আপনার সহিত যাইতে রাজি আছি। কিন্তু আপনি যদি অন্ধ হন, আমার মতো আরেকটি অন্ধের তাহাতে উৎসাহ কী হইতে পারে? আপনি দেখিয়া বলিবেন, বা-ব্বাঃ কী উঁচু, আমিও বলিব, সত্যি, কী উঁচু। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। একটি উঁচু পদার্থ একবার দেখিবার হয়তো বা অর্থ আছে। বার বার নিরর্থক। অনেকে অবশ্য দেখার বেশিও অগ্রসর হন, অর্থাৎ, উহার মাথায় চড়িয়া নাম খোদাই করিয়া আসেন। তারপর বাড়িতে ফিরিয়া ফুস্‌ফুসের কম্পিটিশনে কে কতদূর উঠিয়াছিলেন তাহা লইয়া মহা কলরব। কুতুবমিনার অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য তৈরী হয় নাই। কিন্তু উপায় কী? যে বন্দুক ছুঁড়িতে জানে না, সে বন্দুক দিয়া লাঠি খেলে।

আপনি হয়তো মনে মনে হাসিতেছেন। জিনিসটি ঘরের কাছে হইলে আমার আপত্তি ছিল না, শহর হইতে অত দূরে বলিয়াই যত আপত্তি। দূরত্বটা অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়। যাতায়াতে কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথ ধূলি-ধূসরিত হওয়া শরীরের পক্ষে বিজাতীয় বিভূতিভূষণ। কিন্তু, বিশ্বাস

করুন, আমার সত্যিকারের আপত্তি সেখানে নয়। আমাকে সেলুন-কারে বসাইয়া লইয়া গেলেও আমি উৎসাহিত হইব না। আনুষঙ্গিক ক্লান্তিটার লাঘব হইবে মাত্র।

কথাটা তাহা হইলে একটু পরিষ্কার করিয়াই বলি। কোনো জিনিস 'দেখা'-টাই চরম নয়। 'দেখা'-র পিছনে বুঝিবারও একটি প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ আছে। যদি কেবল দেখিলেন-ই তবে একবার দেখিলেই দেখা শেষ। যদি বুঝিবার পর্যায়ে নামিতে পারেন, তবে প্রতিবারের দেখা নূতন করিয়া হইতে পারে। যাহা বুঝি না তাহা দেখিবার সার্থকতা যৎসামান্য, এবং সে-বিবেচনায় না দেখিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি কোনোদিন আর্ট একজিবিশন দেখিতে যাই না। কারণ আমার চিত্রবোধ নাই। কেবলমাত্র চোখের দৃষ্টিতে যাহা গ্রহণ করিতে পারিব, তাহা তো আর গ্রাহ্য নয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের পাঁচটি ভৃত্য বটে, কিন্তু সেই পঞ্চভৃত্যের নিপুণ পরিচর্যা শিক্ষা-সাপেক্ষ। ছবি দেখিলেই ছবি দেখা হয় না।

অথচ কী আশ্চর্য, চিত্র প্রদর্শনীতে চিরকালই অগণিত নরনারীর ভিড়। অনায়াসেই আশঙ্কা করা যায়, কয়েকটি বিদগ্ধজন ব্যতীত, ইহাদের অধিকাংশ চিত্রবোধ শূন্য। একটি দল অবশ্যই সেই হৈ হৈ সম্প্রদায়ের সভ্য, তাঁহারা রবিবারটা সকলে মিলিয়া একটু হৈ হৈ করিতে আসিয়াছেন। কোনো ছবিতে শারীর মাত্রায়ন অতি 'উদ্ভট', ইঁহারা হাসিয়া অস্থির; কোনোটিতে মনুষ্যমূর্তিটি অবিকল দুলালের পিশেমহাশয়ের মতো,—হাসি আরো উচ্ছ্বসিত। অপর একদল আছেন, তাঁহারা 'কালচার'-তাড়িত হইয়া ছুটিয়াছেন। একটি ছবির সম্মুখে ইঁহাদের একজন স্থির দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। মাঝে-মাঝে এপাশে ওপাশে দাঁড়াইয়া নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ছবিটি দেখিতেছেন। একবার হয়তো ঘাড় উঁচাইয়া উবু হইয়া বসিয়াই পড়িলেন। মুখে চোখে সর্বক্ষণ একটি মিশ্র অভিব্যক্তি, তাহাতে আনন্দ আছে, চিন্তা আছে, আবার প্রশ্নও আছে। আসলে অবশ্য কিছুই নাই, মনে-মনে ভাবিতেছেন, যথেষ্টক্ষণ যথাযোগ্য ভঙ্গিতে দেখা হইল তো? প্রদর্শনীর এখানে ওখানে দু' একটি যুবজনের দৃষ্টি ঈষৎ চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চল হইলেও খুব সুদূরের পিয়াসী নয়, কারণ কলহাস্য-মুখরিত তরুণীর দলটি অদূরেই।

এই সকল চিত্রামোদীদের কী নামে অভিহিত করা যায়? বলা যায়, একদল ধর্মহীন, অপর দল ভণ্ড। ভণ্ডামি জিনিসটিও আসলে অধর্মের নামান্তর। সুতরাং ইহারা সকলে এক ধর্মহীন সমাজ, এবং এই ধর্মহীন

যেন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠতাম। গলাগলি এবং গালাগালি কিছুতেই ত্রুটি নেই। গোপনে ধূমপান করা, বিনা টিকিটে স্টীমারে চড়া, ইস্কুল পালিয়ে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া, সাইকেলে গড়ের মাঠে খেলা দেখতে ছোটা,—এমন সঙ্গী আর আমার দ্বিতীয় ছিল না। পথে পথে দুজনে বিবাদ করেছি, প্রহার বিনিময় হয়ে গেছে, কিন্তু দু-দিন দেখা না হ'লে দুজনেই উদ্বিগ্ন হতুম।

দেয়ালে দুখানা ক্যালেণ্ডার, আমেরিকান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবি, একটি আমার ফটো, ব্রাকেটে একটি টাইমপিস ঘড়ি। তেলের শিশি, বোরিক তুলো, ব্রাউনী ক্যামেরা, কালির দোয়াত, পেপার-ওয়েট, টেবল-ল্যাম্প। ভাঙা এসরাজটা আজো আমার ঘর ছাড়েনি, তার ছেঁড়া তারে আর সুর ওঠে না। আলমারির মাথায় যত রাজ্যের অকেজো জিনিস। একতাল দড়ি,—গলায় দেবার দড়ির চেয়ে সরু; খালি ওষুধের কয়েকটা শিশি, একটা ছোট মেরিনার্স কম্‌পাস, একগাছা রুল, পুরানো একখানা নোট বই, ক্যারমের কয়েকটা ঘুঁটি, মলাট-ছেঁড়া একখানা এডগার ওয়ালেসের বাজে গল্পের বই। তিনটে চামড়ার ব্যাগ আমার শোবার ঘরে। যতই কেননা গৃহস্থের শান্ত জীবন যাপন করি, এই চামড়ার ব্যাগ তিনটে আমাকে বারম্বার স্মরণ করিয়ে দেয়,—তুমি ঘরের নয়, বাহিরের। কেন এসেছ জনতায়? কেন লোকালয়ে? তিনটে চামড়ার ব্যাগ! কিন্তু ইতিহাস অনেক। শিমলা পাহাড়ের সেই লক্ষ্মীনিবাসের ছোট ঘর, রাওয়ালপিণ্ডির পাঞ্জাবী হোটেল, দ্বারকানাথের ধর্মশালা, মাদ্রাজের পরমানন্দ ছত্রম্, দার্জিলিঙের জলাপাহাড়ের মাটি, শিলঙের হিন্দু হোটেল —সব জায়গায় দাগ, সব ধর্মশালার ধুলো, সকল ভ্রমণ কাহিনীর একটা চর্ম-তালিকা।

চারটে ফাউণ্টেন পেন্। 'ঝরণা-কলম' আমি এদের বলতে পারবো না। নামটার মধ্যে একটা অর্থ পাই, কিন্তু রস পাইনে। কোথায় কোন্ দূর অরণ্যময় পর্বত, গোপন-চারিণী ঝরণা, আর কোথায় মণিহারি দোকান থেকে কেনা একটা কলম—দুটো শব্দের কেমন একটা অসঙ্গত গোঁজামিল আমি পছন্দ করিনে। মুনির তপোবনে একটা যেন সদ্য আবিষ্কৃত রিভলভার। মনে করেছিলুম কবিঠাকুরের কাছে একখানা প্রতিবাদপত্র পাঠাবো, তার নকলও রয়েছে আমার টেবলে প্যাডের তলায়,—কিন্তু পাঠাতে সাহস করিনি। চারটে ফাউণ্টেন পেন্ আমার। এক একটা কলমের খোঁচায় কত মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়,—কেউ মরে, কেউ পালায়, কেউ

হয় প্রণয়াসক্ত, কেউ দেয় বক্তৃতা। কলমের কালি যখন ফুরোয় তখন লিখি চোখের জলে, লিখি বুকের রক্তে। আমার ঘরে এসে কেউ আমার কলম ছোঁয়, আমি পছন্দ করিনে,—কলম একান্ত আমার, তাদের ভাষা আছে, সম্ভ্রম আছে, শুচিতা আর আভিজাত্য আছে।

আমার শোবার ঘর বালিগঞ্জী বড়লোকের নকল নয়। চীনেবাজারের রংচঙে পরদা দিয়ে আমি ঘরের দারিদ্র্য গোপন করিনে। বন্ধুদের সাজানো ঘরে উঁকি দিয়ে এসে আমি সুলভ আভিজাত্যের ঢঙে ঘর সাজাইনে; আমার ঘরের দারিদ্র্যই আমার অহঙ্কার। নকল পোষাক পরা যাত্রার রাজা সাজার চেয়ে আসল মানুষটার অনেক দাম। আমার ঘরে জঞ্জাল আছে, কিন্তু নোংরা নেই। ছেঁড়া কাগজ, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, পুরনো মাসিকপত্র, নিমন্ত্রণের চিঠি, সিগারেটের কুচি, কাটা প্রুফের কাগজ, প্যাকেট খোলা মলাট, দাড়া-ভাঙ্গা চিরুণী, খালি এসেন্সের শিশি, বাসি ফুল—এগুলো অবশ্য নোংরা নয়। একরাশ দড়ি, দুখানা বড় ছুরি, দুটো নরুণ, তিনখানা কাঁচি, চারটে লাঠি—অর্থাৎ এই সব সজ্জা আমার ভালো লাগে। ঘরে অস্ত্রশস্ত্র থাকলে আমি খুশি থাকি। অস্ত্রের উপর আমার লোভ। বড় লাঠিটা এনেছিলুম হিমালয় থেকে, চেরীর লাঠিটা পেয়েছিলুম দার্জিলিঙে, তেড়া-বাঁকা লাঠিটা শিমলা পাহাড়ের,—আর চতুর্থটা পাটনার দাদুর দেওয়া। একখানা বড় তলোয়ার ছিল—পুলিসের ভয়ে সেখানা নষ্ট করেছি। মনে করেছিলুম বাংলা দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকরা যেদিন কলেজ স্ট্রীট আর কর্নওয়ালিসের রাস্তায় অন্নের অভাবে রক্তাক্ত বিপ্লবে মেতে উঠবে. আমি আমার তরবারি নিয়ে তাদের সেই ধর্মযুদ্ধে যোগদান করবো। কিন্তু সেটা বুঝি আর সম্ভব হলো না। তারা কো-এডুকেশনের নেশায় ডুবে রইলো। তাদের রক্তে নুনের চেয়ে চিনির ভাগ বেড়ে গেছে। ছাত্র ও যুবকদের জন্য আমি একটা আবেদনের খসড়া করেছিলুম, হয়ত সেটা আজো আছে আমার ঘরের জঞ্জালের মধ্যে,—সেখানা আগুনের অক্ষরে লেখা; গান্ধীজীর অহিংসাবাদের অপেক্ষাও উত্তেজক।

কুটি কুটি টুকরো লেখা আমার শোবার ঘরে ছড়ানো; ভয় করে পাছে সেই টুকরোগুলো কারো চোখে পড়ে। কয়েকটা টুকরো খুঁজে পাওয়া গেল।

‘অন্যায় করার অধিকার সকলের নেই, যারা করে তারা পৃথিবীতে বড় হ'য়ে জন্মায়।’

'বাংলা দেশ অরাজক তার কারণ আমাকে আজো ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়নি।'

'যে দেশে সতী নারীর সংখ্যা বেশি, সেই দেশেই কেবল মেয়ে চুরি হয়।'

'পাগল বললে, তুমি পুতুল, সৃষ্টিকর্তা নাচিয়ে বেড়ায় তোমাদের সকলকে।'

'সাহিত্যের নীতি নিয়ে রামদাস মোদক মাথা ঘামিয়ে ম'রে গেল, তার বাড়ি ছিল বটতলায়।' 'কেন তুমি এমন ক'রে চ'লে গেলে? কেন মরলে না চার বছর আগে—যখন সত্যিই তোমার মৃত্যু কামনা করেছিলুম? যেদিন তোমাকে বাঁচাতে চাইলুম সেইদিন দিলে ফাঁকি?'

এমন অনেক কাগজের টুকরো। এর পরে দেখা গেল, উই পোকার বাসা আমার ঘরময়। দুটো টিকটিকি দেখা দেয় রাত্রের ঘরের আলোয়, তারা পোষমানা নয়, কিন্তু পরিচিত। আসে আরসোলার লোভে। আবার দেখি, শরৎকালের নীল শূন্য পথ থেকে ছট্‌কে আসে এক একটা বোল্‌তা, —কামড়ায় না, কেবল ছুঁয়ে যায়। জানলা দিয়ে রোদ আসে, সেই আলোয় রঙিন সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল দেখতে পাই, টেবলের কোণা থেকে জানলার গরাদ পর্যন্ত অদৃশ্য মায়াজাল সেতুর মতো রচনা করেছে।

মানুষের জীবন এমনি। কোথা থেকে কোথায় যে কার সঙ্গে মায়া-জাল রচনা করেছি, হয়ত নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারিনে। জাল অতি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। সেই জাল যখন মহাকালের হাতে ছিন্ন হয়, তখন জানি, বেদনার গভীরতা। মরণ যেদিন আসে সেই দিন বেশি ক'রে বাঁচতে চাই। রণ-দামামায় উত্তেজিত হয়ে সৈন্য ছুটে যায় যুদ্ধে, মারতে আর মরতে,—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—কিন্তু আহত হয়ে কাঁদে, বলে, জল দাও, সেবা করো, বাঁচাও।

শোবার ঘরে তিনখানা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে অনেক সময়ে ভেবেছি, কেন বাঁচবো? কোন্ অধিকারে? জীবনকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করলুম কই? সর্বসংস্কার-মুক্ত কি হওয়া যায় না? ঘরের মধ্যে জঞ্জাল মাড়িয়ে পায়চারি করলাম তেরো বৎসর ধরে। হিসেব ক'রে দেখো, শত শত মাইল পথ জট পাকিয়ে মৃত অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। আমার অতীত। আমার অভিশপ্ত নিরানন্দ অতীত। পা বাড়াবো কোন্ দিকে? অতীত আমার পথরোধ করে। ওদের মুকুরে দেখি আমার প্রতিফলিত রূপ। দেখে ভয় পাই। আমার হাতে শাসনভার থাকলে নিজেকে গুলি করে মারতুম।

কিন্তু চমৎকার আমার শোবার ঘর। যেন বিংশ শতাব্দীর চিতাশয্যা।

আমার নিঃশ্বাস লেগে লেগে দেয়ালে নোনা ধরেছে, আমার নখের আঁচড়ে কড়িকাঠগুলো ক্ষয় হয়েছে, উইপোকার জটিল পথ আমার চিন্তার সাক্ষী।

আশ্চর্য, হঠাৎ সেদিন দিল্লী থেকে ফিরে দেখি, আমার ঘরখানা ছোট হয়ে গেছে। দরজায় মাথা গলে না, জানালাগুলো ক্ষুদ্র। আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর এত ছোট? তবে কি বাইরে গিয়ে বড় হয়ে এলুম? আর কিছু চিনতে পারিনে, সব যেন নতুন লাগে। বিদেশীযেন হঠাৎ এসে পড়েছি, কিছুই আমার বলে মনে হয় না। কেন? কেন এই মনোবিকার? তবে কি হৃদয়বৃত্তি আমার কিছু নেই? যাকে ফেলে যাই তাকে ভুলে যাই?

আবার ঘর বড় হয়, আমি ছোট হই। দেখি বইগুলো ঠিক আছে, মোটা মোটা গ্রন্থাবলী। যে-বইখানা সকলের চেয়ে বড়, সকলের অপেক্ষা বিরাট, সেই বইখানাই অগোছালো। আমার এই সুন্দর শোবার ঘরে আমি নিজে সেই অসমাপ্ত বিরাট গ্রন্থ।

"মনে মনে"। বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, ১৩৪৮

ভ্র ম ণ কা হি নী র ভূ মি কা

অজিত দত্ত

এইমাত্র ঘুরে এলাম টোকিও, কিয়োটো, য়োকোহামা শহর। তারপর ভোল্গা নদী পাড়ি দিয়ে, মস্কো-লেনিনগ্রাড্-এর উপর দিয়ে ইস্তাম্বুল শহর ঘুরে বোগদাদ-বোখারা-সমরকন্দ দেখে, মোম্বাসার বন্দর পেরিয়ে একেবারে রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায়। দেখলাম মিশর, মিসিসিপি, মিনেসোটা; আলপ্স্ পাহাড় পেরিয়ে গেলাম লিস্বন, পেরুলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমনি আমার ভ্রমণের নেশা। যাকে বলে মহা-ভবঘুরেত্বর পথে। কিন্তু কেউ যদি আজ, কিংবা যে-কোনোদিন সন্ধ্যায়, কিংবা যে কোনো সময়ে, আমাকে এসে বলে 'চলো সিনেমা দেখে আসি', তাহলে আমি কেবল পাশ ফিরে শোবো।

তার কারণ, ঘুরে বেড়াতেই আমার ভালো লাগে, আর নিশ্চিন্ত আরামে হাত পা ছড়িয়ে না শুলে আমার ঘোরাই হয় না। ভ্রমণকাহিনী লিখতে না হওয়ার এ একটা মস্ত সুবিধা, এবং এ-সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারই আমি ক'রে থাকি।

ভ্রমণকাহিনী জিনিসটা অবশ্য খুব ভালোই, এবং শুনেছি যথোপযুক্ত কল্পনাশক্তি খাটাতে পারলে নাকি কাটেও খুব। কিন্তু তার ভূমিকা বড়ই ভয়াবহ। মনে করুন, কোনো এক বিখ্যাত লেখকের কাছে, কোনো এক বিখ্যাত প্রকাশকের কাছ থেকে একখানি ভ্রমণকাহিনী লেখবার ফরমায়েশ এসেছে। সামনেই বড়দিনের ছুটি। বিখ্যাত লেখক স্থির করলেন, কলকাতার বাইরে যাবেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, বন্ধু-বান্ধবদের স্ত্রীদের কাছে, আত্মীয় ও আত্মীয়াদের কাছে এবং অনাত্মীয় ও অর্ধপরিচিতদের কাছে সগর্বে এবং সস্মিত মুখে বলে বেড়ালেন,—'কদিনের জন্য বাইরে যাবো ভাবছি'। উদ্দেশ্য সকলকে যথাসম্ভব ঈর্ষান্বিত করা। কিন্তু সকালে বন্ধু-বান্ধবরা যখনো এসে পৌঁছোয় না এবং রাত্রে বন্ধু-বান্ধবরা যখন চলে যায়, তখন বাড়িতে বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসেন যাকে বলে 'ভয়াবহ ভবিষ্যৎ'-এর চিন্তায় শঙ্কাকুল। ট্রেনে ছোটো মেয়েটার দুধ গরম করার কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এবং চারটে বাক্স, তিনটে বিছানা, দুটো ধামা, একটা কুঁজো এবং ন'খানা আনুষঙ্গিক খুচরো মোট নিয়ে কি উপায়ে আসানসোলে গাড়ি বদল করা যেতে পারে, এ সব চিন্তা

পরলোকের চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। তার উপর বিদেশের বিজাতীয় হালচাল এবং বিখ্যাত লেখকের অসাধারণ হিন্দি জ্ঞানের সমন্বয়ে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রোমাঞ্চিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। আমরা যথারীতি রোমাঞ্চিত হয়ে বলি 'সত্যি তুমি কী ভাগ্যবান, কত ঘুরচো!' যেন ইঞ্জিনের চাকা হওয়াতেই মানব জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা।

আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে যারা কেবলি ঘোরে তাদের ঘোরা হয় না, যারা ক্রমাগতই বেড়িয়ে বেড়ায়—বেড়ানোর প্রকৃত মর্ম তারা জানেনি। বড় বড় ট্রেন ভ্রমণ করা যাদের অভ্যাস, ড্রয়িং রুমের প্রতি আকর্ষণ তাদের অসাধারণ। দু' পাশের জলে-ডোবা ধানের ক্ষেতের একটু দূরে ব্যাঁকা-চোরা ডোবাটায়, পানার আল্পনা আঁকা টলটলে জলের এক পাশটিতে যে দুধবরণ বকটা এক ঠ্যাং তুলে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে, খোঁজ নিয়ে জানবেন, ওটা তাদের চোখেই পড়েনি; আবার শীতে, শুকনো মাঠে কাটাধানের হলুদে আঁটির সারি—আর ভূতের কালো মাথার মতো হাঁড়ি-বাঁধা এবড়ো-থেবড়ো খেজুর গাছ, একটা এখানে একটা সেখানে—মোটেই 'ছবির মতো সাজানো' নয়, বরং ছবি আঁকবার মতো—সেই দেখাটি তাদের মনে হারিয়ে গেছে। আমি অনেক কষ্টে বছরে এক খানা করে' ছবি দেখে আসি, তাই সে-ছবি আমার মনে সোনার ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে থাকে, তাতে মরচে ধরে না। আমার দৌড় এই গ্রীষ্মে গিরিডি, আবার ও-ই শীতে শান্তিনিকেতন; ক্বচিৎ কোনোবার বা বিক্রমপুরের জোলো জোলো দেশ—যা মনের প্রাগৈতিহাসিক মেছো জীবটিকে ডানা ধরে' নাড়া দিয়ে যায়। অনেকটা টিকি ধরে' টানার মতো। কষ্ট হয়—খুবই কষ্ট হয়, এবং বাড়ি ফিরে কাগজে-কলমে এত চেঁচাই যে অনেকগুলো লেখা চটপট তৈরি হয়ে যায়। এ-ও এক সাধনা ছাড়া অর কি! জাপানীরা চা খেতে যে সাধনা করে এ সে রকম সাধনা নয়, বরং রোদ্দুরে ঘেমে সতেরোজন বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার মতো।

বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে কুড়ে বলে' আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে। তা করুক। অন্যকে গাল দেওয়া মানেই তুলনায় নিজেকে খানিকটা বড় করা কিনা! যেন কুড়ে হতে সকলেই পারে। বাইরের প্রকৃতি, এমন কি দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি—চোখ মেলে তাকালে যা কিছু চোখে পড়ে—তার সঙ্গে অন্তরের একটা অবিচ্ছেদ্য অনির্বচনীয় মিল না থাকলে কেউ কোনো-

দিন সত্যিকারের আলসেমি করতে পেরেছে? সুরের সঙ্গে সুর যেমন করে' মিশে যায়, তেমনি ভাবে বাইরের সঙ্গে মনের মিল না হ'লে কি আর আলস্য-যাপন করা যায়? তাই আপিস থেকে ফিরে আমি হাত পা ছড়িয়ে শুই, তারপর চোখ ছেড়ে দি আকাশে, মেঘে, অথবা দুটো পাখি—নিদেন ঘরের দেয়ালে টিকটিকিগুলোর দিকে। তখন—এবং তখনই আমি হয়ে যাই পৃথিবীর অংশ, লুসির মতো—

Rolled round the Earth's Diarnal course
With rocks and stones and trees.

তাছাড়া, ভ্রমণ যে আমি একেবারেই করি না তাতো নয়। এই যে রোজ ট্রামগাড়ি চড়ে চার মাইল রাস্তা পেরিয়ে আপিসে যাই, আবার চার মাইল অতিক্রম করে' বাড়ি ফিরি—এর ভিতরে যদি ভ্রমণের আনন্দ না থাকে, তবে আটশো মাইল ক্রমাগত রেলগাড়ি চড়ে' বেড়ানোও নিরর্থক। যে দেখতে জানে সে-ই দ্যাখে; হগ মার্কেটে যে-ফুলওয়ালা লাখো ফুলের মধ্যে বসে ফুলের নাম ধাম এবং দাম মুখস্থ রাখে, সেই কি আমার চেয়ে ফুলের মর্ম বেশি বোঝে? ট্রামগাড়িতে বসে আমি তো একই রাস্তায় দু' হাজার বার গেছি আর এসেছি, এসেছি আর গেছি, তবু আমার দেখা কিন্তু ফুরোয় নি। এই যে বড় পার্কের পাশের স্টপ-এ মোটা মোটা কেতাব হাতে আটোসাঁটো মেয়েটি জোরে জোরে পা ফেলে ট্রামে উঠেই কোনো দিকে না তাকিয়ে মহিলা-মার্কা সীট্‌টা দখল করে সব চেয়ে মোটা বইটা খুলে বসল—যেন হেড মিস্‌ট্রেস্‌ ক্লাস্‌ রুমে ঢুকলেন—এ-ও যেমন দেখবার মতো, আবার কালিঘাটে নাদুস-নুদুস বাবুটি যে অন্যকে বসতে দেবার জন্য সীট থেকে রোমশ পা-টা নামাতে হল বলে মদনভস্মের পুনরভিনয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়। কোনোদিন বা ওই 'লেডিজ' মার্কা সীটটাতেই দেখি এলো করে খোঁপা বাঁধা কলেজী তরুণী, আবার কোনোদিন বা চাকুরি-গর্বিতা দো-আঁশলা মেম-সাহেব। আবার কোনোদিন ঘুমন্ত ছেলে-কোলে নতুন মায়ের অবসন্ন ভঙ্গীটিও বেশ। যা-ই দেখি, দেখতে ভালোই লাগে। তারপর শহর ছেড়ে ট্রাম যখন চৌরঙ্গির মেঠো পথে পাড়ি দেয়, তখন তো আর ছবির শেষ নেই। কোনো চিত্রকর যদি ওই মাঠের কোনো এক কোণে কুটির বেঁধে থাকত, ওই মাঠের নানান্‌ কোন থেকে, মাঠ-বিহারী নানান্‌ লোককে নিয়ে সে হয়তো পঞ্চাশখানা ছবিই এঁকে ফেলত। তা' দেখে কেউ বলত না, 'ছোঃ, ওই তো এক মাঠের ছবি, এ আর দেখব কি!'

ক্যামেরা নিয়ে ফোটোগ্রাফার ওই মাঠের থেকে হাজারো ছবির টুকরো কুড়িয়ে আনতে পারে, কেননা ওই মাঠের যে রূপ সে তো ক্ষণে বদলায় মানুষের পদক্ষেপে। আমি হেঁটে গেলে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে আমাকে শুদ্ধ যে-ছবিটা চোখে পড়বে, একটু পরেই হাসতে হাসতে তিনটি মেয়ে যখন ঐ পথ ধরেই যাবে, তখন আর একটা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেই দেখতে পাবেন বিলকুল আলাদা ছবি, যেন আরেক দেশ।

ভাবতে গেলে জীবনে কতটুকুই দেখলাম। এত বড় পৃথিবী, অথচ আমার কেন্দ্র ছেড়ে হাজার মাইল যদি গিয়েছি তো ঢের। কিন্তু আরো ভাবতে গেলে কী-ই বা দেখিনি! এই গাছ পাতা আর আকাশ; এই আকাশের নীল রঙ যা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে একদিন ধূসর হয়ে যায়, তারপর হঠাৎ এক আশ্বিনে তাকিয়ে দেখি রাতারাতি আকাশে কে নীল রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, 'কঙ্কাবতী'র ভূতিনী মাসীর মতো; এই পাখি আর অলস-মধ্যাহ্নে পাখির ডাক; এই নদী আর সমুদ্র;—কী-ই বা দেখিনি! পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে কী আছে অপূর্ব সে-ঐশ্বর্য যা আমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবে—যার মোহে আমি আমার এই সামনের পৃথিবীকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারি? সেখানে কি নেই এ চাঁদ, আর সূর্য, আর তারা? কূপমণ্ডুক আমি, স্বীকার করি। কিন্তু এ কূপের জল আমার আজও পান করা শেষ হয়নি; আমার ছোটো পৃথিবীর ঐশ্বর্যই আমার আজো উপভোগ করা শেষ হল না—এর চেয়ে বেশি হলে কি আর থই পাব?

এই রকম সঙ্কীর্ণ হচ্ছে আমার মনোভাব। সে-ই কবে ছেলেবেলায় কাকে ভালো লেগেছিল, বছর কুড়ি ধরে তাই নিয়েই কবিতা লেখা চলেছে। এখনো পর্যন্ত বন্ধুরা এ অভিযোগ করেন নি যে, নানা জাতের নানা ধাঁচের নানা মেজাজের দুশো পঞ্চাশটা মেয়ে না দেখে এতগুলো প্রেমের কবিতা লেখা উচিত হয়নি। যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন এবং যাঁদের উপন্যাসে নারী-চরিত্রের কথা সর্বজনবিদিত, দাম্পত্য জীবনে তাঁরা একাগ্র নন এমন কথা কেউ বলে না। তবে আমি যদি আমার রাসবিহারী এভিনিউ-এর তিনতলায় বসেই ভ্রমণকাহিনী লিখি তাতেই বা এমন কী দোষ! বাংলাদেশের পাঠকেরা আসলে ভ্রমণকাহিনী নামে উপন্যাসই চান।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভ্রমণকাহিনী লিখবার জন্য কোনো প্রকাশকই আজ পর্যন্ত আমাকে ফরমায়েশ করেন নি। বিখ্যাত লেখক না হওয়ার ঐটেই ক্ষতিপূরণ।

"জনান্তিকে"। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬

খাকি

বুদ্ধদেব বসু

ড্রাইভারের দিকে পিঠ-দেয়া লম্বা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসলো ওরা পাঁচজন। সঙ্গে সঙ্গে বেলেল্লা হল্লায় আট নম্বর বাস্ মুখর হ'য়ে উঠলো। সকলেই অমিশ্র বঙ্গীয়, ঘোর তাম্রবর্ণ, যুবা। কারো গোঁফ উঠেছে, কারো ওঠেনি। কিন্তু মুখে তারুণ্যের স্নিগ্ধতা নেই, অত্যন্ত বেয়াড়া-রকমের চোয়াড়ে চেহারা. দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। একদা এরা ছিলো কলকাতার স্ট্রীট-বয়, রাজপথের টৌড়-কাটা বিড়ি-ফোঁকা স্বারাজ্যে এদের আস্তানা ছিলো। আজ যুদ্ধের দৌলতে খাকি প্যাণ্ট পরে' পদস্থ হয়েছে। আজ এদের মুখে বিড়ির বদলে সিগারেট, কর্কশ বুলির বদলে ইংরেজি বুকুনি। আহা, কী ইংরিজি! মাতৃভাষাপ্রেমিক কোনো ইংরেজ যদি শুনতেন তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন যে বড়ো হাতের E-ওলা 'দি এম্পায়ার'-এর জন্য বড্ড চড়া দাম দিতে হচ্ছে। ইংরেজি ভাষাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই মৃতদেহটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কাটছে কারা? তারা মার্ক টোয়েন বর্ণিত ইটালিয়ানরা নয়, তারা কলকাতার রাস্তার ছোঁড়ারা, যারা আজ জনরক্ষার ভার পেয়ে খাকি পাৎলুন পরেছে।

হী হী ক'রে হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছে, গাল টিপে দিচ্ছে, একই সিগারেট এক মুখ থেকে পাঁচমুখে ঘোরাঘুরি করছে। অথচ এরা পাগল কিংবা মাতাল নয়। এরা স্বভাব বর্বর মাত্র। কোনোদিন লেখাপড়া শেখেনি, ভদ্রসমাজে মেশেনি, কোনো সৌকুমার্যের চর্চা করেনি। সব দেশের বড়ো শহরেই এ-রকম একটা শ্রেণী থাকে। আমাদের দেশে এরা নতুন, কেন না যন্ত্র যুগের নাগরিক সভ্যতা আমাদের দেশে নতুন। আমাদের দেশের গেঁয়ো অভাজন যারা, তারা আলাদা জাতের। তাদের অজ্ঞ মনে হয়, মূর্খ মনে হয়, বর্বর মনে হয় না। মানুষিক কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত নয় তারা। কিন্তু কলকাতার, ঢাকার, লক্ষ্ণৌর রাস্তার ছোঁড়াদের কুখ্যাতি কে না শুনেছেন? তাদের দুর্মানুষিকতায় কে না মর্মাহত হয়েছেন? তবু মনে হয় এরা যখন ধুতি কি পাজামা কি লুঙ্গি প'রে বেড়ায়, তখন পরিধানের নম্রতাই তাদের চরিত্রকে ঈষৎ যেন মার্জিত করে।

আমরা বহুদিন পরাধীন আছি ব'লেই হোক, বা স্বভাবতই নম্র ব'লে হোক, আমাদের পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে যে-ভাবটি সবচেয়ে পরিস্ফুট তাকে বিরূপ সমালোচক বলবেন দাস্যভাব, অনুকম্পায়ী বন্ধু বলবেন শান্তভাব। আমরা যেখানে একই চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে ব'সে থাকবো, সেখানে একজন ইংরেজ তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তির তাড়নায় কখনো এ-পাশে বেঁকবেন, কখনো ও-পাশে হেলবেন, কখনো পাদুটোকে লম্বা ক'রে চালিয়ে দেবেন মেঝেতে, আবার কখনো গুটিয়ে নেবেন হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে। কথা বলতে-বলতে সুখ দুঃখ বিস্ময় সংশয় ইত্যাদির ছায়া ইংরেজের মুখে সিনেমার অভিনেতার মতোই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে; আমাদের মুখে ব্যঞ্জনা কম, চীনেদের মুখে আরো কম। আমাদের কাছে পাশ্চাত্ত্য অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য চোখে আমাদের ঠেকে রহস্যময় পাষাণ মূর্তি। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে-কথা অবান্তর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মৌল প্রভেদের পরিচয় আছে এখানে। ওদের চঞ্চল স্বভাবে ওরা বিশ্বজয় করেছে, আমাদের শান্ত স্বভাবের জোরে আমরা মরতে-মরতেও মনুষ্যত্ব হারাইনি। আমাদের ইতর জন যারা, তারাও মানুষ, এতদিন এ-কথা আমরা জোর ক'রেই বলতে পারতুম। বিলেতি ফিল্মে বিলেতি ছোটোলোক যখন দেখি, তখন আশ্চর্য হোয়ে এটাই উপলব্ধি করি যে লোকটা চেহারায়, চরিত্রে, হাবে-ভাবে, আমাদের দেশের ইতরজনের চেয়ে ঢের বেশি ছোটোলোক। আবার ওদের মধ্যে যাঁরা ভালো, যাঁরা বড়ো, তাঁরা আমাদের উঁচকপালদের চাইতে সত্যি-সত্যি অনেক উঁচুতে, সেটাও মানতে হয়। ওদের সব চেয়ে ভালোটা আশ্চর্য রকম ভালো, খারাপটাও অতিশয় মারাত্মক। আমাদের ভালোটা হয়তো মাঝারি গোছের কিন্তু মন্দটাও দুঃসহ নয়। আমাদের রাস্তার ছোঁড়ারাও মেজর বার্বারার পুষ্যিদের মতো একেবারেই 'খাঁটিমাল' নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য স্যালভেশন আর্মির প্রয়োজন হয় না; মনুষ্যত্বের যেটুকু ভেজাল নিয়ে তারা জন্মেছে তার কিছু-না-কিছু ছিটে-ফোঁটা শেষ পর্যন্ত তাদের গায়ে লেগেই থাকে।

এতদিন অন্তত, তা-ই ছিলো। এতদিন এরা ধুতি পরেছে, চপ্পল পায়ে ফটফট ক'রে পথ চলেছে, শিষ দিয়েছে, মেয়ে-ইস্কুলের বাস্-এর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে;—তাতে অপৌরুষ ছিলো, আস্পর্ধা ছিলো না। ধুতি জিনিশটা যেমন দেহের অনেক খুঁত গোপন করে, তেমনি চরিত্রেরও। কিন্তু কাটাছাঁটা খাকি প্যাণ্ট আজ এদের চেহারার এবং চরিত্রের

সমস্ত বর্বরতা নিঃশেষে উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছে; অশিক্ষার সঙ্গে সামরিক ঔদ্ধত্যের সংযোগে এরা আজ মনুষ্য সমাজে অপাংক্তেয়। প্রভুত্বের স্বাভাবিক পৌরুষ এদের কোনোকালেই ছিলো না, তার বদলে সেবকের যে-শান্ত ভাবটুকুর গুণে এতদিন এদের মানুষ ব'লে মনে হ'তো, আজ একটা খাকি পাৎলুনের মূল্যে তাও এরা খুইয়ে বসেছে। এতদিন নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে এদের কোথায় একটু লজ্জা ছিলো; আজ তাও নেই, আজ এরা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ও নির্জলা; বীরত্বের আর কোনো উপাদান সংগ্রহ না ক'রে শুধু একটা রণবেশের মহিমায় এবং যোদ্ধার হাব-ভাব অঙ্গ-ভঙ্গির কুৎসিত অনুকরণে বিজিত এবং বিজয়ী জাতি উভয়কেই লজ্জা দিচ্ছে। চৈত্রের দুপুর বেলায় এদের চূড়ান্ত অসভ্যতায় আট নম্বর বাস্ উন্মথিত। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অন্নদাশঙ্করের চমৎকার কথাটি মনে পড়লো—'খাকি পরলেই খোক্কস হয়।'

জীবনে কোনোদিনই আমি খাকির প্রেমে পড়িনি। এই অনির্নেয় অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল রং যে আজ পৃথিবীকে এমন ক'রে ছেয়েছে সেটা আমাদের সভ্যতার রুগ্ন দশারই একটা লক্ষণ নয় কি? নয়তো এত ভালো-ভালো রং থাকতে সামরিক ব্যবহারের জন্য খাকি কেন নির্বাচিত হ'লো? শোনা যায় বুওর যুদ্ধের সময় খাকির জন্ম। আফ্রিকার তামাটে মাটির সঙ্গে রং মিলিয়ে সৈন্যদের পোশাক তৈরি করা হ'লো, প্রকৃতির অনুকরণে এর আত্মগোপনের একটা কৌশল। জানি না আজকালকার যুদ্ধে এই কামুফ্লাজ কতটা কার্যকরী। সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডে মনুষ্যজাতি দিন-দিন যে-রকম উপায়নিপুণ হ'য়ে উঠেছে, তাতে খাকি প'রে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে পারার আশা কম। খাকি তবু দুর্মর। দেশ ছেয়ে গেলো। শুধু রণবেশীরাই নয়, ট্রামের কণ্ডাক্টর, ডাকঘরের পিওন, মিলিটারি লরি, সরকারি লেফাফা—যেদিকে তাকাই, চেতন অচেতন সবই যেন খাকি। এই নীরস নিষ্প্রাণ বিবর্ণ বর্ণ আর কত দেখতে হবে! তার উপর আবার কয়েক বছর ধ'রে আপিশের শ্বেতাঙ্গ বেশে খাকি কোর্তার প্রবর্তন হয়েছে, লালদিঘির অর্ধেকটাই আজ খাকি এদিকে অনেক অগ্রগামী যুবক শখ ক'রে খাকি ইজের পরছেন আর গায়ে চাপাচ্ছেন ঝোপ-কামিজ, ইংরেজিতে যাকে বলে বুশ-শার্ট। যাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়, তাদের পক্ষে ঝোপ-কামিজটা হয়তো মানান সই, কিন্তু তোপের মুখ থেকে যাঁরা অনেক দূরে তাঁরা যে কোন আহ্লাদে ঐ বিচিত্র পোশাকটি অঙ্গে ধারণ করেন তা তো ভেবে পাই না। এর চেয়ে যে বড়ুয়া-পাঞ্জাবি

কিংবা 'রাশিয়ান' শার্টও ভালো। হায়রে, এত খাকিও যথেষ্ট নয়, বাঙালি মেয়েরাও নারী বাহিনীতে যোগ দিয়ে খাকি শাড়ি ধরেছেন! হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে খাকি শাড়িটাই ফ্যাশান হবে, এবং আমাদের শ্যামশ্রীময়ীরা খাকির খাপে তাঁদের সৌন্দর্যকে কবর দিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াবেন।

খাকির সমর্থনে একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। ওটা সহজে নোংরা দেখায় না, ওতে খরচ কম। কিন্তু কোনো উজ্জ্বল রঙের পক্ষে ও-কথা তো আরো সত্য। চোখে কী সুন্দর লাগে গাঢ় নাবিক-নীল! দমকলের টকটকে লাল রং কী মনোহারী! অমনি টকটকে লাল রং পরিয়ে সৈন্যদের রণক্ষেত্রে পাঠানো হোক না। রক্ত নিয়েই তাদের খেলা, মানাবে ভালো। খাকিটা অমন নিরপেক্ষ, অমন নৈর্ব্যক্তিক ব'লেই অত খারাপ লাগে, তাতে রাগ বিদ্বেষ ভালোবাসা কিছুই নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো কি হয় না, যদি যোদ্ধৃবেশে রাগের লাল রং আগুনের মতো জ্ব'লে ওঠে? কেন না রাগের ধর্ম এই যে তা কোনো-এক সময়ে থামে, এবং একবার থামলে শান্তির প্রেরণা প্রাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু রাগদ্বেষ-বর্জিত, বিশুদ্ধ লুব্ধতাপ্রসূত, একান্ত নৈর্ব্যক্তিক খাকি-রঙা যুদ্ধ—একি কোনোদিন থামবে? কাগজে-কলমে শান্তি হ'লেও ভিতরে-ভিতরে ধিক-ধিকি জ্বলবে আগুন—১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত যুদ্ধ কি থেমে ছিলো? যদি যুদ্ধ করতেই হয়, রেগে গিয়ে যুদ্ধ করা ভালো, সেটা আপন বিবর্তনের বিধানেই ঠিক জায়গায় এসে সুসম্পূর্ণ হবে—এবং শেষ হবে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, পৌরাণিক কোনো যুদ্ধেই উভয় পক্ষের লুব্ধতা নেই, তাই তার অবসান শুধুই প্রালয়িক নয়, মানবিক; বিপুল হত্যার পরে মনুষ্যত্ব তার আদিম মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। দুর্যোধন যে বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দেবেন না, তার কারণ, তাঁর ভূমিলিপ্সা নয়, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। ঈর্ষা-বিদ্বেষও মানবিক, কিন্তু লোভ দানবিক; রাবণ লোভী, তাই সে রাক্ষস। যদি এমন হ'তো যে রামচন্দ্রও লোভী তাহ'লে রাম-রাবণের যুদ্ধ আজ পর্যন্ত থামতো না। কিন্তু রামচন্দ্র মনুষ্যত্বের মহিমা নিয়েই লোভের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি নিজে লোভ করেননি, তাই ব'লে মনুষ্য ধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন না, সীতা বিরহে সাধারণ মানুষের মতোই কাতর হয়েছিলেন। রামচন্দ্র যে সম্পূর্ণই মানুষ, দেবতা নন, অবতার নন, কিংবা হ'লেও সে-বিষয়ে অচেতন, এটাই রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা এবং বাল্মীকির সবচেয়ে বড়ো কীর্তি।

আজ পৃথিবীর লোককে এ-কথা বলবারই সময় এসেছে—তোমরা ক্রোধ থেকে, ঈর্ষা থেকে, হৃদয়ের কোনো গভীর দুঃখ থেকে যুদ্ধ করো, তাহ'লেই যুদ্ধ থামবে। কলের মতো লড়াই কোরো না, মানুষের মতো যুদ্ধ করো। মানুষ-মানুষে মারামারি হোক, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ বাধুক। তাহ'লে রণক্ষেত্রই একদিন মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হবে। কিন্তু আজকালকার লড়াই যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের, ট্যাঙ্ক বোমা মেশিন-গানের মতো মানুষও যুদ্ধের একটা উপাদান মাত্র। আসল সংঘর্ষ কূটবুদ্ধিপ্রসূত চালের সঙ্গে চালের, সে অতি দুর্গম নেপথ্য থেকে আপন কাজ ক'রে যাচ্ছে। আধুনিক জগতের এটাই বোধ হয় সবচেয়ে অভিনব আবিষ্কার —এই বিনা-রাগের লড়াই, এই হৃদয়বর্জিত, নৈর্ব্যক্তিক, অ-মানুষিক যুদ্ধ। খাকি তারই প্রতীক।

আধুনিক যুদ্ধের অ-মানুষিক চরিত্র থেকেই খাকির জন্ম, নাকি খাকি রঙের প্রভাবেই আধুনিক যুদ্ধের এই অ-মানুসিকতা, এ-প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়—এবং আপাতত না করলেও চলতে পারে। আপাতত যেটা শাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেটা এই যে খাকি রংটা ঘোরতর অপ্রীতিকর। রং হিসেবে এটা নিকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই; তার উপর আমাদের চোখে খারাপ লাগবার বিশেষ একটু কারণ আছে। সেটা এই যে আমাদের দেশে খাকি কখনো ছিলো না; ওটা ইংরেজ এনেছে, এবং ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ব'লে খাকিকে আমরা অত্যন্ত সমীহ করি এবং কিছুটা ভয় করি, কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার পথ খুঁজে পাই না। আমাদের জীবনের অনেক দূরে, অনেক উপরে, সরকারি স্বর্গলোকে খাকি প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা খাকি পরেন তাঁরা আমাদের কর্তা, আমরা দোষ করলে ধমক দেন, যথোচিত সেবা করলে একটু পিঠ চাপড়িয়ে কৃতার্থ করেন। আমাদের মনে খাকি এই প্রভুবৃত্তির সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে আমাদের অবচেতনেও এই মনোভাবের প্রভাব কাটে না। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ও যখন খাকি পরেন তাঁকে কেমন পর-পর ঠেকে; কোনো খাকি পরিহিত সুহৃদ সজ্জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের রাস্তা সহজ মনে হয় না। ও-জিনিশটার বিজাতীয় দূরত্ব আমাদের একটা বহুকালের সংস্কার। তা হ'লেও এটা মানতে হয় যে শ্বেতাঙ্গরা যখন খাকি পরেন তাঁদের বেশ ভালোই দেখায়, কিন্তু আমাদের চর্মের তৈলচিক্কণ তাম্র আভা খাকি এমনই নির্মমভাবে প্রকট ক'রে তোলে যে ওর সঙ্গে রাজকীয় মহিমার অনুষঙ্গ না-থাকলে আমরা খাকি পরবার আগে সাতবার গলায় দড়ি দিতুম। কথাটা

শুনে বন্ধু বান্ধব অনেকেই খুশি হবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে কোনো বঙ্গবীর যখন খাকি পাৎলুন আর ঝোপ-কামিজ প'রে বুক টান ক'রে টগবগিয়ে চরে বেড়ান, সে-দৃশ্য দেখে ইংরেজের কী মনে হয় তাঁরাই জানেন, আমরা লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারি না। শিল্পী যামিনী রায়ের মুখে একটা কথা অনেকদিন শুনেছি; দেশ স্বাধীন হ'লে সেপাইদের পোশাক কী-রকম হবে এ নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবিত। স্বীকার করবো, তাঁর এই সমস্যা নিয়ে আমি বিশেষ উৎসুক্য প্রকাশ করিনি; দেশ যদি স্বাধীনই হ'তে পারে তাহ'লে সেপাইদের পোশাকও একটা উদ্ভাবন করা অসম্ভব হবে না, আমার মনের ভাবটা ছিলো এই রকম। কিন্তু সম্প্রতি বুশ-শার্ট পরা বঙ্গবীরদের দেখে যামিনী রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেলো; তাঁর মনে যে এ-প্রশ্নটা উঠেছে তাতে বোঝা গেলো তাঁর জীবনদর্শন কত গভীর। সত্যিই তো, আমাদের সেপাই সান্ত্রী, পোস্টম্যান লিফটম্যান, ট্রাম-কণ্ডক্টর, এ আর পি, সকলকেই কি আমরা হৃদয়হীন খাকিতে মুড়ে রাখবো? আর সকলেরই ঐ পাৎলুন আর কোর্তা? ধুতি শৌখিনতার অপবাদে লাঞ্ছিত, কিন্তু পাজামা-পাঞ্জাবি কেন আমাদের সরকারি পোশাক হ'তে পারবে না? আর পৃথিবীর স্নিগ্ধ মধুর রংগুলোকেই বা কোন অপরাধে নির্বাসনে পাঠাবো? মনে করুন চাঁপা-রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ট্রাম-কণ্ডক্টর, মেটে সিঁদুরের রঙে সুসজ্জিত ডাকওলা চিঠি নিয়ে এলো, পায়রার ডিমের মতো ঈষৎ নীল পুলিশম্যান রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে। কল্পনা করতেই জীবনটাকে কত সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর মনে হয়। লণ্ডন শহরের রাস্তায় ছ-ফুট লম্বা পুলিশ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন তার জাঁদরেল চেহারা সত্ত্বেও তাকে সর্বজনের বন্ধু ব'লে মনে হয়, কারণ সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে পোশাকে হাবে-ভাবে চলাফেরায় সে সংগতি রক্ষা করেছে। তাকে দেখেই মনে হয় যে সে সর্বসাধারণেরই একজন, দূর কেউ নয়, পর কেউ নয়, সর্বসাধারণের ইচ্ছাই তাকে ওখানে দাঁড় করিয়েছে। লণ্ডনের লোক তাকে আপন জন ব'লে না-ভেবেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ তার পরিবেশের মধ্যে একটি জীবন্ত ছন্দ পতন, লাল পাগড়ি তাকে সর্ব-সাধারণের জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাকে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু বড্ড বেশি ভয় করে। পুলিশ যদি শুধুই বিভীষিকা হয়, তাহ'লে তার পক্ষে যথার্থ কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয় না। পট্টি বুট জুতো কোর্তা কামিজে জড়ানো এই রাজপ্রতিভূর সর্বসাধারণের জীবনে

স্থান নেই। ও-সব পরিহার ক'রে তাকে যদি আজ ধুতি কিংবা পাজামা পরানো হয়, তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গেই দেশের লোকের সঙ্গে তার একটি হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হ'য়ে যায়। আজকের এই বোমা-পড়া কৃষ্ণপক্ষে এ-সব কথা বাজে কথা নয়, গভীরভাবে ভেবে দেখবার। এমন যদি হয় যে বাড়িতে বোমা পড়েছে, আর খাকি-পরা এ আর পি এলো উদ্ধার করতে, ঐ দুঃসময়েও খাকি রংটাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারবো কি? কল্পনা করা যাক সেই একই লোক এলো শুভ্র খদ্দর প'রে; আমাদের মন মুহূর্তে উন্মুখ হবে তার দিকে, সহজ হবে সহযোগিতা। আর যদি রং চাইতো আছে গেরুয়া—আমাদের দেশের জনসেবার প্রাচীন প্রতীক—আর গেরুয়া পছন্দ না হয়তো উজ্জ্বল বৌদ্ধ হলদে আছে, আমাদের হৃদয় তাকেও সানন্দে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু খাকি নয়, কিছুতেই খাকি নয়।

"উত্তর তিরিশ"। ১৯৪৫

ব ই কে না

সৈয়দ মুজতবা আলী

মাছি-মারা-কেরাণি নিয়ে যত ঠাট্টা রসিকতাই করি না কেন, মাছি ধরা যে কত শক্ত সে কথা পর্যবেক্ষণশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। মাছিকে যে-দিক দিয়েই ধরতে যান না কেন, সে ঠিক উড়ে যাবেই। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, দুটো চোখ নিয়েই মাছির কারবার নয়, তার সমস্ত মাথা জুড়ে নাকি গাদা গাদা চোখ বসানো আছে। আমরা দেখতে পাই শুধু সামনের দিক, কিন্তু মাছির মাথার চতুর্দিকে চক্রাকারে চোখ বসানো বলে সে একই সময়ে সমস্ত পৃথিবীটা দেখতে পায়।

তাই নিয়ে গুণী ও জ্ঞানী আনাতোল ফ্রাঁস দুঃখ করে বলেছেন, 'হায় আমার মাথার চতুর্দিকে যদি চোখ বসানো থাকতো, তাহলে আচক্রবাল-বিস্তৃত এই সুন্দরী ধরণীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এক সঙ্গেই দেখতে পেতুম।'

কথাটা যে খাঁটি, সে-কথা চোখ বন্ধ করে একটুখানি ভেবে নিলেই বোঝা যায় এবং বুঝে নিয়ে তখন এক আপশোষ ছাড়া অন্য কিছু করবার থাকে না। কিন্তু এইখানেই ফ্রাঁসের সঙ্গে সাধারণ লোকের তফাৎ। ফ্রাঁস সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'কিন্তু আমার মনের চোখ তো মাত্র একটি কিংবা দুটি নয়। মনের চোখ বাড়ানো-কমানো তো সম্পূর্ণ আমার হাতে। নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই এক একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'

পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য-উপন্যাসের এক-চোখা দৈত্যের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুললেই চোখ রাঙাই।

চোখ-বাড়াবার পন্থাটা কি? প্রথমত বইপড়া, এবং তার জন্য দরকার বই কেনার প্রবৃত্তি।

মনের চোখ ফোটানোর আরো একটা প্রয়োজন আছে। বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভিতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভিতর ডুব দেওয়া। যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে সান্ত্বনা না পেলে দর্শন, দর্শন কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল—আরো কত কি।

কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই। তাই ভেবেই হয়ত ওমর খৈয়াম বলেছিলেন,—

Here with a loaf of bread
beneath the bough,
A flask of wine, a book of
verse and thou,
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is Paradise enow.

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত-যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

আর খৈয়াম তো ছিলেন মুসলমান। মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরাণের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লামা বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence, সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

যে-দেবকে সর্বমঙ্গল কর্মের প্রারম্ভে বিঘ্নহন্তারূপে স্মরণ করতে হয়, তিনিই তো আমাদের বিরাটতম গ্রন্থ স্বহস্তে লেখার গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গণপতি 'গণ' অর্থাৎ জনসাধারণের দেবতা। জনগণ যদি পুস্তকের সম্মান করতে না শেখে, তবে তারা দেবভ্রষ্ট হবে।

কিন্তু বাঙালী নাগর ধর্মের কাহিনী শুনে না। তার মুখে ঐ এক কথা 'অত কাঁচা পয়হা কোথায়, বাওয়া, যে বই কিনব?'

কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্য—কনিষ্ঠা পরিমাণ—লুকনো রয়েছে। সেটুকু এই যে, বই কিনতে পয়সা লাগে—ব্যস। এর বেশি আর কিছু নয়।

বইয়ের দাম যদি আরো কমানো যায়, তবে আরো অনেক বেশি বই বিক্রি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যদি প্রকাশককে বলা হয়, 'বইয়ের দাম কমাও', তবে সে বলে 'বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাবো কি করে?'

'কেন মশাই, সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা পৃথিবীর ছয় অথবা সাত নম্বরের ভাষা। এই ধরুন ফরাসী ভাষা। এ-ভাষায় বাংলার তুলনায় ঢের কম লোক কথা কয়। অথচ যুদ্ধের পূর্বে বারো আনা, চৌদ্দ আনা, জোর পাঁচসিকে দিয়ে যে-কোন ভাল বই কেনা যেত। আপনারা পারেন না কেন?'

'আজ্ঞে, ফরাসী প্রকাশক নির্ভয়ে যে-কোন ভালো বই এক ঝটকায় বিশ হাজার ছাপাতে পারে। আমাদের নাভিশ্বাস ওঠে দু'হাজার ছাপাতে গেলেই। বেশি ছাপিয়ে দেউলে হব নাকি?'

তাই এই অচ্ছেদ্য চক্র। বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।

এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। সে এক্সপেরিমেণ্ট করতে নারাজ—দেউলে হওয়ার ভয়ে।

কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিন গুণও বাড়িয়ে দেন, তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই। মাঝখান থেকে আপনি ফ্রাঁসের মাছির মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাবেন, রাসেলের মত একগাদা নূতন ভুবন সৃষ্টি করে ফেলবেন।

ভেবে-চিন্তে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বই কেনে সংসারী লোক। পাঁড় পাঠক বই কেনে প্রথমটায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, তারপর চেখে চেখে সুখ করে করে, এবং সর্বশেষ সে কেনে ক্ষ্যাপার মত, এবং চুর হয়ে থাকে তার মধ্যিখানে। এই একমাত্র ব্যসন, একমাত্র নেশা যার দরুণ সকাল বেলা চোখের সামনে সারে সার গোলাপী হাতী দেখতে হয় না, লিভার পচে পটল তুলতে হয় না।

আমি নিজে কি করি? আমি একধারে Producer এবং Consumer—তামাকের মিকশ্চার দিয়ে আমি নিজেই সিগরেট বানিয়ে Producer এবং সেইটে খেয়ে নিজেই Consumer: আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? আমি একখানা বই Produce করেছি।—কেউ কেনে না বলে আমিই Consumer, অর্থাৎ নিজেই মাঝে মাঝে কিনি।

মার্ক টুয়েনের লাইব্রেরিখানা নাকি দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা

বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মার্ক‌টুয়েনকে বললেন, "বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গোটা কয়েক শেলফ যোগাড় করছ না কেন?"

মার্ক‌টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, "ভাই, বলেছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেলফ তো আর সে কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে। শেলফ তো আর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।"

শুধু মার্ক‌টুয়েনই না, দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই লাইব্রেরি গড়ে তোলে কিছু বই কিনে. আর কিছু বই বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করে ফেরত না দিয়ে। যে-মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই দেখা যায় বইয়ের বেলা সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত। তার কারণটা কি?

এক আরব পণ্ডিতের লেখাতে সমস্যাটার সমাধান পেলুম।

পণ্ডিত লিখেছেন, "ধনীরা বলে, পয়সা কামানো দুনিয়াতে সব চেয়ে কঠিন কর্ম। কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, না, জ্ঞানার্জন সব চেয়ে শক্ত কাজ। এখন প্রশ্ন, কার দাবীটা ঠিক, ধনীর না জ্ঞানীর? আমি নিজে জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, কাজেই আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, সেইটে আমি বিচক্ষণ জনের চক্ষুগোচর করতে চাই। ধনীর মেহন্নতের ফল হ'ল টাকা। সে ফল যদি কেউ জ্ঞানীর হাতে তুলে দেয়, তবে তিনি সেটা পরমানন্দে কাজে লাগান, এবং শুধু তাই নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, জ্ঞানীরা পয়সা পেলে খরচ করতে পারেন ধনীদের চেয়ে অনেক ভালো পথে, ঢের উত্তম পদ্ধতিতে। পক্ষান্তরে পশ্য, পশ্য, জ্ঞানচর্চার ফল সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে এবং সে ফল ধনীদের হাতে গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা তার ব্যবহার করতে জানে না।—বই পড়তে পারে না।"

আরব পণ্ডিত তাই বক্তব্য শেষ করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে, "অতএব সপ্রমাণ হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর।"

তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের বাহন পুস্তক যোগাড় করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। একমাত্র বাংলা দেশ ছাড়া।

সেদিন তাই নিয়ে শোক প্রকাশ করাতে আমার জনৈক বন্ধু একটি গল্প বললেন। এক ড্রইং-রুম-বিহারিণী গিয়েছেন বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জন্য সওগাত কিনতে। দোকানদার এটা দেখায়, সেটা শোঁকায়,

এটা নাড়ে, সেটা কাড়ে, কিন্তু গরবিণী ধনীর (উভয়ার্থে) কিছুই আর মনঃপূত হয় না। সব কিছুই তাঁর স্বামীর ভাণ্ডারে রয়েছে। শেষটায় দোকানদার নিরাশ হয়ে বললে, "তবে একখানা ভাল বই দিলে হয় না?" গরবিণী নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন, "সেও তো ওঁর একখানা রয়েছে।"

যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী। একখানা বই-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

অথচ এই বই জিনিসটার প্রকৃত সম্মান করতে জানে ফ্রান্স। কাউকে মোক্ষম মারাত্মক অপমান করতে হলেও তারা ঐ জিনিস দিয়েই করে। মনে করুন আপনার সবচেয়ে ভক্তি-ভালবাসা দেশের জন্য। তাই যদি কেউ আপনাকে ডাহা বেইজ্জৎ করতে চায়, তবে সে অপমান করবে আপনার দেশকে। নিজের অপমান আপনি হয়ত মনে মনে পঞ্চাশ গুণে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু দেশের অপমান আপনাকে দংশন করবে বহুদিন ধরে।

আঁদ্রে জিদে'র মেলা বন্ধু বান্ধব ছিলেন—অধিকাংশই নাম করা লেখক। জিদ রুশিয়া থেকে ফিরে এসে সোভিয়েট রাজ্যের বিরুদ্ধে একখানা প্রাণঘাতী কেতাব ছাড়েন। প্যারিসের স্তালিনীয়ারা তখন লাগল জিদের পিছনে—গালিগালাজ কটুকাটব্য করে জিদের প্রাণ অতিষ্ট করে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, জিদের লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই চুপ ক'রে সব কিছু শুনে গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন না। জিদের জিগরে জোর চোট লাগল—তিনি স্থির করলেন, এদের একটা শিক্ষা দিতে হবে।

কাগজে বিজ্ঞাপন বেরল, জিদ তাঁর লাইব্রেরিখানা নিলামে বেচে দেবেন বলে মনস্থির করেছেন। প্যারিস খবর শুনে প্রথমটায় মূর্চ্ছা গেল, কিন্তু সম্বিতে ফেরা মাত্রই মুক্ত কচ্ছ হয়ে ছুটলো নিলামখানার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবস্থা দেখে সকলেরই চক্ষু স্থির।

যে সব লেখক জিদের হয়ে লড়েননি, তাঁদের যে-সব বই তাঁরা জিদকে স্বাক্ষর সহ উপহার দিয়েছিলেন, জিদ মাত্র সেগুলোই নিলামে চড়িয়েছেন। জিদ শুধু জঞ্জালই বেচে ফেলছেন।

প্যারিসের লোক তখন যে অট্টহাস্য ছেড়েছিল, সেটা আমি ভূমধ্যসাগরের মধ্যিখানে জাহাজে বসে শুনতে পেয়েছিলুম—কারণ খবরটার গুরুত্ব বিবেচনা করে রয়টার সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন—জাহাজের টাইপ-করা একশো লাইনি দৈনিক কাগজ সেটা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছিল।

অপমানিত লেখকরা ডবল তিন ডবল দামে আপন আপন বই লোক পাঠিয়ে তড়ি ঘড়ি কিনিয়ে নিয়েছিলেন—যত কম লোকে কেনা-কাটার খবরটা

জানতে পারে ততই মঙ্গল। (বাংলা দেশে নাকি একবার এ রকম টিকি বিক্রি হয়েছিল।)

শুনতে পাই, এঁরা নাকি জিদকে কখনো ক্ষমা করেননি।

আর কত গল্প বলবো? বাঙালীর কি চেতনা হবে?

তাও বুঝতুম, যদি বাঙালীর জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকতো। আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালী যদি হটেনটট হত, তবে কোন দুঃখ ছিল না। এ রকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালীর পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা? ফুটবল মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে, না সিনেমার টিকিট কাটার 'কিউ' থেকে?

থাক্ থাক্। আমাকে খামাখা চটাবেন না। বৃষ্টির দিন। খুশ গল্প লিখব বলে কলম ধরেছিলুম। তাই দিয়ে লেখাটা শেষ করি। গল্পটা সকলেই জানেন, কিন্তু তার গূঢ়ার্থ মাত্র কাল বুঝতে পেরেছি। আরবোপন্যাসের গল্প।

এক রাজা তাঁর হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাঁকে খুন করেন। বই হস্তগত হল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন। কিন্তু পাতায় পাতায় এমনি জুড়ে গিয়েছে যে, রাজা বার বার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টোচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন ব'লে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন। তিনি পাতায় পাতায় কোণের দিকে মাখিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক বিষ। রাজার আঙুল সেই বিষ মেখে নিয়ে যাচ্ছে মুখে।

রাজাকে এই প্রতিহিংসার খবরটিও হেকিম রেখে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা বিষবাণের ঘায়ে ঢলে পড়লেন।

বাঙালীর বই কেনার প্রতি বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে যেন গল্পটা জানে, আর মরার ভয়ে বই কেনা, বই পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

"পঞ্চতন্ত্র"। বঙ্গাব্দ আষাঢ় ১৩৫৯

ক ল কা তা ও ল ণ্ড ন

ইন্দ্রজিৎ

কলকাতা সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভয় মিশ্রিত ভক্তির ভাব লেগে আছে। ভক্তি থাকাই স্বাভাবিক। মাতৃঋণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদিচ কলকাতায় আমার জন্ম নয়। তথাপি অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালীর ন্যায় কলকাতার স্তন্যে আমি লালিত,—শিক্ষালাভ করেছি আমি প্রধানত কলকাতায়। কলকাতা আমাকে লালন করেছে বটে, কিন্তু পালন করেনি অর্থাৎ জীবিকার্জনের ব্যবস্থা কলকাতায় হয়নি। জীবিকার অন্বেষণে কলকাতা যেদিন ছাড়তে হয়েছে সেই দিন থেকে পরিচয়ের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে। যে ছিল আপনজন ক্রমে সে পর হয়ে গেছে। বিশাল নগরীতে বাস করবার বিশেষ রকম কলাকৌশল আছে। ছাত্রাবস্থায় সেই কায়দাকানুনগুলো আয়ত্ত করেছিলুম। বহুকালের অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস হয়েছে। এখন হাওড়া কিম্বা শেয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামবামাত্র আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। বিশাল জনতার মধ্যে কোথাও একটা নির্মমতা আছে, সে কাউকে চেনে না। কলকাতায় আমার অগণিত আত্মীয় অগণিত বন্ধু অথচ কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতবার যে মনে হয়েছে এমন অনাত্মীয়, এমন নির্বান্ধব স্থান বোধকরি আর দ্বিতীয়টি নেই।

আমি যাঁকে গুরু বলে মানি সেই চার্লস ল্যাম লণ্ডনজাত, লণ্ডন লালিত এবং লণ্ডন পালিত মানুষ ছিলেন। তাঁর লণ্ডন প্রীতি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয়ে তাঁর বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর লণ্ডন সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। তথাপি ল্যাম-এর একটি উক্তিতে মনে ধোঁকা লেগে যায়—the sweet security of streets—জনবহুল যানবহুল রাজপথে নিরাপদ গতির কথা আমি ভাবতেই পারিনে। লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলকাতার রাস্তার চাইতে আপদসঙ্কুল স্থান আর কি হতে পারে আমি তো ভেবেই পাইনে। এই গেল ভয়ের কথা। অপরদিকে এও সত্য, সেই দুর্গম রাস্তা কোনো রকমে পার করে দিয়ে কেউ যদি আমাকে একটি চায়ের দোকানে কিম্বা কফি হাউসে

একবার বসিয়ে দিতে পারে তো আমার চাইতে কলকাতার বড় ভক্ত আর খুঁজে পাবেন না। মুহূর্তপূর্বে যে স্থান নির্বান্ধব মনে হয়েছিল, তাই এখন বন্ধু সমাকুল মনে হবে। চায়ের দোকানে নিতান্ত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিও মিত্রবংশীয়। ডক্টর জনসন বলেছিলেন, আমার এই ট্যাভার্ন চেয়ারই আমার সিংহাসন। চায়ের দোকানে একটি নিরাপদ আসন পেলে তাঁর মতো আমিও রাজ্যসুখ ত্যাগ করতে রাজি আছি।

চার্লস ল্যাম-এর মতো ডক্টর জনসনও অতিমাত্রায় লণ্ডন ভক্ত ছিলেন। বলেছিলেন One who is tired of London is tired of life অর্থাৎ কিনা লণ্ডনের স্বাদ যে হারিয়েছে সে জীবনের স্বাদ হারিয়েছে। কোনো শহর বা নগর সম্বন্ধে এত বড় সার্টিফিকেট কেউ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কলকাতা সম্বন্ধে অতখানি বলতে কেউ রাজি কিনা আমি জানিনে। কলকাতা বিহনে জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে এতখানি বলতে আমি প্রস্তুত নই। এইটুকু অবশ্যই বলব যে, একঘেয়ে জীবনে অরুচি ধরে গেলে স্বাদ বদলাবার জন্যে কলকাতায় যাওয়ার সার্থকতা আছে।

সেই লণ্ডনকে জনসন অত বড় সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে, সেই লণ্ডন শহর বহুদিন তাঁকে মাথা গুঁজবার স্থানটুকু দেয়নি। বাসস্থানের অভাবে লণ্ডনের রাস্তায় কিম্বা পার্কে তাঁকে রাত কাটাতে হয়েছে। মায়ামমতাহীন লণ্ডন একদা তাঁকে হেলাফেলা করেছে; সেই লণ্ডনকে উত্তরকালে তিনি নিজগুণে জয় করেছিলেন। লণ্ডন-সমাজের শিরোমণি হয়ে বসেছিলেন। গুণী জ্ঞানীরা তাঁকে ঘিরে বসেছেন, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর তাঁকে মহাসমাদরে রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে লাঞ্চে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে লোকে কৃতার্থ, থিয়েটারে তাঁর আসন নির্দিষ্ট, চা কফির দোকানে তিনি সিংহাসনে আসীন। কোথায় জনসনের লণ্ডন আর কোথায় আমার কলকাতা। কলকাতার অগণ্য জনতার মধ্যে আমি নগণ্য। সেখানে কেউ আমাকে সূচ্যগ্র ভূমি ছেড়ে দেয় না। লম্বা কিউ-র ল্যাজের ঝাপটা খেয়ে পালাতে হয়।

আপন বাহুবলে কিম্বা নিজগুণে যে জিনিস আয়ত্ত হয় তার অধিকার ভোগে যতখানি তৃপ্তি পাওয়া যায় এমন আর কিছুতে নয়। কোর্সিকা-বাসী নেপোলিয়নের ফ্রান্স জয়, অস্ট্রিয়াবাসী হিটলারের জার্মেনী জয় আর অজ্ঞাতকুলশীল গ্রাম্য বালক জনসনের লণ্ডন জয় এক পর্যায়ের বলতে হবে। বোধকরি এই কারণেই জনসনের লণ্ডন প্রীতি এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিরমণীয়। জনসন যখন

স্কটল্যাণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন, জনৈক স্কচ ভদ্রলোক তাঁদের মহামান্য অতিথিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন উক্ত দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁকে কতটা মুগ্ধ করেছে। জনসন তাঁর স্বভাবসুলভ শ্লেষাত্মক ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, মশায়, সত্যি বলতে কি দেখবার মতো বস্তু আছে একটি—ঐ চওড়া সড়কটা যেটা বেয়ে যে কোনো স্কচম্যান লণ্ডন-স্বর্গে পোঁছে যেতে পারে।

আমীর ওমরাও নন্, উচ্চ রাজকর্মচারী নন্, অত্যন্ত দরিদ্র একজন সাধারণ নাগরিক লণ্ডনের মতো একটি বিরাট নগরীর উপরে এতখানি প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। নিজেই গর্ব করে বলেছেন, এমন দিন যায় না যেদিন খবরের কাগজে কোন না কোন সূত্রে আমার উল্লেখ না থাকে। ডক্টর জনসন কোথায় ডিনার খেলেন, ডিনার টেবিলে কোন্ প্রসঙ্গে কি মন্তব্য করেছিলেন, পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হ'ত এবং মুখে মুখে সেই কথা সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ত। খবরের কাগজের তখন সবে জন্ম হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে খবর সম্বন্ধে লোকের রুচি তখন অনেক বেশি মার্জিত ছিল। যা যথার্থই মূল্যবান তাকে মূল্য দিতে জানত। আজকাল খুন-জখম, তহবিল তছরুপ, নারী-হরণ, এইসবই খবরের কাগজে প্রধান উপজীব্য। তখনকার দিনে এসব ব্যাপার সমাজে আদৌ ঘটত না এমন নয়, তবে এতটা বিস্তার লাভ করেনি, এ কথা নিশ্চিত। তা ছাড়া এই সব ব্যাপারকে সাধারণের দরবারে পরিবেশন যোগ্য ব'লে গণ্য করা হ'ত না।

লণ্ডনের সঙ্গে তাঁর নাম এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, তাঁর মৃত্যুর ১৭০ বৎসর পরে আজও টুরিস্ট ব্যবসার খাতিরে ইংরেজ বিদেশী-দের আহ্বান করে বলে: Visit Johnson's London, বিদেশী টুরিস্টরা কি বলে জানিনে। আমি হলে বলতুম সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। জনসনহীন লণ্ডনের আজ কি আকর্ষণ? আধুনিক ইংরেজ কবি বিদ্রূপ করে বলেছেন: Oh! to be in England now that Winston's there. আমি কবি হ'লে বলতুম,—Oh! for a day in London when Johnson was there.

যাই বলুন, লণ্ডনের কৃতিত্ব আছে, ও একনিষ্ঠ। কত রাজা কত উজীর গেল, কাউকে সে আমল দেয়নি। বলে, আমি আর কাউকে জানি না, আমি শুধু জনসনকে জানি। জনসন আমার, আমি জনসনের। কিন্তু কলকাতা কার? ও কারোরই নয়। রামমোহনের নয়, বিদ্যাসাগরের

নয়, বিবেকানন্দের নয়, রবীন্দ্রনাথের নয়। কত জ্ঞানী, কত গুণী, কত কর্মী কলকাতায় জীবনপাত করে গেলেন, ও কাউকেই মনে প্রাণে বরণ করে নেয়নি। কারো নামে নিজের পরিচয় দেয় না। লণ্ডনের মতো কারো সম্বন্ধে বলে না—তোমার গরবে গরবিনী আমি। ও কোন একজনের নয় ও জনতার।

লেখাটা প্রমীলা দেবীকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। উনি বাধা দিয়ে বললেন—তুমিও যেমন, লণ্ডন আর কলকাতা এক হতে যাবে কেন? লণ্ডন হ'ল মান্ধাতার আমলের সেকেলে মানুষ। আমাদের কলকাতা একেলে। ঠানদি আর নাতনির রকম-সকম কি এক হয়, না হলে ভালো লাগে? একনিষ্ঠতা যেমন ঠানদিকে মানায়, নাতনিকে তেমন নয়। কলকাতা আধুনিকা। ও কারো কাছে ধরা দেয়নি, ভালোই করেছে। ওর কথা হ'ল, আমি তারি যে আমারে যমনি দেখে চিনতে পারে। তা প্রমীলা দেবী কথাটা মন্দ বলেননি। আমি এদিক থেকে ভেবে দেখিনি। কিন্তু এটাও একটা দিক! আর এসব বিষয়ে মেয়েদের মত-ই শিরোধার্য।

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে লণ্ডনের পশ্চাতে বহু শতাব্দীর ইতিহাস। কলকাতার ইতিহাস নেই, তেমনি আবার কৌলিন্যও নেই। ও এই সেদিনের অর্বাচীন। হিন্দু আমলের ফোঁটা তিলক নেই, নবাবী আমলের তকমা নেই। ইংরেজের আমলে ওর জন্ম। এত অল্প দিনে কৌলিন্য গড়ে উঠতে পারে না। কৌলিন্যবোধ যদি থাকত তো কুলিন কন্যাদের মতো অন্তত মরণকালেও কারো-না-কারো সঙ্গে মালা বদল করত। ওর তেমন মতিই নয়। ও নিজে যেমন অর্বাচীন, অর্বাচীনের প্রতিই তার আকর্ষণ। ছেলেছোকরাদের নিয়েই ও মেতে আছে। ওর বুদ্ধি কোনকালে পাকবে বলে মনে হয় না।

লণ্ডন আর কলকাতায় এই তফাৎ। লণ্ডন সাবালকের অর্থাৎ পরিণত বুদ্ধির শহর। তার কারণ লণ্ডন হচ্ছে ওদের ব্যবসায় কেন্দ্র এবং শাসনকেন্দ্র। শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে লণ্ডনের তেমন প্রতিপত্তি নেই। নানা বিদ্যার নানা কেন্দ্র দেশময় বিস্তৃত; তোমার প্রয়োজন বুঝে যাও অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে কিম্বা শেফিল্ড ম্যাঞ্চেস্টার নয়তো গ্লাসগো এডিনবরায়। বেশির ভাগ মানুষ লণ্ডনের বাইরে শিক্ষিত। শিক্ষা সমাপ্ত করে, তবে জীবিকার অন্বেষণে ওদেশের লোক লণ্ডনে গিয়ে ভিড় করে। আর আমাদের শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র কলকাতা। বি এ, এম এ তো বটে; আইন পড়তে চান কলকাতায়, ডাক্তারি পড়তে চান কলকাতায়, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চান তাও

কলকাতায়। কলকাতার বাইরে উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই। গোটা বাংলা দেশের বিনিময়ে এক কলকাতা ফেঁপে উঠছে। তাতে কুফল ছাড়া সুফল কিছুই হয়নি। বাংলা দেশের চেহারাটি হয়েছে ম্যালেরিয়া রোগীর মতো পিলে-সর্বস্ব অর্থাৎ কলকাতা সর্বস্ব, হাত-পাগুলো কাঠি কাঠি। গায়ে মাংস লাগেনি কারণ মফস্বল অঞ্চল সব দিক থেকে বঞ্চিত—শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, সৌন্দর্য নেই, রুচি নেই। কলকাতা আমাদের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র তো বটেই, উপরন্তু ব্যবসা এবং শাসন কেন্দ্রও বটে। শহরটি ছাত্রপ্রধান বলে এরা ব্যবসা বলুন, শাসন বলুন, উৎসব ব্যসন বলুন সবই ছাত্রদের নিয়ে। আমাদের শাসকবর্গ তো ছাত্র শাসন নিয়েই গলদঘর্ম। উৎসব ব্যসনের তো কথাই নেই। ছাত্র নইলে খেলাধুলা মিথ্যা, সিনেমা-হাউস ফাঁকা, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা অচল। কলকাতার জীবন দ্বিখণ্ডিত। বয়স্করা জীবিকা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন,—বলতে গেলে জীবন্মৃত। আর ছেলেছোকরারা জীবনামৃত এমন গোগ্রাসে গিলছে যে সেটা এক রকম হ্যাঙলাপনায় দাঁড়িয়েছে। এর কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। জীবিকা এবং জীবন এই দুই নিয়ে নগর নগরীর চরিত্র। এক দল জীবিকা নিয়ে থাকবে আরেক দল জীবনকে নিয়ে, তাতেই দ্বন্দ্ব সমস্যা দেখা দেয়। গোলদীঘির সঙ্গে লালদীঘির, বড়বাজারের সঙ্গে বৌবাজারের ঠিক সামঞ্জস্য-বিধান হয়নি; এইজন্য কলকাতার সামাজিক জীবন বিধ্বস্ত। সেই সামঞ্জস্য যেদিন হবে সেদিন কলকাতা অনেকটা ধাতস্থ হবে।

কলকাতার মন মেজাজ এমনি বদলে গিয়েছে, আর যে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে পারি এমন ভরসা হয় না। জনসন যেমন লণ্ডন জয় করেছিলেন এমন দুরাশা রাখিনে। ওখানকার জ্ঞানীগুণীরা আমাকে ঘিরে বসবেন এমন শুভ বুদ্ধি কি তাঁদের হবে? জনসনের মতো আমার বিদ্যেও নেই বুদ্ধিও নেই, শুধু তাঁর দুর্বুদ্ধিটুকু আছে। চোখা চোখা কথা বলে লোক ঘায়েল করতে উনিও ওস্তাদ ছিলেন। সে বিদ্যেটা আমিও যৎকিঞ্চিৎ আয়ত্ত করেছি। জন্‌সনীয় ভঙ্গিতে কলকাতার সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি এই প্রবন্ধেই করেছি। কিন্তু কলকাতার রসজ্ঞান আছে। নিশ্চয় বুঝবে আমি ওকে ভালবাসি। যার সম্বন্ধে আমি উদাসীন তাকে গাল দিতেই বা যাবো কেন? আমার কলকাতাকে অপরে কেড়ে নিয়েছে এই ঈর্ষার বশেই কটূক্তি করেছি এতটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি কলকাতার আছে।

একদিক থেকে জন্‌সনের চাইতে আমি বেশি ভাগ্যবান। জন্‌সন

লণ্ডনকে তেমন করে পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে, লণ্ডনও তখন বৃদ্ধ। আমি কলকাতাকে পেয়েছি আমার যৌবনে, তখন কলকাতারও ভরা যৌবন। ধূমায়িত চায়ের কাপে কলকাতার উষ্ণ স্পর্শ পেয়েছি, সে স্পর্শ লেগে আছে আমার অধরে। কলকাতাকে আর যদি ফিরে না পাই তাতেও দুঃখ নেই। যা পেয়েছি সেই ঢের তাতেই মন ভরে আছে। নাটোরের বনলতা সেন যা দিতে পারত না কলকাতা তাই দিয়েছে। কেমন করে ভুলব—আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল মির্জাপুরে ফ্যাব্‌রিট কেবিন!

'শারদীয়া দেশ পত্রিকা'। ১৩৬১

হ ট্ট শ্রী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হট্টশ্রী কথাটি আমারই মনের একটা মোলায়েম প্রচেষ্টা মাত্র।

সাধারণ ব্যবহারে আমরা হাট-বাজারেরই উল্লেখ ক'রে থাকি। আর সে হাট-বাজারে না আছে শ্রী, না আছে ছাঁদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়া যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক কদর্যতাকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত ক'রে দেয়। আগেকার দিনের হট্টের মধ্যে যেটুকু শ্রী ছিল, সেটুকু আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু গোল। কেন এই রূপান্তর হয়েছে, কথাটা বলি।

'হাটে-বাজারে' কথাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন ক'রে ফেলেছি যে ওর সঙ্গে বীমা আর ছালা আর থলের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ঠ অন্বয়, ভনভনে মাছি এবং পচা ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ। কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে আসে একটা অনৈক্যতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাটখারার মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদরির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তীক্ষ্ণ প্রয়াস—এবং সর্বোপরি মাছের আঁসটে জল, ডাবের খোলা এবং কলার খোসার স্তূপীকৃত আবর্জনা বাঁচিয়ে কনুই ঠেলে পিছল পথে অগ্রসর হওয়ার করুণ চিত্র। এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী রকমের পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, সেই দুস্থ মনোভাবকে আমরা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চাই। সাহিত্যে তো নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচিকর এবং গ্লানিকর।

তাই যে-সব নাগরিক গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য বিড়ম্বনা এবং তারই আনুষঙ্গিক বাস্তব পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁরা আশ্রিত আত্মীয়-অনাত্মীয়, অভাবে ঠাকুর-চাকরদের হাতে দোকান বাজারের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজেই মনোনিবেশ করেন। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে তাঁরা গঞ্জনা শোনেন মাত্র, কিন্তু সংসারের ক্লান্তিকর ঝামেলা থেকে তাঁরা একরকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর সংসারের যাবতীয় কাজ ঘাড়ে আপনি এসে চেপে বসবে। তাই মেরুদণ্ডহীন হয়েও মেরুদণ্ড সোজা রাখা একটা

বিশিষ্ট শিল্প। আমি এই শিল্পসাধনা ক'রে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর আমাকে এখন কোনো কাজ করতে অনুরোধ জানায় না, পাছে সব ভণ্ডুল ক'রে দিই। চক্ষুস্মান্ ব্যক্তি হলেই হয় না, চক্ষুর স্তিমিত এবং মুদ্রিত ব্যবহার আত্মশান্তির পক্ষে অপরিহার্য। তা ছাড়া, প্রত্যেক ঘরেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, নিঃশব্দ পরোপকারের চেয়ে সঘোষ শিক্ষা-দানেই যাঁর পারমার্থিক আনন্দ। ভেবে দেখুন, ঘরে যদি ছোটোমামা, সেজকাকা অথবা মেজোপিসেমশাইয়ের অযাচিত অকৃপণ সাহায্য সুলভ হয়, তা হ'লে কোন্ ভদ্রসন্তান সকালে দ্বিতীয় দফা চা-পানান্তে বেলা ন'টা পর্যন্ত কিছুই না ক'রে বিশুদ্ধ স্ফূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে না ওঠেন? নিদেনপক্ষে, সর্বকর্মপটীয়সী গৃহিণী তো আছেন। তা হ'লে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আপনি যথাসময়ে কর্মস্থলে প্রেরিত হয়েছেন।

কিন্তু যাঁরা নিরুপায়. নিঃসহায় এবং নিরভিভাবক, তাঁদেরই সহ্য করতে হয় হাট-বাজার করার প্রাণান্ত দুর্ভোগ। তাঁদের কাছে হাট-বাজারের অর্থই হল একটা বিশ্রী রকমের দৈনন্দিন দায়িত্ব, যেটা উদরের ইন্ধনস্বরূপ হলেও রসনায় ঠিক রস সঞ্চার করে না। যাঁদের বাজারে বেরবার দরকার করে না অথবা প্রথম দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যাঁরা সরকার দারোয়ান নিয়ে মোটরে মার্কেটে গিয়ে আপনারই হাতে-গড়া আভিজাত্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁদের দৃষ্টিটা হল স্বতন্ত্র, দুনিয়ার উপর অনুকম্পার দৃষ্টি। আর যাঁরা দুই দলের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ফরমায়েসমতো সৌখিন 'শপিং' করেন আবার প্রয়োজন হলে ঝি-চাকর-পালানোর দুর্দিনে সন্ধ্যায় কাঁচা সবজির বাজার সেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি না কামিয়েই মাছের পাত্রটা হাতে ক'রে বাজারে ছুটতেও তেমন দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁদের মনোভাবটা হ'ল খাঁটি মধ্যবিত্তের—অর্থাৎ কিছুটা বিব্রত, কিছুটা নির্বিকার, খানিক বিরক্তির, খানিক কৌতুকের। হরেক রকম ঝক্‌মারির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হলেও, এঁদের চোখে থাকে তির্যক্ সহিষ্ণুতা, মনটাও থাকে জাগ্রত। তাই এঁরা দেখেন ও শেখেন বেশি।

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নয়। হাটে-বাজারে নিত্য চলন্ত আর জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্য ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে ওঠে। যাঁরা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁরা তো এই হট্ট-লব্ধ মানব-চরিত্রজ্ঞানকেই মূলধন হিসেবে ব্যবহার করেন। আর যারা রচনাকুশলী, হট্টশ্রীতে আস্থাবান. তাঁদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তো

মিলবে এইখানেই। হট্টমনের বিচিত্র স্পন্দন যাঁরা ঠিকমতো ধরতে পারেন, তাঁরাই তো সত্যিকারের জননায়ক। আর যাঁরা নিখিল হট্টমন্দিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁরাই তো নির্জাতিক যাযাবর, খাঁটি মুসাফির।

বর্তমান হাটের চরিত্রে ও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের এটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পণ্যই যখন মুখ্য, মানুষ তখন গৌণ। রূঢ় দ্রব্য যখন কারু-পণ্যে পরিবর্তিত হয়, হট্টশ্রী তখন রূপান্তরিত হয় বিপণি-সজ্জায়। তাই হাট-বাজার আর দোকান-পসারের মধ্যে আছে অনেকটা পার্থক্য। প্রথমটায় আছে গতির আভাস, দ্বিতীয়টিতে স্থিতির। একটি হ'ল যাযাবর মানুষের ও মনের প্রতীক; অপরটি হ'ল স্থানু, নিশ্চিত ও নিরাপদ মনের পরিচয়। একটিতে পাই ধুলো আর মাটি আর খোলা আকাশ; অপরটিতে গদি অথবা কেদারা এবং বিজলি পাখা। শতবার হাটে ঘুরে বেড়ালেও তাকে আমরা বাঁধতে পারি না, আয়ত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে। কিন্তু দোকানকে আঁকড়ে রাখি তালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর 'নিয়ন' লাইট দিয়ে। হাট যখন ভাঙে, গোধূলির আলোয় তার ভাঙা চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিস্তব্ধ প্রান্তরে বট-পাকুরের শাখায় বাদুড়ের কিচিমিচি, জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শূন্য গুড়ের কলসীগুলোর গড়াগড়ি, আলকাতরা-মাখানো জীর্ণ দু-একটি দরজায় বাতাসের অদ্ভূত আওয়াজ আর ঘনায়মান অন্ধকারে উপুড়-করা কালো কালো মেটে হাঁড়িগুলো এমন একটি অতিনৈসর্গিক রিক্ততার ছবি ফুটিয়ে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহরের নির্জনতম পথে বন্ধ দোকান-পাটের গায়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা শুধু প্রকৃতি-পটভূমির গুণ নয়, দ্রব্যেরই গুণ। হাট যতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোষণা। আবার মৃত্যু যখন নামে, সম্পূর্ণ তার পরিসমাপ্তি—নিরন্ধ্রতার অবলুপ্তির অন্ধকার। দোকান-পাট কিন্তু মরেও মরে না তাদের চেহারা ভয়াবহ রকমের নিঃস্ব লাগে না। তারা মূর্ছিত মাত্র; নাগরিক জীবনের স্তিমিত ধারায় তারা ঝিমিয়ে থাকে। একটিতে রয়েছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার জটিল ছাপ।

দু-জায়গাতেই অবশ্য দরাদরি চলে। কিন্তু যে মানুষ হাটে গিয়ে ঝিঙের দর আগুন বলে ফড়েকে হুমকি দেয় কিংবা মেছুনিকে সোনার নিক্তিতে ওজন করতে দেখে ঝাঁ ক'রে দুটো কুচোচিংড়ি থলের মধ্যে পুরে নেয়, সেই ব্যক্তিই দোকানে গিয়ে বাঁধা দরের অতিরিক্ত সেলামি দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আদ্দির থান অথবা বিলিতি সিগরেট। রসিদ চাইবার দরকারও বোধ

ক'রে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম কষা-কষি চলে, কিন্তু দু-এক পয়সা নিয়ে অভব্যতা কিংবা হট্টগোলের সৃষ্টি খুব কমই হয়ে থাকে। তা ছাড়া হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচয় মানুষের মুখে আর সবুজের ডালায়,—চাষীদের স্বেদসিক্ত পেশীবহুল দেহে আর নধর আনাজের শ্যাম-শোভায়। সেখানে ছড়ানো থাকে পসরা, চলে বেসাতি। দোকানে মজুত থাকে মাল। নিখুঁতভাবে সাজানো থাকে প্রসাধনের ডালি। সেখানে কোলাহল নেই, কিন্তু অন্তরঙ্গতার অভাব। হাটে গেলে আমরা হাঁটি, ভদ্র-অভদ্র-নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে নিছক ঘুরে বেড়াই। গণতান্ত্রিক বিচরণের ফাঁকে অবসর-মতো জিনিস দেখি, দর শুনি, যাচাই করি। তারপর মনের মতন সওদা না পেয়ে হয়তো শুধু হাতেই ঘরে ফিরি। দোকানে কিন্তু জিনিস কিনতে এসে আমরা ভদ্রমাফিক কায়দায় কথা বলি, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাঁচের পাল্লায় দেখি নিজেদেরই লোলুপ প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টি। দরদস্তুর একটু আধটু করি বটে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আর কিছু না কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি না। তা'হলে স্বল্পায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের বিস্তৃত সাদৃশ্যের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

এ কাজ বরঞ্চ পারেন এবং দু' একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেয়েরা। দোকানদার হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনো মহিলার সামনে। কিন্তু কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। কাঁচা সেলসম্যান মরিয়া হয়ে এটা পাড়ছে, ওটা দেখাচ্ছে আর মনোরঞ্জনের আশায় অজস্র বাক্য ব্যয় করছে। কিন্তু খদ্দেরের অন্যমনস্ক চোখে কোনো রঙই ধরছে না। অবশেষে স্তূপাকার জিনিস পাড়িয়ে নাড়াচাড়া ক'রে একটা বেছে নিয়ে বললেনঃ "এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই, নতুন ধরনের? দামটাও সস্তা মনে হচ্ছে যেন—কী জানি খেলো জিনিস ব্যবহার করিনি তো কখনো।" হল অ্যান্ড অ্যান্ডার্সনে অ্যাকাউণ্ট আছে জেনে আর সেজো ভাইয়ের পিস্‌শ্বশুর হাইকোর্টের জজ শুনে সেলসম্যান যখন অভিভূতপ্রায়, তখন অনুকম্পার হাসি হেসে হয়তো মহিলাটি বলে ওঠেনঃ "দিন ঐটেই। কি আর করা যাবে! সরেস জিনিস কিন্তু স্টক করবেন এবার থেকে। নজরের কাছে দামের প্রশ্ন কিসের?"

তারপর ক্যাশ-মেমো যখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগটা সশব্দে বন্ধ করে তিনি ঝাঁঝিয়ে ওঠেনঃ "আবার সেল ট্যাক্স ধরছেন কেন?

এই তো জিনিস আর এই দোকানের ছিরি......!" বলেই অত্যন্ত বিরক্তি-ভরে বেরিয়ে যান।

কাউণ্টারের পিছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেনঃ "তুমিও যেমন ছোকরা! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্যা......"

তরুণ সেলসম্যান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো সরিয়ে গুছিয়ে রাখে। পুরুষ খরিদ্দার হলে ব্যাপারটা কী রকম অপ্রীতিকর দাঁড়াত, তাই ভেবে শিহরিত হই আর মহিলাটির নিপুণ দুঃসাহসে চমৎকৃত হই।

পুরুষরাও কিছু বাদ যান না। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়ে থাকে। মেয়েদের যেমন নিজস্ব ডিপার্টমেণ্ট আছে—শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেখি তাঁদের নিত্য আনাগোনা, পুরুষদেরও তেমনি স্বকীয় বিভাগ আছে—যেমন জামাকাপড়, জুতো, বই, সিগরেট্ কিংবা মনোহারী দোকান। সেখানে দেখি তাঁদের দরদস্তুর করবার ক্ষমতা এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে লম্বা বিলের পাওনা না মিটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য।

কিন্তু সে কথা থাক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার দ্রুত পরি-বর্তনের ফলে হাটের হট্টচরিত্র ঘুচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর ঝাঁপলাগানো দোকান রূপান্তরিত হয়েছে কোল্যাপসিবল্-গেট-দেওয়া ফ্যাশনেবল মার্ট বা মার্কেটে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শপিং-এর ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষের এলাকা আর পৃথকভাবে চিহ্নিত নেই। প্রৌঢ়া মহিলারা সন্ধ্যার পর অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন। বেশভূষাটা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভদ্র এবং মার্জিত, এই যা তফাৎ। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মুলো আলু পটল আর লাউ কুমড়ো এবং বোঝার উপর শাকের আঁটি বয়ে বেড়ায়। একটি পয়সাও দস্তুরি বাবদ ট্যাঁকে যেতে পায় না। অবিশ্যি এক হিসেবে এ ব্যবস্থা ভালোই বলতে হবে। কী দিয়েই বা সকালের রান্না আর কোন্ কোন্ তরকারি রাতের বরাদ্দ, পুরুষদের আর মেয়েদের জন্য কী রান্না আলাদা হবে বা হওয়া উচিত, কোন্ অনুপানের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ ব্যঞ্জনের উপকরণ নেওয়া যায়, এটা মেয়েরাই তো বেশি বোঝেন। প্লানিং-এর অঙ্গ-স্বরূপ ছকটা তাঁদেরই হাতে। তা ছাড়া, লাউ রান্না হবে আমিষ বা নিরামিষ, আমিষ হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা কাঁকড়া সহযোগে, এ-সব কথা পুরুষেরা কী করে

জানবেন? তাঁরা জানবেন হাটের দর, রাখেন হাটের খবর। কিংবা ছোটো বৌ ট্যাংরা মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, বড়ো গিন্নি শিম-বেগুন-বড়িভাতে খেতে ভালোবাসেন, আর সেজদি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাঁকড়া ছোঁন না—এত গুহ্য ঘরের খবর মনে রাখবেন কী ক'রে?

তা ছাড়া, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি মেয়েরা সত্যিই হাট-বাজার করেন ভালো। বাজে পয়সা নষ্ট না ক'রে একসঙ্গে অনেক সবজি না কিনে এবং সংসারের সাশ্রয় ক'রে তাঁরা যেমন পরিপাটি বাজার করেন, পুরুষরা তেমন পারেন না। পুরুষ বাজারে যান আসেন যন্ত্রের মতো। একই সজনের ডাঁটা অথবা থোড়-বড়ি কিনে নিয়ে রোজই বাড়ি ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই। নারী চলেন ধীরে মন্থরে। পাঁচটা জিনিস দেখেন-শোনেন, যে পটলওয়ালা ডাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান, দর করেন, মনে মনে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তো বলেন ঃ "এই পটল বাছাই করে দিলুম। সাত আনার বেশি সের দেব না—আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্তু। তোলো পাঁচ পো।" 'পাষাণ ঠিক আছে মা', বলতে গিয়ে পটলওয়ালা গৃহিণী-সুলভ ভ্রূকুটির এমন ধমক খায়, যে সেই নির্মম পাষাণদৃষ্টির সামনে নতমুখে পাল্লা ফিরিয়ে ওজন না ক'রে সে পথ পায় না। দাম নেবার সময় দেওয়া হল ন' আনা। বাকি পয়সাটা ফেরৎ না নিয়ে তিনি পাশের ডালাখানির দিকে ইঙ্গিত করবামাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি এক মুঠো কাঁচা লঙ্কা তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হয়তো মনঃপুত হল না—যদিও তাতে জন পাঁচেক বলিষ্ঠ পুরুষের পাকস্থলী অনায়াসেই জর্জরিত হয়ে যেতে পারে।

যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাজার করে থাকেন, তাঁরা সব্জী কিনতে গিয়ে এক-আধ পয়সা বাঁচানো কিংবা অযথা সময় নষ্ট করা ভালোবাসেন না। তাঁদের নজরটা মাছমাংস এবং ফল-মূলের ওপরই যেন বেশি। অনেক বাড়িতেই অবসরপ্রাপ্ত কর্তা-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজ-কালকার ছেলেছোকরাদের সাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর তাঁদের প্রচুর অবজ্ঞা। নিত্য বাজার এঁরা নিজ হাতেই ক'রে থাকেন। সে ভারটি আর কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস ক'রে ছাড়তে পারেন না। পচা ভাদ্দরে বেশি রোদ্দুর লাগলে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে বলে তাঁরই শরীরের খাতিরে দাপট-যুক্তা গৃহিণী যদি বাজারে বেরুতে তাঁকে কোনোদিন অনুমতি না দেন, তা'হলে সারাটা দিন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে আর

সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু দুধ খেয়েই শুয়ে পড়েন।

বাজার করার মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তিনি সেই রকম জিনিস কিনে থাকেন। অর্থাৎ যাঁর অগ্নিমান্দ্যের প্রকোপ এবং বায়ুপ্রধান ধাত, তিনি নিত্যই কাঁচা পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা এবং সরু জিয়ল মাছ কেনেন। আর যাঁর স্বাস্থ্য ভালো, হজমশক্তি-অটুট, তিনি পোস্ত এঁচড়, ডিম মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতি। কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিয়ে বাজার করেন, অধিকন্তু ফেরবার পথে মোড়ের পানের দোকান থেকে গৃহিণীর জন্য পান আর আচারটুকু নিতে ভোলেন না। কেউ বা আবার একটু বে-হিসাবি, লুকিয়ে পকেট থেকে ডেফিসিট পুষিয়ে দেন। সতেরো সিকের ভোম্বল-মার্কা কাৎলাটাকে হাসি-হাসি মুখে সতেরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে। সস্তায় মাছ কেনার কৃতিত্বে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তাঁর মন তখন খাবি খাচ্ছে। এই কম দামে জিনিস পাওয়া আর আড়ৎ থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভদ্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এরই আকর্ষণে শ্যাম-পুকুর থেকে বাঁড়ুজ্যে মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়বাজারের দরে ঝাড়াই মসলা, ডাল, সুপারি আর বালতি-কড়াই কিনতে। ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাড়ি দেন বেলগেছের খালধারে চূণ আর ভূষি মাল খরিদ করার জন্যে, আর চাঁপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাতকাটা ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেঁধে ধাওয়া করেন চেৎলার হাটে মশারির থান, বিচুলি, সরু চিঁড়ে আর বঁড়শির শক্ত সুতোর সন্ধানে। বালিগঞ্জ কিংবা রীজেণ্টস্ পার্কের মিঃ বাসুকেও কখনও কখনও ছুটতে হয় বৈকি ঘরোয়া তাগিদে হাওড়ার হাটে সস্তায় গামছা এবং তাঁতের রকমারি শাড়ির নতুন নতুন পাড়ের আশায়।

আজকাল দেখতে পাই—মেয়েরা যাচ্ছেন সব্জির বাজারে, মাংসের স্টলে, কিংবা জামাকাপড়ের দোকানে পুরুষদের জন্য শার্ট স্যুটের বায়না দিতে। পুরুষরা যাচ্ছেন শাড়ি, গহনা কিংবা ক্রকারি কিনতে। কখনও একলা, কখনও যুগলমূর্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দোকানে গিয়ে একটু বসবার সুযোগ সুবিধা থাকে, দেখবেন নজর ক'রে ঈশ্বরের কী বিচিত্র সৃষ্টি! কত হরেক রকমের 'টাইপ' ও 'ক্যারেকটার' আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের ভিন্নমুখী প্রকাশ

নিত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। কত স্বার্থপরতা, লোল্বপতা, প্রবঞ্চনা আবার ভদ্রতা ও সততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে হাট-বাজারে, দোকান-পসারে। দোকানে ঢ্বকে দাঁড়ানো আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই আপনি সেই মান্বষটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাজ, ম্বদ্রাদোষ প্রভৃতি দ্বর্বলতা অন্বমান করতে পারেন। কত পারিবারিক সংবাদ, এমন কি অনেক গোপন তথ্য পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে অন্বচ্চ কণ্ঠে দ্বই খরিদ্দারের আলাপ-স্বত্রে। এক কাঠিম স্বতো কিনতে গিয়ে বাজারে শ্বনতে পাবেন অনেক কিছ্ব, চোখ খ্বলে রাখলে দেখতে পাবেন তারও বেশি। স্থানীয় পাঠাগার ও চায়ের দোকান থেকে শ্বর্ব ক'রে পাড়ার মাতব্বরদের সমালোচনা, রেস এবং ফ্বটবল খেলা, স্বদেশের ম্বদ্রাস্ফীতি ও বিদেশের গ্বঢ় রাজনীতি পর্যন্ত অনেক কিছ্বই আলোচিত হয়ে থাকে বেশ তারস্বরেই। স্ত্রী প্বর্বষের কত বিভিন্ন ধরনের হাসি বা চলার ভঙ্গি, কত লাস্যলীলা, কত ম্বর্খ গাম্ভীর্য, অসহিষ্ণ্বতা, চতুরতা অথবা চট্বলতার নম্বনা পাওয়া যায় প্রকাশ্যভাবে। তাই হাট-বাজারে ঘ্বরে বেড়ানো কিছ্ব পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবনযাত্রার দৃশ্যমান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে নাকি, খানিকটা মজার, খানিকটা ভেবে দেখবার?

হাট কথাটারই মধ্যে রয়েছে এমনি একটি স্থ্বল বাস্তবের স্পর্শ যে, আমরা একে এড়িয়ে যেতে চাই। ওর মধ্যে আছে অবিশ্বাস্য গ্বজব আর উড়ো খবর, দাঁও কষা কিংবা লাটে ওঠা—অর্থাৎ বণিক-বৃত্তির অপ্রীতিকর অংশটা। এক কথায় ওর মধ্যে দিয়ে যেন ফ্বটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের যাবতীয় গ্লানি আর কায়ক্লেশ জীবিকার যত-কিছ্ব জটিলতা এবং অসহায়তা। কিন্তু হাট জিনিসটা কি সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অন্বকম্পারই উদ্রেক করে, আর কিছ্ব নয় ? ওর মধ্যে কি কোনো ঐতিহ্যের স্মৃতি নেই ?

এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ ক'রে দেখ্বন। প্রাচীন হিন্দ্ব য্বগ থেকে ম্বসলমান আমল পর্যন্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত আমদানি আর রপ্তানি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো গঞ্জ, শহর এবং বন্দরগ্বলিতে। উজ্জয়িনী, স্বর্পারক, ভৃগ্বকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত, পাটলিপ্বত্র, মথ্বরা, বৈশালী, যারা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দ্ব ও বৌদ্ধ য্বগের বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্রগ্বলিতে কিসের আদান-প্রদান চলেছিল? রোম্যান স্বর্ণ-ম্বদ্রার বিনিময়ে কাদের বৈশ্যবৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন

করেছিল? কাদের সঞ্চয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য এবং শিল্পকীর্তি? মধ্যযুগে আরব বণিকরা পৃথিবীর হাটে ঘুরে ঘুরে কোন্ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল? আর দিল্লী আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের বিদেশী বণিকদল কী রোমান্সের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত? য়ুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা যখন বর্ম এঁটে খৃষ্টান তীর্থত্রাণে স্থলপথে অভিযান শুরু করতেন, পথে রসদ যোগাত কারা? য়ুরোপের হাটে-মাঠে-মেলায় কোন্ সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল? বাণিজ্যকেন্দ্র নগরগুলি কেমন করে বড় আর স্বাধীন হয়ে মধ্যযুগের শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারে সহায় হয়েছিল? মধ্য জার্মানি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে. দক্ষিণ ফ্রান্সের আঙুর-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্য-মেলায় কোন্ কাব্য-নাট্য-সংগীতের উৎস খুলে গিয়েছিল? আমাদেরও গ্রামের হাটে আর মেলায় যে-সব লোক-শিল্প-সংগীতের নমুনা পাওয়া যেত, সেগুলির পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্য? ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে একদিন যে বিরাট বাণিজ্যের বসতি ছিল, শ্রীহট্ট নামটি কি তারই স্মৃতি বহন ক'রে আজও কমলা-মধু, আনারস, নানাবিধ আনাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চূণ, সুগন্ধ মসলাপাতি এবং বড় বড় সুপারির ছালা সুরমা নদী দিয়ে রপ্তানির কারবার চালায়? কৈশোরে একবার সাতক্ষীরা অঞ্চলে বড়দলের হাট দেখেছিলুম। নোনা গাঙের মধ্যে জলে-ভাসা দ্বীপের মতন ঘিঞ্জি জায়গায় সেই বিপুল হাটের দৃশ্য-স্মৃতি আমার মনে আজও যেমন অম্লান, রাজরোপ্পার পথে ছোট্ট একটু ঢালু জমিতে আদিবাসীদের অকিঞ্চিৎকর হাটের চঞ্চল আয়োজন-টুকু বড় বয়সেও তেমনি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

হাটের অর্থই হল বাহুল্য—যে বাহুল্য আসে তার অনিশ্চিত অস্তিত্ব থেকে। কোন-এক অনির্দিষ্ট দিনে অনেক দ্রব্য, অনেক মানুষের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের বা কয়েকদিনের জন্য। তারপর হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যায়। এই নিঃশেষিত অস্তিত্বের কিছুটা রং লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি নৌকার জীর্ণ পালে, ঘরে-ফেরা হাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপ, প্রতীক্ষমাণ চোখের ম্লান দৃষ্টিতে। তাই মনে হয়, হাট বোধ হয় শুধু মরা নদীর একটুখানি চলাচলের স্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্যবৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা আদান-প্রদানের ধূলিমলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সূক্ষ্ম দৃষ্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার একটুখানি অবকাশ। তা যদি না হত, তাহলে একাধিক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে হট্টশ্রী তার স্থূলতার

আবরণ সরিয়ে, একটা কিছু সার বস্তুর সন্ধানে তাঁদের এতটা আকৃষ্ট করত না। আর এই বিশাল জগৎ একটি বিপুল হট্টমন্দিরের মতন প্রতিভাত হয়ে, তার বিচিত্র পসরা আর বেচা-কেনার বহু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মারফত একটি বৃহত্তর অখণ্ড সত্যরূপের পরিচয় তাঁদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা হাটকে কোমল হট্টশ্রীতে মণ্ডিত ক'রে যদি না-ও দেখি, তবু তার মধ্যে যে সহজ কৌতুক, রসগ্রহণ, শিল্পবোধ এবং বাস্তবজ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করবার সুযোগ পাওয়া যায়, সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

"ঝাঝরি"। বঙ্গাব্দ ১৩৬০

ম ধু মা লা র দে শ

সুবোধ ঘোষ

"স্বপ্নে দেখেছি আমি মধুমালার দেশ।"

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছন্দোবন্ধ গীতগ্রন্থ সম্মুখে রয়েছে সারি সারি। পাতা উল্টিয়ে পড়ি, আবৃত্তি করি। বিচিত্র কল্পনা, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বৈভবে মন আত্মহারা হয়। বাস্তবতার শাসন দীর্ণ করে মন যেন অরূপ-লোকে উত্তীর্ণ হয়। কল্প কল্পান্তরের আবেগ শরীরী হয়ে সম্মুখে আসে। যা অনির্বচনীয়, যা অধ্যেয়, তাই যেন প্রত্যক্ষের আনাচে-কানাচে মুখর হয়ে ওঠে, বর্ণভূষা সৃষ্টি করে। যে কবিতাই পড়া যাক্ না কেন, যদি সেটা সত্যি সত্যিই কবিতা হয়, তবে তার মধ্যে এমন কোনো গুণ থাকবে যার আবেদন শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির উপর পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য তাকে লাভ করতেই হবে, যার প্রসাদে একটা রূপের আশ্রয় পাওয়া যায়। বস্তু ও ভাব পরিবেশন করেই শুধু কাব্য ও শিল্পের কর্তব্য শেষ হয় না। সমস্ত ছাড়িয়ে পোঁছতে হবে রূপে। ভাব ভাষা ছন্দ ও বিষয়, সব কিছুই লুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরের মত এই বাঞ্ছিত রূপের মুদ্রিত পদ্মটির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প, কাব্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য—সবারই লক্ষ্য এই রূপ। রসিক পাঠককে যে শিল্প ও সাহিত্য এই রূপলোকে হাত ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, সে কাব্য কাব্য নয়, সে কথা কথা নয়।

তাই নতুন যুগের কাব্য সাহিত্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্বপ্নে দেখি মধুমালার দেশ। জ্যোৎস্নারাতের বনান্ত দেশের মতো সেই আমাদের রূপকথার জগৎ, যে জগতের রূপ ছেলেবেলা থেকে প্রত্যেক শিশু শ্রুতিধরের মতো শুনে শুনে নিজের কল্পনার সিন্দুক পূর্ণ করেছে, বড়ো হয়ে সঁপে দিয়েছে শিশু উত্তরপুরুষের কাছে। বিনা অক্ষরে বিনা পুঁজিতে এই রূপকথা কত পুরুষ ধরে আমাদের মানসলোকে প্রবাহিত হয়ে আসছে জানি না। রূপকথার এই প্রাণশক্তির, এর অফুরান ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষ সভ্য হচ্ছে, জ্ঞানী হচ্ছে, অনুশীলন ও বিশ্লেষণে নিপুণ হচ্ছে, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে ঝাড়া দিয়ে

পুরাতন নির্মোকের মতো ফেলে দিচ্ছে। আজকের সাহিত্য কাল অচল হয়ে যায়। কত পুরাণ, মহাকাব্য ও গীতিকা সাগর লহরী সমান জনমি পুনঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। কত শাস্ত্র, নীতিকথা, দোঁহা, স্তোত্র ও মন্ত্র সাধক ও কবির মুখে রচিত হলো, দেশ বা জাতির সমাজ ও সম্প্রদায়বিশেষে তার স্থান হলো। কিন্তু কত দিন? কটা যুগ শেষ না হতেই তা মিলিয়ে গেল জলের তিলকের মতো। কত ছান্দসিক ও বৈয়াকরণিক কত কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছে, সুসংস্কৃত করেছে, কিন্তু মহাকালের পরীক্ষায় তা লোকময় হয়ে টিকে থাকতে পারে নি। যদি কেউ বলেন, কবি কালিদাস অমর, সে কথা সত্য বলে স্বীকার করতে পারবো না। কালিদাসকে ক'বছরের মধ্যেই মেরে ফেলা যায় যদি অক্ষর ও লিপি অর্থাৎ লিখনকলাকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। কালিদাসের অমরতার মন্দির দাঁড়িয়ে আছে কাগজে কলমে লেখা কাব্যগ্রন্থের ভূমির ওপর। সে ভিত্তি যদি ভাঙে, তবে কালিদাসের কাব্যের অমরতাও ভাঙবে। অন্যপক্ষে দেখি, আমাদের রূপ-কথা সাহিত্যের এই অস্থূল প্রাণাশ্রয়ী ও লোকোত্তর শক্তি। সে কথার রূপ প্রখর জ্যোতিষ্কের মতো কালের আকাশে বিনা নির্ভরে ভেসে আসছে যুগ যুগ ধরে।

প্রথম নিঃশ্বাসের মতো প্রত্যেক শিশু এই রূপকথার প্রসাদ গ্রহণ করে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। সমস্ত জীবনে তাকে সে আর ঠেলতে পারে না। তাই মধুমালার দেশ স্বপ্নে আজও দেখা দেবে; তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

কারা ছিল সেই কথাকার? কথাকে এত রূপ দিয়েছিল কোন্ কবি? কে তাদের নাম জানে? কোথায় তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল এই স্বপ্নচ্ছবি? এই অপূর্ব অদ্ভুত পুরাতন মেঘদূতের মহিমা আজও অম্লান।

সাত ভাই চম্পা জাগো রে! পারুল দিদির ডাকে সাড়া দাও। রাজার মালী ফুল তুলতে এসেছে। দিও না দিও না ফুল। রাজা এসেছে, চলে যাক। সুয়োরাণী এসেছে। চলে যাক। এবার এল দুয়োরাণী দুঃখিনী; সাত ভাই আর বোনের মা। সাতটি চাঁপা ও পারুল ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে।

রূপকথার এ আলেখ্য যে রচেছিল সেই অজ্ঞাত শিল্পীর প্রতিভাকে আজ প্রণতি জানাই। জানি অতি দূর বিস্মৃত দিবসের এই কবিগুরু আজ কোনো স্মৃতিপটে নেই, কোনো নির্মাল্যময় অর্ঘ্য সেখানে পড়ে না। তবে জানি কবিতা কল্পনা ও কথার সাহিত্যে এত বড়ো সৃষ্টির তুলনা খুবই বিরল।

মধুমালার দেশে যে কল্পনার ফসল একদিন ফলেছিল তারই প্রসাদ আজও আমরা অকাতরে গ্রহণ করে কথাকে রূপদান করি। 'সোনার কাঠি' ও 'রূপোর কাঠি'র রূপ যাদের কবিত্বের ইন্দ্রজালে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাঁরা কি 'গেঁয়ো' কবি ছিলেন। সে সোনার কাঠি শত যুগের শত রুচিবিপ্লব উত্তীর্ণ হয়ে আজও ক্লাসিক গরিমায় প্রতিষ্ঠ রয়েছে।

পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, পক্ষীরাজ আর সাপের মণি—এ রূপকথার জগৎ কাদের সৃষ্টি? মনে হয়, কোনো প্রলয়ে সে জগৎ বুঝি নষ্ট হবে না কোনো দিন। উপনিষদের জীবাত্মা আর পরমাত্মারূপী দুই পাখির কথা পণ্ডিতেরাই বোঝে, সহস্র বৎসর পরে পণ্ডিতেরা হয় তো তাও ভুলে যাবে, কিন্তু রূপকথার দেশে বেঙগমা-বেঙগমী গাছের ডালে বসে যে আলাপ করে গেল, তার গুঞ্জরণ অনাহত ছন্দে এখনও বেজে চলেছে—রূপগ্রাহী মানুষের স্মরণের মধ্যে।

তাই মনে হয়, শিল্প ও সাহিত্যে আমরা একান্তমনে খুঁজছি শুধু এই একটি জিনিস—রূপ। সাহিত্যকে রিপোর্ট না হয়ে রূপকথা হতে হবে। আমরা দেখতে চাই আমাদের যুগের বেদনা আনন্দ ও সংগ্রাম শুধু ভাষা ও ছন্দের জোরে মুখর হবে না, শুধু ভাবের ভারে ঋজু হবে না। তাকে রূপময় হতে হবে।

"কালপুরুষের সাতপাঁচ"। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪১

প ত্র সা হি ত্য

যাযাবর

পারস্যদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক—বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিত্তহীন এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছলে শুক্তি আহরণ করতো প্রতিদিন। জানতো না, তার মধ্যে ছিল লক্ষ হীরা মানিক। সে-মানিক যার ঘরে আসে তাকে রাজা করে; যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির। অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজীর বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিন-ব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে একদিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন। নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজীর দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মীনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজীর নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটল তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অসামান্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়। সত্যিকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রীতিপ্রদ বলেই সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কাররূপেই গণ্য করি; প্রসন্ন ভাগ্যদেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোনো উচ্চাভিলাষ কোনোকালে আমার কল্পনায় ছিল না। অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে-প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্মের প্রয়োজনে আমি দিল্লী এসেছিলেম। সে অনেকদিন

আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কৌতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ক অভিজ্ঞতার অন্তরালে তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায়নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেল, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুখর হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভ কালে আর্যাবর্তের এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্বদেশেই কাব্য উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেগুলির খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্যে নয়, সাহিত্যিকের রচনা নৈপুণ্যে। হারুন্-অল্ রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভূগোলের সম্পর্ক সামান্য। তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী-কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে। যে উজ্জয়িণীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদ বধূরা প্রবাসী প্রিয়-জনের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে যে-পূর্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার পরিক্রমণ-পথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে-কথা কালিদাস বলেননি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতি-আধুনিক দার্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন। কিন্তু দিল্লী-পথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায়নি, যদিও বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীকে জনশূন্য ক্যালকাটা রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাতো বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গৌরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজার রাজধানী নয়, বহু রাজত্বের শ্মশান ও সূতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচিতি প্রসারণ করেছে, তার মধ্যে বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দা-বনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের

মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনা স্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রান্তরে, দুর্গপ্রাকার ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধমালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে।

কিন্তু দর্শনের যে-রস. সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষু-দ্বারা দেখি—এ কথা বাল্যকালে বিদ্যারম্ভের প্রথম পর্বে পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ তথ্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই সে তো দেখা নয়,—তাকানো।

দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, দুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অর্ধেক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এইজন্যেই স্টেথেস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবান্ধবে।

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং জেনেছিও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যাঁর সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে উঠে. তিনি ছিলেন অন্যত্র। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাব, আমার মনে এই অভিলাষ ছিল। সে-কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর-দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ-যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছতে পারবে না, মধ্যপথেই কোনো সুনিপুণ পাচকের হস্তে সুপক্ব ব্যঞ্জনে ভোজনরসিকগণের রসনাতৃপ্তির সহায়ক হবে। বর্তমানের মরালগামিণীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উর্দিপরা সরকারী ডাক-হরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং স্ফীতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিসটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাকে বহুবচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদুষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দুটি মাত্র প্রাণীর গঙ্গাবিহরণের ছোট্ট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহুজনের নদী পারাপারের জন্যে পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়।

দিল্লীর রৌদ্রদগ্ধ আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশ ক্ষেত্রে যে

প্রচুর পত্রশস্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটি মাত্র গৃহিণীর ভাণ্ডারে মরাই ভরে রইবে, এই ছিল কামনা। কোনো দিন কোনো কারণে সরকারী সিভিল সাপ্লাইর গুদামে সেগুলি সর্বসাধারণের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাঁকে লেখা, তাঁর কোমল কর-যুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবলেপনের দ্বারা সর্বাঙ্গ ছাপাখানার মসীলিপ্ত হয়ে সাহিত্যের বিচারশালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাট্য সাক্ষরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে। যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপন্যাসের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধূর অনুচ্চকণ্ঠে গীত সংগীতের মতো. নির্জন শয়নকক্ষে একমাত্র দয়িতের কাছেই তার প্রকাশ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও দুর্গতি, অন্যেরও দুর্ভোগ। কারণ, বঁধুর কানে যা কলস্বর, বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগাণ্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্র-সংকলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধ সংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামেও সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণত দুটি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের দুটি বিভিন্নরূপ প্রকাশ পায়। কাব্যজীবনের বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্তমান, একশ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা পরিচিত, সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্র-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা রীতি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফর্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গৌণ, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—রোমানফের গল্প। তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা—লেটারর্স টু দি শেরিফ অব ব্রিস্টল। নবশিক্ষার্থিণীর জন্যে সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; প্রমাণ—লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলং-এর চিঠি।

প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশ কালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনী-

কারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা। 'ভাই ছুটি' বলে যার আরম্ভ আর ছিন্নপত্র—এ দুু-এর রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 'খোলাচিঠি'র গোলাবর্ষণকে পাঠকেরা কূটনৈতিক কুস্তির প্যাঁচরূপেই গণ্য করে, চিঠি বলে ভুল করে না।

"জনান্তিক"। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

ই ন্ স ম্ নি য়া

জ্যোতির্ময় রায়

সভ্য-মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁকই হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধ-চালে চলা। প্রাকৃতিক নিয়মে যা শুদ্ধ, দিনের পর দিন মানুষের নিয়মে সেটাই গণ্য হচ্ছে ভুল বলে। তাই যে-মানুষ যতো বেশি স্বাভাবিক নিয়মে চালিত, সভ্য-মানুষের সঙ্গে তার ততো বেশি গরমিল। শিশুরা বড়ো বড়ো জুতোতে পা ঢুকিয়ে থপ থপ করে হেঁটে বেড়াতে ভালোবাসে, একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন অবধারিত উল্টো চড়িয়ে বসে আছে, আমাদের ভুলের মতো দু-একবার হয়তো বা শুদ্ধ হয়ে যায়। নিরক্ষর লোক মাত্রই বই ধরবে উল্টো ক'রে, আমাদের মতো পণ্ডিতদের চোখে পড়লেই দেবো সেটা ঘুরিয়ে। প্রাকৃতিক নিয়মকে যতটা পারা যায় ঘুরিয়ে দেওয়াই হলো আমাদের কাজ। আমাদের চলা, বসা, আহার, নিদ্রা কোনোটাই এ-চেষ্টার হাত এড়িয়ে যেতে পারে নি। আমরা খাই বা ঘুমাই ক্ষিধে বা ঘুম পায় বলে নয়, খাবার বা ঘুমোবার সময় হয়েছে বলে। প্রাকৃতিক নিয়মে খাওয়া-শোয়া পশুর জন্যে, মানুষ তার নিজের নিয়ম নিজে তৈরি করেছে। এভাবে নিজের সুখ-সুবিধা ও নিজের নিয়ম তৈরীর ভার নিজের হাতে গ্রহণ করায় মানুষের ব্যস্ততা কেবলই চলেছে বেড়ে এবং এ ব্যস্ততাকে নিয়মিত করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে সময়-পরিমাপক যন্ত্র—এ যন্ত্রের অঙ্গুলি-হেলনেই আজ তাকে চলতে হয়। শুধু চলতে হয় না, ক্রমে জগতটাকে সে বানিয়ে তুলেছে একটা ঘড়ির ডায়াল, কাঁটার-কদমে তার ওপর ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সময়ের মূল্য জানতে হলে যাবেন শেয়ার মার্কেটের সামনে, দেখতে পাবেন গাড়ির গা থেকে দরজা খুলে নাবিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ দরজা খুলতে সময় নষ্ট হয়—গাড়ির গতি যে সময় দিয়েছে তাতেও আজ কুলোচ্ছে না। কাজের যেখানে হুড়াহুড়ি সময়ের সেখানে কাড়াকাড়ি—অবশ্য এমন লোকও আছে যারা কাজের চাপ ছাড়াই সময়ের চাপে অস্থির। তাদের ব্যাপারটা তত্ত্ব-সভায় মূর্খের উৎকট একাগ্রতার মতো। মানুষের এই হাস্যকর যান্ত্রিকতায় য়ুরোপীয়দের মতো পাঙ্‌চুয়াল-জাতের ভিতর থেকেও কৌতুক করে বলা হয়েছেঃ 'পাঙ্‌চুয়ালিটি' হলো ঘড়িবিক্রেতাদের প্রোপাগাণ্ডা, তা ছাড়া এর গভীর কোনো সার্থকতা নেই।

যার যখন খাবার সময় তার ঘণ্টা-দুঘণ্টা আগে কোনো সুখাদ্য সামনে দিয়ে দেখবেন, বলবে, 'না, এখন খাবো না, খেলে দুপুরের (বা রাত্রির) খাওয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে।' এ কথার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাইনে। কেন, যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা খাওয়া কি খাওয়া নয়! যদি মনে করো ওতে পুরো পেট ভরবে না, বেশ তো, আদ্ধেকটা এই সুখাদ্য দিয়ে ভরিয়ে নাও, বাকি আদ্ধেকটা থাক নিয়মিত আহার্যের জন্যে। আসল কথা তৃপ্তির চেয়ে নিয়মগত অভ্যাসটাই এঁদের কাছে বড়ো, না হয় ক্বচিৎ নিয়মভঙ্গে দেহ-ভঙ্গ হবে না সেটা ওঁরা জানেন। ঘুমের বেলায়ও ঠিক তেমনি। ঘুম না-আসাটা অসুস্থতার লক্ষণ বলেই অস্থির হয়ে ওঠে না, অস্থির হয় দশটা কি এগারোটায় ঘুম আসবার কথা, আসছে না কেন! ঘুমের সময়ে ঘুম আসছে না, হয়তো আসবে তখন যখন জেগে থাকবার কথা—মিছেমিছি হবে সময় নষ্ট, দুর্ভাবনা গাঢ়তর হয়। সময়ের তাঁবেদারি করে মনের স্বভাবও হয়েছে কলের মতো, নিয়মের একটা স্ক্রু ঢিলে হলে সমগ্র কাঠামোটাই যেতে চায় বিগড়ে। অনভ্যস্ত অবসরকে আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে তোলার বদলে কলটাকে চালু করার চেষ্টায় সেই ঢিলে স্ক্রু নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুমের স্বভাবও আবার তেমনি অতি-বেশি লাজুক, যতো তার জন্য ডাকহাঁক আর আয়োজন করা যায়, ততো যায় সঙ্কুচিত হয়ে—আর ঘুম-বিরহীর স্থৈর্যের বাঁধও ক্রমশই আসতে থাকে ভেঙে। এগারোটা—বারোটা—একটা দুটো......আর সহ্য হয় না, অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মাথায় জল, ওষুধ-বিষুধ-ছটফটানির অন্ত থাকে না। বাড়ির লোকের উপর হুকুম চালাতে পারেন এমন একজনকে দেখেছি বাড়ি শুদ্ধ লোককে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বসিয়ে রেখেছেন,—তাঁর ঘুম যখন আসছে না, আর সবাই কেন আরাম করে ঘুমোবে!

আমার কিন্তু মনে হয় ইনসমনিয়া হচ্ছে সানন্দে গ্রহণ করবার মতো একটা অবস্থা (অবশ্য শরীরে যতটা সয়)। অসুস্থতা মাত্রই ভালো নয়, একথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এমন ধরনের অসুখও আছে যার ক্রুদ্ধ-আক্রমণ ছাড়া সাধারণ-আক্রমণকে বিলাস হিসেবে গ্রহণ করা যায়। মনে করুন সুন্দরী একটি মেয়ের সর্দি হয়েছে (সর্দি একক, মাথাধরার হাত ধরা নয়), দর্শক এবং রোগিনী উভয়ের পক্ষেই বেশ একটা বিলাস নয় কি? স্ফীত রক্তাভ মুখখানি ঘিরে উস্কো-খুস্কো এলো চুল; নাকের ডগাটি হয়েছে টুকটুকে লাল, গলার স্বর ভারি ও মিঠে। তা ছাড়া সর্দি হলেই চেহারায় আসে একটা আহ্লাদে ভাব, সুমুখে সেটি হয় আরো

মনোরম। কিংবা শুধু হালকা একটু জ্বরে, যাতে গরম লুচি আলুর-দম সহযোগে পথ্য করে পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা যায়। এ-ধরনের অসুখ যদি এমন একটি লোকের আওতায় হয় যার সঙ্গে মনের সম্পর্কটা মোটে গড়ে উঠেছে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার কাজটা তারই হাতে ছেড়ে দিতে কোনো বাধা নেই—তবে এ অসুস্থতাকে ভাগ্য বলে মেনে নেবে না এমন নীরব ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা না-ই বা ভাবলাম। ইনসমনিয়া কিন্তু এ-জাতীয় বিলাসের চেয়েও গভীর ও ব্যাপ্তভাবে উপভোগ্য বস্তু। জীবিত মানুষের কাছে জেগে থাকার মতো আনন্দ ও কাম্য আর কি থাকতে পারে!

কাজ, খেলা, সঙ্গী বা আমোদ ছাড়া হলেই ঘুম ছাড়া যাদের গত্যন্তর থাকে না, অতন্দ্র অবস্থা তাদের কাছেই অসহনীয়। ক্লান্তি থেকে ঘুম আসে এই হলো সাধারণের ধারণা, কিন্তু আমাদের ঘুমের কারণ ক্লান্তি নয়—সে ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম। সভ্যজগতের নিয়মে ক্লান্ত হতে হয় যার যতো কম, ঘুমোতে হয় তার ততো বেশি। দেখা যায়, শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্যে দরকার হয় সাধ্য-সাধনার, আর বড়রা সাধ্য-সাধনা করেন ঘুমের। এর কারণ দৈহিক নয়, মানসিক। দৈনন্দিন জীবনের ঘড়ি-ধরা বা নিষ্কর্ম একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে নিদ্রা হলো সবচেয়ে সহজ উপায়। আমাদের মনটা হয়েছে আফিম-খাওয়া সার্কাসের বাঘের মতো, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোহার-শিকের খোঁচা দিয়ে তাকে খাড়া রাখতে হয়, ডাক ছাড়াতে হয়—খোঁচা বন্ধ হলো কি পড়লো ঝিমিয়ে। নিজের আনন্দে খাড়া থাকবার ক্ষমতা তার নেই। তাই স্থূল রকমের লিপ্ততা বা ঘুমের বাইরে পড়লেই মাথার কলকব্জা যায় বিগড়ে। প্রথমত, ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঘুম আসছে না; দ্বিতীয়ত, ঘুম না এলে কি ক'রে এই দীর্ঘ সময় কাটবে। যখন পারিপার্শ্বিক সব-কিছু নিশ্চল তখন এক একটা লোক নিজেকে চালু রাখবে কি ক'রে! এ দুর্ভাবনায় বিনিদ্র-ব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমান চেষ্টা ও ব্যর্থতায় সে-চঞ্চলতা পরিণত হয় ক্ষিপ্ততায়। সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যর্থতার আতিশয্যের কাছে তার বিষয়বস্তু যায় হারিয়ে। যে কথাটা সোলার মতো মনের চেতনায় ভেসে বেড়াচ্ছে—হাত বাড়ানো মাত্র না পেয়েই, যখন আমরা ডুবসাঁতার দিতে শুরু করি মনের গভির স্তরের আনাচে-কানাচে তখন ব্যর্থতা হয় সুনিশ্চিত! এ-কথা সে-কথার টানে বা ভাসতে ভাসতে অনাহূত এক সময় আপনা থেকেই এসে হাতের কাছে ধরা দেয়। এমনিধারা জলকে শক্ত-মুঠোয় ধরতে

যাওয়ার মতো ঘুমকে জাপটে ধরার অতি-প্রয়াসে ঘুম যায় পালিয়ে। একদিন হয়তো শারীরিক বা মানসিক কারণে ঘুম এলো না, বস্—মাথায় দুর্ভাবনা জুটলো, ঘুমের সময় ঘুম তার আসছে না। পরের সারাটা দিন কাটবে সে-চিন্তায়, রাত দশটা না বাজতেই শুরু হবে উৎকট প্রয়াসের পালা। নিদ্রাদেবী আশেপাশেই হয়তো ছিলেন, সেই চেষ্টার ধাক্কায় কিছুকাল তিনি আর কাছ ঘেঁষতেই পারেন না।

চেষ্টা আর উত্তেজনায় মস্তিষ্ককে উত্তপ্ত না করলে এবং মনের জড়তাটা একটু ছুটিয়ে নিতে পারলেই জানা যায় ইনসমনিয়া কতো বড়ো উপভোগ্য অবস্থা। মানুষের ঘুমের সময়টাই কাটে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতায়। কারণ চেতনাটাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা যে শুধু 'আছি' এবং দেহ দিয়ে সে-থাকাকে ভোগ করছি তা নয়, অমরা প্রতি মুহূর্তকে জানছি বুঝছি। রূপকথার রাজকন্যার মতো শিথেনে সোনার-কাঠি রেখে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে জীবনের মূল্য দাঁড়ায় শুধু বেঁচে থাকা। ঘুমের টুকরো-টাকরা আমরা ব্যবহার করবো নেহাৎ শারীরিক প্রয়োজনে। তা ছাড়া শুধু জাগবো আর জানবো—সজ্ঞানে অনুভব করবো সুখ-দুঃখ আনন্দ বিষাদ। নেহাৎ শারীরিক ক্লেশ ভুলবার চেষ্টা ভিন্ন ঘুম মানুষের কাম্য হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ আছি জনতায় ততক্ষণ মেতে থাকবো মন নিয়ে আর জনতা নিয়ে। যখন আমি একা তখন আছি আমি আর আমার মন। মনের জগৎটা বিশ্বের চেয়ে ছোটো হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সেখানে বসে সে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জটিলতার জট, সমস্যার সমাধান—কতো কি-ই না গড়তে আর ভাঙতে পারে! সবচেয়ে আনন্দের হচ্ছে নিশ্চুপ হয়ে সে কি করছে তা-ও সে জানছে।

অনেকে বলেন পৃথিবীর এই দুঃখজ্বালার চেয়ে স্বপ্নে কিছুটা ভালো সময় কাটিয়ে আসা ঢের ভালো—অতএব ঘুম ভালো। স্বপ্নটা যে ভালোই হবে তার কি নিশ্চয়তা আছে? সুখস্বপ্নের গ্যারাণ্টি পেলে কথাটা আংশিক আমলে আনা যায়। কিন্তু দুঃখস্বপ্নের মিছে দুঃখ পাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। 'ঢাকের বাদ্য থামলে মিষ্টি'-র মতো জেগে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে হয়। সুখস্বপ্নের সুখটুকু আবার জাগলে হয়ে যায় মিথ্যে। মিথ্যের এই টানা-হেঁচড়ার চেয়ে সত্যের ঝকমারিও ভালো।

"দৃষ্টিকোণ"। বঙ্গাব্দ ১৩৬১

চৌ বা চ্চা

সুশীল রায়

মায়া হয়। ইচ্ছে হয় না এই টলটল নিটোল আর নিস্তব্ধ জলে ঢেউ জাগিয়ে দিই।

পরিচ্ছন্ন জলে টইটুম্বর হয়ে আছে চৌবাচ্চা। গলা কাঁচের মত জল। এক মনে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে শুধু। কেবলই মনে হচ্ছে, একটু ছোঁয়া পেলেই বুঝি চমকে উঠবে, ওর মসৃণ শরীরটায় অগণিত টোল পড়ে যাবে।

আস্ত জিনিস এই প্রথম দেখছিনে। এর আগে কত জায়গায় কত রকমের অখণ্ড ও অনাবিল পদার্থ দেখা গেছে; কিন্তু ওদের কারো উপরেই এমন মায়া পড়ে যায় নি। প্রয়োজনে, এমন কি বিনা প্রয়োজনেও, তাদের খান খান করে ভেঙে দিতে দ্বিধা হয় নি এতটুকু, বিন্দু-বিসর্গ সঙ্কোচও বোধ করি নি; কিন্তু আজ চৌবাচ্চার কিনারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হাতের বালতি হাতেই ঝুলতে লাগল।

যে জলের সীমা নেই, পার নেই, শুরু নেই, শেষ নেই, পৃথিবী-জোড়া সেই জলের তুলনায় এর জল তো সামান্য একটি বিন্দুমাত্র। শুনেছি, অনেকে সেই মহাসিন্ধুর কিনারে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। সে-বিস্ময়ের কারণ হয়তো আছে; কিন্তু এখানে এভাবে আমার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার হেতুটা কি—সেই কথাই ভাবছিলাম।

চারদিকে চারটে প্রাচীর খাড়া ক'রে বেঁধে রাখা হয়েছে এই জলকে। এর বন্দীত্বের জন্যেই মনে কোনো করুণার উদয় হল কি না খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু না, করুণার কণাও কোথাও পাওয়া গেল না—তন্ন তন্ন করে খুঁজেও। খুঁজে যা পাওয়া গেল, তার আগাগোড়া সবটুকুই অকৃত্রিম মায়া।

ছোট একটা চৌবাচ্চার সামান্য এই জল আমাকে এভাবে কাবু করে দিতে পারে, একথা তো আগে স্বপ্নেও ভাবি নি। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অবশ্য বলেন যে, বড় পাহাড় যাকে বশ করতে না পারে এমন কঠিন পাষাণও দৈবাৎ নাকি একটা ছোট পাথরের নুড়ির টানে পড়ে যায়। কেন যায়, তার ব্যাখ্যা তাঁরা যদি করে যেতেন, তাহলে নিজের অবস্থাটা তার সঙ্গে পরখ

করে দেখে নেওয়া যেত। স্থানবিশেষে সামান্য ছোটরও কদর নাকি বেড়ে যায় অনেক, উদাহরণস্বরূপ নাকি বলা যেতে পারে—ছোট্ট চোখের তারার উপরে যদি খুব ছোট একটা ছানি পড়ে তাহলে সে-ছানিকে ছোট ব'লে উপেক্ষা করা যায় না।

এই চৌবাচ্চার জল তাহলে আমার মনশ্চক্ষের তারার উপর ছানি হয়েই দেখা দিল কিনা, সেটা ভেবে দেখা দরকার। মায়া জিনিসটা যদি অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতে হবে, সত্যি, আমি ওর ওই নিস্তরঙ্গ নিটোল আর নিস্তব্ধ জল দেখে অন্ধই হয়ে গেছি। তাই তো অপলক চোখে তাকিয়ে এইভাবে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে একটানা।

ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র-সিঞ্চন নাকি অসম্ভব। কি কারণে অসম্ভব, সে কথা তুলে দরকার নেই। কিন্তু বালতি দিয়ে চৌবাচ্চা সিঞ্চন করা যে সম্ভব নয়, সেটা বুঝতে পারছি; অথচ তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছিনে কিছুতে। যে কথা আগে বলেছি, এ কি শুধু তাই—কেবলই মায়া! আর যদি মায়াই হয়ে থাকে, তাহলে ওই জলকে তফাতে না রেখে সর্বাঙ্গে মেখে ফেলাই তো সমীচীন। যার উপর টান এতটা, তাকে কেউ স্বেচ্ছায় এমন দূরে রেখে দেয় না বলেই তো শুনেছি।

নিজের অকারণ এই সঙ্কোচ মনে মনে সমর্থন না করলেও ওর ওই নিশ্চলতাটা ভেঙে দিতে পারছিনে। তাই দুপায়ে সমান জোর দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ থেকে। এক-একবার মনে হচ্ছে, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই; আজ না হয় ভেঙেই দিই ওকে, কাল আবার নতুন করে গ'ড়ে নেওয়া যাবে। তা হয়তো যাবে, কিন্তু আজ যে মনটাকে নিয়ে এর পাশে এসে দাঁড়ানো গেছে, ঠিক সেই মনটাকে যদি কাল আর হাতের কাছে পাওয়া না যায়। ভরা চৌবাচ্চা আজই তো জীবনে এই প্রথম এল না, কিন্তু এর আগে যখন এমন থমকে দাঁড়াইনি কখনো, তখন আজ না হয় একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে যখন কোনো কষ্ট হচ্ছে না, তখন দাঁড়িয়ে থাকাতেই বা ক্ষতি কি!

কোনো তাড়া বা কোনো তাগাদা যদি না থাকত, সময় নষ্ট হচ্ছে, এই রকমের বোধের হাত থেকে যদি রেহাই পাওয়া যেত পুরোপুরি, তাহলে আমি হয়তো সারাটা জীবন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম এইভাবে একটানা। সামনে ওই জল—নিটোল আর নিস্তব্ধ, কানায় কানায় ভরা। জলকে জল বলে মানতেই ইচ্ছে করে না আদপে। মনে হচ্ছে, গলিত কাঁচ দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে আমার এই চৌবাচ্চা। এর চারটে প্রাচীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,

তার ভিতর এবং তার বাহির; তার তল এবং তার উপর। সম্পূর্ণ উন্মুক্ত আর উদার হয়ে অবারিত আগ্রহ নিয়ে সে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এমন আন্তরিকভাবে কোনোদিন কেউ হয়তো দেখেনি তাকে, তাই তার চোখে এই বিস্ময়।

তারই বিস্ময় কি না, তাও ভালভাবে বুঝতে পারছি নে অবশ্য। আমার বিস্মিত চোখের ছায়া গিয়েই তার উপর পড়ে থাকবে। তার মারফত আমি হয়তো-বা আমার বিস্ময়টাই দেখছি তাহলে। আমার চোখের বিস্ময়টা তো তাহলে অমনি স্তব্ধ আর অমনি নিটোল। আমার চোখ দুটোই অমনি কাচ-স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে কি না, কে বলবে।

এতটুকু উচ্চকিত না করে ওকে একটু ছুঁতে ইচ্ছে হল। ডান হাত থেকে বালতিটা বাঁ হাতে পার করে ডান হাতটাকে মুক্ত করে দাঁড়ালাম। সন্তর্পণে আঙুলটা এগিয়েও নিয়ে গেলাম; কিন্তু পারলাম না কিছুতে। কিছুতে ছুঁতে পারলাম না ওকে। ঠিক মনে হল, ও সজল চোখে তাকিয়ে নীরবে আমাকে যেন নিষেধ করল।

চৌকো চোখ দেখি নি কখনো, তাই হয়তো ওই চোখের ইশারায় চমকে গিয়ে থাকব। কিন্তু এর আকার যেমনই হোক, এর আচরণ অনেকটা সজল চোখেরই মত। ওই চৌবাচ্চার জলের রূপ নিয়ে তাহলে হয়তো আস্ত একটি চোখ এসে দাঁড়িয়েছে আমার চোখের সামনে। আর আমি তাইতেই অভিভূত হয়ে আছি।

চোখের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক নাকি ঘনিষ্ঠ। কবিরা নাকি চোখের দ্বারা অভিভূত হয়েছেন এবং চোখের অনেক গুণকীর্তন করেছেন। একটি সামান্য চোখ নিয়ে নাকি বৃহৎ মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে। কিন্তু সে সম্ভাবনা নিয়ে তো আমার কাজও নয়, কারবারও নয়। আমি কবি নই, কাব্যও বুঝি নে; ঠিক এই মুহূর্তে এখন আমি সামান্য একজন স্নানার্থী। তাই এই সলিল-তীর্থে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মুখের কথার সলিল-তীর্থ যে সত্যিকারের তীর্থের গরিমা নিয়ে দাঁড়াবে, এতটা ভাবা যায় নি। সত্যিই, আমার মনে হতে লাগল, আমি প্রাত্যহিক নিয়মিত একজন স্নানার্থী নই। আমি এসেছি যেন এক তীর্থের কিনারে, এখানে পুণ্য অর্জন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

চৌবাচ্চা থেকে চোখে, সেখান থেকে সরাসরি এক তীর্থে পেঁছে গেলাম। কিন্তু এতটা অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এক পা আমি এগোতে পারলাম না, আঙুলটা একটু এগিয়ে নিয়ে ওকে ছুঁতে সাহস পেলাম না।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানিনে। এখানে আমার সঙ্গেসঙ্গে সময়ও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে বলেই আমার ধারণা। ছোট এই স্নানের ঘরে সময়কেও তাহলে বন্দী করে ফেলা গিয়েছে। ওই জলকে যেমন চারটি প্রাচীর দিয়ে বাঁধা হয়েছে, ওই বাঁধা-জল আমাকে যেমন বেঁধে ফেলেছে, ঠিক সেইভাবেই আমরা বাইরের সময়কে এখানে এনে বেঁধে ফেলে থাকব। আমি স্বয়ংই হয়তো সেই বহমান নদীর নিশ্চল প্রতিমূর্তি। যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ছুটোছুটি করতে হয়। কে কাকে হারাতে পারে—এই পাল্লা চলে হরদম। কিন্তু তার সম্মুখের ঝাঁকড়া চুল মুঠিতে এ'টে ধরেও তকে কাবু করা যায় না। অথচ এখানে আলগোছে সরে এসে সমস্ত শরীরকে আলগা দিয়ে সময়ের সঙ্গে পাল্লা না দিয়েও সেই সময়কে কাবু করা গেল।

আর যে লোকসানই হয়ে থাক-না কেন, সময়কে এইভাবে যে বাঁধতে পারা গেছে—এইটুকুই লাভ। জীবনের মহাসাগরের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উচ্ছলতার মাঝে মাঝে এমনি এক আধটা চৌবাচ্চা থাকা যে বিশেষ দরকার —এতে আর সন্দেহ কি। এদের পাশে এসে তবু একটু নিশ্চিন্ত নীরবে দাঁড়ানো যায়, বাইরের ঝড় আর সময়ের হাত থেকে একটু নিষ্কৃতি তাহলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। ছোট হোক, বড় হোক, মাঝারি হোক—টল টল জলে তা যেন থাকে ভরপুর।

যে সমুদ্রের কথা বললাম, তার জল বড় গাঢ় নীল, আর বড় লোনা, তার তল দেখা যায় না। সেই অতল অগাধ মহাসিন্ধুতে সাঁতার কেটে যখন হাত-পা অবশ হয়ে আসে, বিস্বাদ জলের আস্ফালনে সর্বাঙ্গ যখন তিক্ত হয় যায় তখন যদি চোখের সামনে মেলে ধরে কেউ এমনি একটা স্বচ্ছ চৌবাচ্চা, তাহলে মন পুলকে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারে না। অতলতার রহস্য দিয়ে বিভীষিকার সৃষ্টি কোনো দিন কোনো চৌবাচ্চা করেছে বলে শুনিনি; তার জলের স্বাদ লোনাও তো হয় না।

এ হেন চৌবাচ্চাকে ফেলে মানুষে কেন সমুদ্রের লালসা পোষণ করে, এ রহস্যটা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয় না কিছুতে। আমি আজ যে আবিষ্কার করে ধন্য হয়েছি, সকলে তার অংশ-ভাগী হোক—এই আমার ইচ্ছে। তারা সকলে মিলিত হোক চৌবাচ্চাদের চারধারে, স্বচ্ছ চোখে একবার তাকিয়ে দেখুক এর প্রশান্ত আর অতল সৌন্দর্য আছে কিনা।

যা বিরাট আর যা বিশাল, তারাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, এই জন্যই ছোটখাট চৌবাচ্চারা ছোট ছোট ঘরে বন্দী হয়ে অখ্যাত জীবন

যাপন করে চলেছে। তাই বলে এদের বাইরে টেনে আনতে অবশ্য বলিনে; এরা নেপথ্যবাসী, নিভৃতেই এদের সঙ্গে দেখা হওয়া সমীচীন।

একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ধৈর্য হয়তো ফুরিয়ে এল। সন্তর্পণে একটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলাম ওই জল। প্রতিবাদ করে উঠল যেন অমনি; আপত্তির ঢেউ উঠল তার বুকে; হাত দিয়ে ছুঁয়েই ফেললাম তাকে। জল ছলকে পড়ল তার কিনারা উপছে। অপরাধী বলে মনে হল নিজেকে। সরে এলাম এক পা। দেখলাম, সে নিটোল সৌন্দর্য আর নেই; নিষ্ঠুর করাঘাতে তার নিস্তব্ধতা চুরমার করে ভেঙে দিয়েছি।

বাইরে থেকে এক ঝাঁক সময় ঢুকে পড়ল যেন স্নানের ঘরে হুটপাট করে। আর দেরী করা চলে না। তারা এসে তাড়া দিতে লাগল। বাঁ হাতের বালতি ডান হাতে চালান করে এবার সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলাম মাথায়। যা মনে হয়েছিল গলিত কাঁচ, আসলে তা সামান্য জল হয়ে গেল। একেবারে ঘরোয়া, একেবারেই সাধারণ।

কঠিন আঘাতে এমনি অনেক স্বচ্ছ চোখেরও সর্বনাশ হয়তো হয়। জীবনের সঙ্গে এইভাবে মেনে নিতে গেলেও হয়তো স্বপ্নিল সে চোখের জাদু আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা না যাক। তার জন্যে কোনো আক্ষেপ নেই। কিন্তু প্রত্যহ অন্তত একবারও যেন এমনি সহজ স্বচ্ছ নিটোল আর নিশ্চল চৌবাচ্চার সঙ্গে দেখা হয়, এটা মনে-প্রাণে রোজ চাইব। হয়তো রোজ পাওয়া যাবে না, কিন্তু বলেছি তো, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ এই মহাসাগরের মাঝে দম নেবার উপযুক্ত ছোটখাট এক-আধটা ঘাঁটি যে চাই-ই। নিজের নির্বুদ্ধিতার তাগিদে হয়তো তা ভেঙে খানখান করব রোজই, কিন্তু চাহিদাটা সেইজন্যই বর্জন করব কেন।

'দেশ'। ২৪ চৈত্র, ১৩৫৭

বি ন্ধ্যা চ লে র প থে

রানী চন্দ

শেষ পর্যন্ত বিন্ধ্যাচল যাওয়া ঘটে উঠল। পথে চলতে-ফিরতে গাড়ি দেখলেই জিজ্ঞেস করি. 'বিন্ধ্যাচলে যাবে, কত নেবে?' এ যেন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। আজ গঙ্গা হতে স্নান সেরে ফিরছি, পথে একটা খালি স্টেশন-ওয়াগন দেখি, বলি, 'বিন্ধ্যাচল যাবে?' এক কথাতেই রাজি হয় সে। কিন্তু পাঁচজন আর ড্রাইভারকে নিয়ে ছ'জন, এর বেশি লোক নিতে রাজি হয় না। বলে, 'যেতে তো পারেন অনেকেই, এত বড়ো গাড়ি যখন; কিন্তু পুলিস পাকড়ালে কে সাম্‌লাবে? আপনারা নেবেন দায়িত্ব?'

দাদা বললেন, 'থাক্ থাক্; অত কথায় কাজ কী? আমরা কজন, তত্ত্বানন্দ স্বামী আর গিরিজা ব্রহ্মচারীও যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নিলেই হবে।'

বড়দি বললেন, 'আহা, সেই-যে বরিশাল থেকে এক স্বামীজি এসেছেন, তিনিও যেতে চেয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে।'

ভিজে কাপড়ের বোঝা এক-ছুটে বারান্দার দড়িতে ঝুলিয়ে গাড়িতে উঠে বসি। বেলা বেড়ে গেছে, সূর্য প্রায় মাথার উপরে। গরম হাওয়ার ঝলক চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। উঁচু নিচু পথ; ভাঙা গদির উপরে বসে নাচতে নাচতে চলি; জানলার কাঁচ ঝন্‌র-ঝন্ বাজে।

শহরের হট্টগোলের শেষে, বড়লোকের শখের বড়ো বড়ো পোড়ো বাগান-বাড়ি। শার্সি কপাট ভেঙে পড়া, ফল-পাকুড়ের গাছে ভরা সোনসান পল্লী। এও ছাড়িয়ে এবার এসে পড়ি খোলা পথে। দিগন্ত জোড়া মাঠ দু'ধারে; পাকা শস্য কেটে ঘরে তুলেছে চাষী। হা হা করে শূন্য খেতগুলি কড়া রোদের মরীচিকা বুকে নিয়ে।

পুরোনো নিম তেঁতুল অশথ গাছের ছায়ায় ঢাকা পথ তার ভিতর দিয়ে মোটর চলেছে আর্তনাদ করে।

ঝিমুনি এল চোখে। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে রাখলাম, পা দুটো সামনে ছড়ালাম। একটা অবশ আলস্যে নিজেকে এলিয়ে দিলাম।

মহুয়া ফুলের গন্ধ পাই যেন! মহুয়া ফুটতে আরম্ভ করেছে কি? আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই সময়ে কত ভিড় জমে মহুয়া-

তলায়। রসে টুব্‌টুব্‌ মহুয়ার ফল তলা ছেয়ে থাকে। ভোর না হতে এসে কুড়োয় সাঁওতাল মেঝেনরা কোঁচড় ভরে। টাটকা খেয়ে যা বাঁচে, রেখে দেয় রোদে শুকিয়ে; অদিনের দিনে খেতে আরও বেশি সুখ।

কিন্তু এরই মধ্যে মহুয়া ফুটতে শুরু হল? তবে তো শাল ফুলও পারব না ধরতে, ফিরে গিয়ে। এই একই সময়ে ফোটে। ফোটার পালা, ঝরার পালা সব শেষ হয়ে যাবে যে যেতে যেতে। এই তো আসার আগে একদিন শালবীথিতে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, এক মেঝেন বাঁশের ডগায় কাস্তে বেঁধে চক্‌চকে সবুজ পাতা-সমেত শালের ডাল ভাঙছিল মট্‌ মট্‌ করে। ভাত খাবার থালা বানাবে পাতা দিয়ে, শুকনো ঘাসকাঠি গেঁথে। দেখে ধম্‌কে দিলাম, 'কী করিস মেঝেন, ফুল ফুটবে আর কদিন পরে; অমন করে ভাঙতে হয় সামনের ডালগুলো? পাতার দরকার, ভিতরের ঐ গাছগুলো থেকে নে না গিয়ে।'

ফুলের দিনে কী বাহার খোলে শালবীথির! তলা ছেয়ে যায় গুঁড়ি-গুঁড়ি ফুলের পাপড়িতে; যেন কাটা উলের সাদা পুরু গদি পড়ে থাকে লাল কাঁকরের উপরে। ভোমরার গুন্‌গুনানি, ফুলের সৌরভ, হাওয়ায়-ঝরা হাল্‌কা পাপড়ির ঝরনা—সে এক দিবারাত্রির মহোৎসব, মন-মাতানো মিহি সুরের কীর্তন।

ফিরে যখন যাব দেখব, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে খালি গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে কড়া রোদ মাথায় নিয়ে, কালবৈশাখীর খ্যাপা ঝড় বুক পেতে নিতে। লাল ধুলোতে শুকনো পাতার গড়াগড়ি। গিয়ে কি কেবল এই-ই পাব?

তা কেন? আছে মধুমালতী; পথের বাঁকে বাঁকে আকুল করবে উদাস মন। আছে বেলফুল ঘরের আঙিনায়। মুচকুন্দ আমন্ত্রণ জানাবে হাওয়ায় হাওয়ায়। ভাবনা কী?

জোলো বাতাস এসে লাগল মুখে। চোখ খুলে দেখি, গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছে গাড়ি, ধীরে সাবধানে।

লোহার বয়ার উপর বাঁধানো পুল। বর্ষার বেগে খুলে যায় ফি বছর, আবার জুড়ে নেয় জল কমলে। ওপারে মির্জাপুর শহর, আরও এগিয়ে বিন্ধ্যাচল।

কী পরিষ্কার গঙ্গা, টল্‌টল্‌ করে জল। হরিদ্বার ছেড়ে এমন গঙ্গা দেখিনি আর। কাশীর গঙ্গায় নেই সেই আনন্দে উপ্‌চে-ওঠা স্রোতের ঝংকার, নেই সেই উচ্ছল গতি সব-কিছু ভাসিয়ে নেবার।

সে যেন সহ্যশীলা স্নেহময়ী মা, বুকে ধরে নিয়ে আছে সবাইকে— স্থির গম্ভীর।

বড়দি বললেন, 'চলো, আগে বিন্ধ্যাচলের গঙ্গা স্পর্শ করি।'

বলি, 'স্পর্শ নয়, স্নানই করব মাথা ডুবিয়ে।'

কিন্তু বাড়তি কাপড় যে আনিনি সঙ্গে। তা হোক। এতদিন এত ঘাটে স্নান করলাম, এত লোকের স্নান দেখলাম, তাদের একটা স্নানের পন্থা আজ লাগাই কাজে আমরা।

জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কী আরাম! রোদের জ্বালা স্নিগ্ধ হল।

স্নানের পরে চললাম বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনে, এখানে আজ আসাই যাঁর জন্যে এত কাণ্ড করে। এক দিকেই ছুটছে ভিড়ের মাথা, ফেরে বোধ হয় অন্য পথে। মেলা বসে গেছে পথের দু' ধারে, সারি সারি দোকান। মাঝের সরু পথ যেতে যেতে থেমেছে গিয়ে একেবারে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের সামনে। মুরুব্বিমতো এক পাণ্ডার আশ্রয় নিতে সে আমাদের নিয়ে উঠল মন্দিরে। উঠে দেয়াল ঘেঁষে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভিড় আগলে রইল দু' হাত মেলে।

ছোট্ট দরজা, মাথা নুইয়ে লোক ঢুকছে ভিতরে হুড়মুড় করে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাণ্ডা-ভলেণ্টিয়ারের দল ভিড় সামলাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে এ-ওর ঘাড়ে। যেন পাগলা হাওয়ার দাপট চলছে এখানে; থামায় সাধ্য কার? তুমুল তাণ্ডব, কে কাকে রক্ষা করে? ঢোকে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে, বেরিয়ে আসে রক্ত মুখ নিয়ে। কি জ্বলছে ভিতরে? ভাবতে গিয়ে আঁৎকে উঠি। ঢুকে কি বের হয়ে আসতে পারব প্রাণে বেঁচে?

হাঁটু মুড়ে উঁকি মেরে দেখি, ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে ঠাসাঠাসি জোড়া জোড়া পা। কালো ফর্সা শক্ত নরম, সালোয়ার-ঢাকা খাড়ু-মলে-মোড়া পাগুলি ধীরে ধীরে এগোতে গিয়ে পিছোচ্ছে; আর ডাইনে বাঁয়ে টাল খাচ্ছে।

দেবীর কাছে যাওয়া দূরে থাক্, দূর থেকেও দেবীর দর্শন পাচ্ছে না লোক, ফিরে আসছে, কোনোমতে মন্দিরে একবার ঢুকতে পেরেছে এই তৃপ্তিটুকুই সম্বল নিয়ে।

দেবীর দোরে এ কী বিড়ম্বনা! এত আশা আকাঙ্ক্ষা লোকের, কী-ই-বা এমন অদেয় ব্যাপার? একটু দর্শন, একটিবার পা ছুঁয়ে ভক্তি-নিবেদন, এইটুকুই তো চায় তারা। তাতে কেন এত বাধা? কেন এই বেড়ার আড়াল গাঁথা দেওয়ালের পরতে পরতে?

"পূর্ণকুম্ভ"। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

র ঞ্জ ন ও "আ মি"

রঞ্জন

যাদবপুর, জঙ্গীপুর ও অন্যান্য দুয়েকটা জায়গা থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগদান করবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলুম। যে সহৃদয় অনুরাগীরা আমার প্রতি এই অল্পার্জিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তবু যে তাঁদের সেই সস্নেহ আমন্ত্রণ সবিনয়ে কিন্তু সজোরে প্রত্যাখ্যান করেছি তার কারণগুলি যতটা ব্যক্তিগত ঠিক ততটাই নীতিগত। তাই সেগুলি প্রকাশ্যে আলোচ্য বলে মনে করি।

একদল দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন, "I am a Soul, I have a body." আমার অস্তিত্ব তার চেয়েও অসম্পূর্ণ ও অনির্দেশ্য। আমি বেনামী লেখক। তাই আমার শুধু একটা নাম আছে, তার বাইরে আর কোনো সত্তা নেই যার জোরে সাহিত্যের রাজ্যে আমি প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারি। সাহিত্যসভায় সশরীরে আতিথ্য গ্রহণ করতে আমার সঙ্কোচ এই জন্য যে 'রঞ্জন' হিসাবে আমার শারীরিক কোন অস্তিত্ব নেই। আমি নিরাকার। পাঠকের কাছে আমি 'নিত্য গাওয়া গান, মূর্তিহীন।' তার বেশি নই।

কিন্তু সত্যি তো তা নয়। আমি আসলে জীবন্ত একটা মানুষ। অফিস করি, বাজারে যাই,—কখনো কখনো লিখি। প্রথম দুটো কর্মের আর তৃতীয়টির মধ্যে যে ড্যাশ চিহ্ন দিয়েছি তার কারণ দুটোকে আমি আলাদা করে দেখতে ও দেখাতে চাই। অফিস করি ও বাজারে যাই স্বনামে, বেনামীতে এগুলি চেষ্টা করলে জেলে যেতে হোতো। লিখি বেনামীতে, কেননা—কিন্তু সে কাহিনী দীর্ঘ, কারণ তার নানাবিধ।

এর ফলে দুটো সত্তার সৃষ্টি হোলো। একজনের নাম অমুক চন্দ্র অমুক, অমুক অফিসে অমুক কাজ করে সে। দ্বিতীয় জনের নাম 'রঞ্জন' সে প্রবন্ধ লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, আরো কত কী।

আজ সাহস সঞ্চয় করে এ কথা কবুল করতেই হবে যে 'রঞ্জন' নামের অন্তরালে এই যে আত্মগোপনের আশ্রয় নিয়েছি তার প্রধান কারণ ভীরুতা। অনামী পাঠক আর বেনামী লেখকের সম্বন্ধ কখনোই সম্মুখ সমরে পরিণত

হতে পারে না, দুয়ের অনচ্ছ পেপার কার্টেন। এই যবনিকার পশ্চাতে অবস্থান করবার সুবিধা এই যে আমাকে যদি কেউ এসে বলে যে 'রঞ্জন' লিখতে জানে না, আমি তৎক্ষণাৎ সহাস্যে সম্মতি জানাতে পারি; তা নইলে জিজ্ঞাসা করতে পারি, 'রঞ্জন? সে আবার কে? নেভার হার্ড অব্ হিম!'

এমন সম্ভাবনা যখন অনুপস্থিত, যখন স্পষ্টতই জানি যে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনো সভায় সভাপতিত্ব করতে গেলে সেখানে আমার প্রশংসা বৈ নিন্দা হবে না, তখন ছদ্ম নামটা ঘুচিয়ে দিয়ে গলা বাড়িয়ে মালা পরতে আমার বাধে। একবার যখন পাঠকের রক্তচক্ষুর ভয়ে ছদ্মনামের বর্ম পরিধান করেছি, তখন নিরাপদ সভাস্থলে লোকচক্ষুর সামনে সেই আবরণ উন্মোচন করতে যাওয়া যেন গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়নো। ওটা অসাধুতা।

যে লেখক ছদ্মনামে লেখে, সে আসলে জেনে বা না জেনে বেচারী ফ্রাংকেনস্টিনের বিপজ্জনক ক্রীড়ায় মত্ত হয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে এক দানবের আবির্ভাব হয়, সে এসে বলে, 'তুমি অমুকচন্দ্র নও, তুমি রঞ্জন।' এ-দানব কখনো আমি নিজে, তখন আমি সাধারণ জীবন যাপন না করে দায়িত্বহীন উচ্ছৃংলতায় আর্টিস্টের মতো হতে চাই। কখনো এ দানব সাহিত্যসভার আয়োজকরা, তখন তাঁরা দাবী করেন আমার সশরীর উপস্থিতি।

রাজী হইনে, কেননা, সভায় গিয়ে বলব কী? যদি পুরাণো কথার পুনরাবৃত্তি করি, তাতে পরিশ্রম কম। কিন্তু কোন্ শ্রোতা তাতে তৃপ্ত হবেন? আর যদি নতুন কথা বলতে যাই, তবে তার আগে তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। অর্থাৎ পরিশ্রম চাই। অথচ এ কাজে আজো আমাদের দেশে পারিশ্রমিকের রীতি প্রচলিত হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া শুধু মাত্র মালার লোভে কতদিন লেখকরা সভায় গিয়ে বক্তৃতা করবেন, অর্থাৎ এমন বক্তৃতা যা একাধারে বক্তব্য এবং শ্রাব্য?

প্রথমত, লেখকের মনে যদি কোনো নতুন কথার উদয় হয় (ঈশ্বর জানেন, এমন ঘটনা কী মর্মান্তিক রকম বিরল) তবে তার প্রথম ইচ্ছা হবে সে কথা লিখতে, সভায় গিয়ে বলতে নয়। দ্বিতীয়ত, লেখা এবং বক্তৃতা করা দুটো আলাদা আর্ট, দুটোর জন্যেই সাধনা চাই এবং আলাদা রকমের সাধনা।

এই প্রভেদের পর্যাপ্ত স্বীকৃতি নেই বলেই অক্ষম বক্তা হলেও সফল লেখককে বক্তৃতা করতে ডাকা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফল বক্তাকে লিখতে। ফলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়কেই বঞ্চিত হতে হয়। তাই সুবক্তা না হলে লেখকদের উচিত বক্তৃতা করতে অস্বীকার করা।

আমি যে অস্বীকার করেছি তার অন্য একটা কারণ আছে। বক্তৃতার, অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ এলেই আমার অনেকদিন আগে পড়া রোমানফের একটা গল্প মনে পড়ে। সেই যেটাতে কুৎসিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কুরূপা এক রমণীর প্রেম হয়েছিল।

কেউ কাউকে দেখেনি, শুধু প্রেমপত্রের বিনিময় হয়েছে মাসের পর মাস। কিন্তু 'চিঠিতে কি মানে মন বিনা দরশনে?' একজন আরেকজনকে দেখতে চাইল। প্রেমিক লিখল, 'ক্ষমা করো, তুমি জানো না আমি দেখতে কী ভয়ানকরকম কুৎসিত। দেখামাত্র তুমি তোমার মুখ ফিরিয়ে নেবে। না, দেখা আমি দেব না, কিন্তু তোমায় দেখতে চাই।' প্রেমিকা লিখল, 'আমি তোমার রূপের তো প্রেমে পড়িনি, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি; আর রূপের কথাই যদি বলো, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি কী ভয়ানক রকম কুরূপা। তুমি দেখে শিউরে উঠবে। আমি তোমায় দেখা দেব না, কিন্তু তোমাকে দেখতে চাই।'

প্রেমে পড়লে কে কবে কার বারণ মানে? তাই নির্ধারিত স্থান ও কালে দুজন দেখতে গিয়েছিল দুজনকে। দূর থেকে দুজনই দুজনকে দেখে দেখা আর করেনি। বাড়ি ফিরে এসে আবার প্রেমপত্র রচনা করেছে। চিঠিই ভালো।

আমিও বলি, লেখাই ভালো। কাজ কী দেখায়? দেখা হলে হয়তো, আমি পাঠককে নিরাশ করব। হয়তো পাঠকও আমাকে।

"বিকল্প"। অগ্রহায়ণ ১৩৬০

এই দিল্লী

সন্তোষকুমার ঘোষ

আয়তনে করতলগত আমলকীবৎ, তবু দিল্লী রাজ্য; ঘটি ডোবে না কিন্তু তালপুকুর। রাজ্য বটে, তবে সে কি আর সুবে বাংলা-বিহার-বোম্বায়ের মত। রাষ্ট্রসংহিতার বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় দিল্লী বৈশ্যবর্ণ। তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি কেন্দ্রীয় সরকারের চোখে চোখে না থাকতে হত। যে সব ছেলে দূর দেশের চাকুরে, সেখানেই ঘরকন্না পেতেছে, বাপের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নামমাত্র। মুশকিল সেই নাবালক ছেলেটির যে সর্বদা কাছাকাছি আছে।

সেই মুশকিল দিল্লীরও। পাত্রমিত্র অমাত্য সব আছে, কিন্তু ডেমোক্রাসি এখানে হাঁটি-হাঁটি-পা-পা। রাজ্যসভা আছে, তার মেম্বারেরা জন-ভোটে নির্বাচিত, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম না নিয়ে সেখানে কোন বিল পেশ কিংবা পাশ হবার উপায় নেই।

উপরন্তু আছে পৌরসভা। বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির মতো দিল্লীতে পৌরসভা অনেক। কোনটায় শাসন লোকায়ত্ত, কোনটা বা সরকার-মনোনীত। শাহী শশিকলা কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে কবে অস্ত গেছে। জুমা মসজিদের আনাচে কানাচে কাণা গলিতে যারা জামা রিফু, টুরিস্টের জুতোর খবর্দারি বা মিঠে পান ফিরি করে তাদের ক'জন শাহানশার বংশধর জানিনে। সরকারী মাসোহারার খাতায় তাদের নাম থাকতে পারে। এদের কেউ কেউ নতুন অবস্থার সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছে। আফসোস হয়ত আছে, নালিশ নেই। যারা পারেনি, তারা আজও পুরনো দিনের স্বপ্ন দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ঝিমোয়।

* * *

শীতের সবে দু'একটি দাঁত উঠেছে, কিন্তু রাস্তা ইতিমধ্যেই 'গ্রে' অর্থাৎ ছাইরঙা পাৎলুনে ছেয়ে গেছে। সব কটা দাঁত উঠলে দিল্লীর শীতকে গ্রেহাউন্ড বলা চলবে।

শীতে শোভা শুধু কাকের আর দিল্লীর। সারা বছর নিরম্বর, নিরম্বু

তপস্যার পর শিশির গণ্ডূষে ব্রতভঙ্গ। আকাশে নীলকমল, মাটির আকাশ 'পরে তৃণদলের ডানা ঝাপটানি। তালকটোরা বাগান এখনও পুষ্পোভিরাম স্তবকাবনম্র হয়নি, এখনও একটু দ্বিধা আছে আর দুদিন পরে থাকবে না, দেখা দেবে কাঁচা সোনা শালমঞ্জরী, গাছের চূড়ায় চূড়ায় সবুজ পাতার টোপর।

আর শীতের সাড়া পায় কনট-চক্কর। দোকানে দোকানে গাত্রত্রাণের বিপুল সমারোহ। দপ্তরী দৈনন্দিনতার পর সেখানে সন্ধ্যায় শহরের কেরাণী-প্রাণ দীর্ঘ মুক্তিশ্বাস ফেলে। জেণ্টলম্যানিরা 'টাই'-টম্বুর, কিংবা কামিজে বো বিঁধে প্রজাপতি; আর লেডিদের শৌখিন শপিং। কিছু কেনা বেশিটাই না-কেনা। সব কিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দরদস্তুর করে ইচ্ছাপূরণ। ঘ্রাণে যদি অর্ধ-ভোজন, স্পর্শে অন্তত তিন পোয়া।

চা-কফিখানাও মন্দ জমেনি; এর কোনো কোনোটাতে দেখা মেলে নৃত্যপরা অপ্সরার, সারা বছর শৈলশিখরে কাটিয়ে শীতের শুরুতেই, রেসের ঘোড়ার মত, যাঁরা নেমে আসেন সমতলে, রাজধানীর কাবারেতে বছর-কাবারি করতে।

কিন্তু ও-রসে যাঁরা বঞ্চিত, মুশকিল সেই শতকরা আশি-বিরাশি জনের। এঁরা বেলা ফুরতেই ঢোকেন গিয়ে কোটরে। প্রত্যূষে খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখেন সফদরজঙ্গ আর পালমের তাপমানযন্ত্রে পারদের কতদূর অধঃপতন হল। এখনও তেমন শোচনীয় হয়নি। গোটা গ্রীষ্মে বাহাত্তুরে পাওয়া 'মিনিমম্' এখনও চল্লিশের নীচে গড়ায়নি। এতেই হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি, হি-হি কাঁপুনি। তবু তো আবহ-সন্দেশ বলে 'স্বাভাবিকের চেয়ে দু'তিন ডিগ্রী বেশী।'

নবেম্বর, ১৯৫২

বললুম রাষ্ট্রপতিভবন, টঙ্গাওয়ালা বুঝলে না, শূন্য-চোখে চেয়ে রইল। সুতরাং ইংরাজি করে বলতে হল ভাইসরয়েজ হাউস। ঘাড় নেড়ে বললে, বুঝেছি, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। তবু নিশ্চিন্ত হতে বললুম, বড় দফতরের পেছনে। বললে, হাঁ-হাঁ, যেখানে মেলা বসেছে।

মেলা মানে ফুলের মেলা, টাঙ্গাওয়ালা জানে কিনা জানিনে, ফাল্গুনের শুরু থেকেই এই রঙের আড়ংয়ের ফটক সাধারণের কাছে খুলে গেছে। নর্থ এভেন্যুর মুখ থেকেই ভিড়, পথচারীর, ঘোড়াগাড়ির, মোটরের,

অসহিষ্ণু সাইকেলের। কেননা, কয়েদী ফুলগুলির এ-মুক্তি মেয়াদী, মাসেক পরেই দরজা রুদ্ধ হয়ে যাবে, কেউ এগোলেই জোড়াগোড়ালি শান্ত্রী পাথরে বুট ঠুকে বলবে খবর্দার!

প্রবেশ-পথের মুখেই চক্রাকার একটি ধারাযন্ত্র, ধূপছায়া প্যাসেজের শেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপরেই মোগল উদ্যান। লাল পাথরের পায়ে-চলা পথ, দু'পাশে মুঠো মুঠো প্যানসী, দেয়ালে দেয়ালে বেগোনিয়ার জাফরানী আঁচল লতান, পরিপাটি-ছাঁটা শিশু-ঝাউ আর, সারাদিন মর্মর থথর, কাঁপে পাতা-পত্তর। স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, নানা পুষ্প। রঙের হোলি না দেয়ালী বলব জানিনে। বয়স যাদের আছে, তাদের ছুটোছুটির শেষ নেই, বড় হরফে ছাপা দশটি অনুজ্ঞা না মেনে কেউ চয়ন করেছে লাল-গোলাপ, কেউ কেউ স্তোকনম্র ডাল থেকে নারঙ্গী, কেউ সঙ্গিনীর ছবি তুলে মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চাইছে। আর যার পাশে যাই তারেই ভাল লাগার বয়স যাদের গেছে তারা পা ছড়িয়ে বসেছে পাষাণ-সোপানে, ফোয়ারার স্ফটিক-শুভ্র জলের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে আছে।

সন্দেহ কী, বসন্ত এসেছে। হিম নেই ঘাম নেই, ভারী ভারী ছাই-রঙ পোশাক ঘরে ঘরে ফের তোরংজাত হল। আবহমন্দির এখনও নিয়মিত শীতাতপের দৈনন্দিন বুলেটিন প্রচার করে, কিন্তু তা নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা নেই। থাকবেও না, সেই ফাল্গুনের শেষ অবধি। তারপর বৎসরান্তে হঠাৎ আবার দেখা যাবে এই প্রজাপতি দিন ফুরিয়েছে, ধূলি-ঝড়ে দিগন্ত ধূসর; ময়ূরকণ্ঠী উত্তরীয় ফেলে অমিতাভ-বসন্ত কাষায় মাত্র সম্বল করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। সেই দগ্ধ দিনেও কুতুবের চরণে প্রণত একটু ছায়া পড়ে থাকবে, আরেকটু থাকবে কোটলা ফিরোজ-শা'র বিষণ্ণ পরিবেশে, হুমায়ুনের কবরে, লোদীর পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপে।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

সরকারীভাবে ফেয়ারওয়েল পেয়েছে কবে, সে-ই শ্রীপঞ্চমীর দিনে, এতদিনে শীত ঋতুর ফের হিমালয় গুহায় ফিরে গিয়ে লুকানোর কথা; কিন্তু যায়নি, গত পক্ষকাল ধরে তার এই-আছে-এই-নেই লুকোচুরি চলছেই। ওদিকে বসন্তও নামিয়েছে তার মোটঘাট, সেলামীর টাকা গুণে দিয়েও দখল না-পাওয়া ভাড়াটের মত চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে। এই জবরদখলের মেয়াদ আর বেশি না, বড় জোর সপ্তাহখানেক।

তারপর এই ধূমল দিনের শেষ হবে, বসন্ত হঠাৎ পুষ্পে-পর্ণে, গন্ধে-বর্ণে ফেটে পড়বে—তালকটোরায়, ফিরোজ শা কোটলায়, নয়াদিল্লীর জ্যামিতি-শাসিত বীথির তরুছাতার মাথায় মাথায়, মোগল গার্ডেনের নির্মক্ষিক নিভৃতিতে, আরাবল্লীপ্রান্ত রিজের অরণ্যঘন সানুদেশে। রোতক রোড আর পালাম-ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে বিসর্পিত ম্যাকাডাম পথের দু'ধারে পত্র-পুঞ্জের ছায়ায় ঝিমান ঝিল—হিম ঋতুর শুরুতেই সেখানে টীল-ডাক-স্নাইপেরা বাসা নিয়েছিল নবাঙ্কুরিত শস্যকণার লোভে লোভে, তাদের কিছু কিছু শৌখীন শহুরে ব্যাধের শিকার হয়েছে; বাকী যাযাবর হাঁস-গুলি মৃত্তিকায় উত্তাপের ইসারা পাওয়ামাত্র ফের ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাবে। কারনাল আর পানিপথের দিশাহারা মাঠে যূথভ্রষ্ট দু'একটি হরিণশিশুর সঙ্গে তবু দৈবাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে।

মার্চ, ১৯৫৩

শীতে মোহিনী দিল্লী, গ্রীষ্মে যোগিনী

নয়াদিল্লীর পথে পথে স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু যার বসতি, সেই রাজধানীর আত্মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে রাম নেই, সিমলার অযোধ্যাও নেই, পালাবে কোথায়। কবে হোলির দিনে আবীর লেগেছিল, বাগানে বাগানে কৃষ্ণচূড়া তার চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে। আকাশে মেঘ নেই, ধুয়ে মুছে দেবে কে। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ কেটে গেল, ফাগ কুঙ্কুম ফুরিয়েছে, দিগ্বধূ থারি ভরে নিয়েছে ধূলোয়। আর দু'দিন কাটুক, আরও একটু সাহস বাড়বে তার, সেই ধূলোই মুঠো মুঠো ছড়াতে শুরু করবে। তারপর একদিন ধূলার মাঝে গোটা নগরটাই উহ্য হয়ে যাবে। রোগীর শিয়রে উৎকণ্ঠিত আত্মীয়ের মত আমরা সেদিন ঘড়ি-ঘড়ি জ্বরের চার্ট দেখব। পরশু কত ছিল? একশো ডিগ্রী। কাল? একশো চার। আজ? একশো আট। মুখ ভয়ে কালো হয়ে যাবে। না, আর আশা নেই।

প্রগতি মানে যদি শুধু নূতনকে গ্রহণ করা হত, তবে কথা ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরনোকেও ছাড়তে হয়, বেদনা সেখানেই। বিশ শতকের মধ্যাহ্নে পিছন দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের প্রথম যুগের সঙ্গীদের কেউই প্রায় আজ পাশে নেই। হাতি কবেই বিদায় নিয়েছে, ঘোড়াও যাই যাই করছে। যে পথে পাল্কি গেছে, সেই পথে একরকম আমাদের

চোখের সম্মুখেই ছ্যাকরা গাড়িও অন্তর্হিত হল। কে জানে, হয়ত একদিন রেলও যাবে, এখন যেমন ট্রামের বিদায়ের পালা চলছে। মাদ্রাজ থেকে সে কিছু দিন আগেই সরে গেছে, তারও আগে লন্ডন থেকে। এবার শুনছি দিল্লীর পালা।

দিল্লীর ট্রামে কখনো চড়িনি। প্রবৃত্তি হয়নি। জুমা মসজিদ, চাঁদনিচক, লালকুঁয়া আর সব্জিমন্ডি—পুরনো শহরের ছোট পরিধির মধ্যেই তার গতিবিধি, নতুন রাজধানীতে প্রবেশের অধিকার কোন দিন পায়নি। পলকা একটা টিনের বাক্সর মতো রঙচঙে, যত না চলে তার চতুর্গুণ আওয়াজ তোলে; চলে, হাঁপায়, জিরোয়, ফের চলে। বয়স তার ঢের, সিপাহী বিদ্রোহ দেখেনি, তবে দরবার দেখেছে, দেখেছে ভাঁটালাগা দিল্লীতে কেমন করে আবার জোয়ার এল।

এবার সে ছুটি পাবে। তাকে কেউ ভালবাসেনি, অকর্মণ্য জীর্ণ-জর্জর যন্ত্র মাত্র। তার বিদায়ে একটি দীর্ঘশ্বাসও হয়ত পড়বে না। খবরের কাগজে ছোট শোক-সংবাদ ছাপা হতেও পারে......সহৃদয় ফীচার লেখক লিখবেন 'এ স্ট্রিটকার নেম্ড ডিফাংকট'। যে গেল তাকে ভুলে গিয়ে অনেকেই কখন বাস আসবে সাগ্রহে তার প্রতীক্ষা করবেন। আর আমাদের মত যাঁরা সিনিক, দিল্লীর বাসের রীতিনীতি জানেন, তাঁরা হয়ত ভাববেন, ঝোপের দুটি বাসের চেয়ে হাতের একটি ট্রামই বুঝি ছিল ভাল।

সেকাল-একাল

কিছুদিন থেকেই নয়াদিল্লী নিস্তরঙ্গ, সংসদ নেই, সুতরাং সংবাদও না। সংবাদও না, কথাটা বোধ হয় ভুল হল। জীবন যদি থাকে, তবে খবরও থাকবে বৈকি। কিন্তু আমরা, একালের শহুরে লোকেরা, খবর বলতে বিশেষ এক শ্রেণীর উত্তেজনাই বুঝে থাকি। মাথা ফাটাফাটি না হোক, অন্তত কথা কাটাকাটি, নিদেন পক্ষে গরম গরম বক্তৃতাও যদি না থাকবে তা হলে আর খবর কী।

না, গত পক্ষকালে কোন মানুষ কুকুরকে কামড়ায়নি। কিন্তু সংবাদের এই প্রাচীন সংজ্ঞার বাইরেও অনেক কিছু ঘটে, কেন না যমুনার জলের মত জীবনের প্রবাহও তো একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু তার বেশির ভাগ ঘটনাই পড়ে থাকে ছাপার হরফের সীমানার বাইরে, ব্যস্ত মানুষের উপেক্ষিত, দেখেও-না-দেখা জগতে। যেমন ধরুন, যদি

বলি দিল্লীর দেয়ালের ফাটলে একটি অশথ গাছের চারা পাতা মেলেছে, অনেকে শব্দ করে হেসে উঠবেন, বলবেন একী আবার একটা খবর। তাঁদের বলি, চুপে চুপে যা ঘটে তাও খবর। জানি, কোটলা ফিরোজ শা, কুতব আর হাউজ খাসের বাগান ফুলে ছেয়ে গেছে একথা কাগজে কখনো ছাপা হবে না। রিজে শীত-শেষের ঝিরঝিরে হাওয়াটুকুর খবরও না। পুরানা কিলার ভিতরে নতুন উদ্বাস্তু কলোনি, সেখানে অনেকগুলি নারী-পুরুষের নতুন করে শিকড় খোঁজার কাহিনীও লোক-লোচনের আড়ালে থেকে যায়। ট্যুরিস্ট আসে, ছবি তোলে অতীতের কঙ্কাল আর পঞ্জরাস্থির, ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকায় সদ্য আবিষ্কৃত বোবা মৃৎকলসীটির দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে. কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে প্রাণের নবাঙ্কুর তাঁদের চোখে পড়ে না।

বনে বনে এখন ফাগুন লাগেনি, তবু আরেকটি শীত এসে যাই-যাই করছে। বুঝতে পারছিনে এটাও একটা দেবার মত খবর কি না। সব্জিমণ্ডির পাশ কাটিয়ে অপার রিজের পথ ধরতেই পচা ন্যাসপাতি আপেলের গন্ধ নাকে এসে লাগে, তাতে নেশার স্বাদ আছে। বিসর্পিত অক্টোপাস রাস্তার বেষ্টনী পেরিয়ে, সিভিল লাইন, ম্যাল, তারপর টিমারপুর। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, সেখানে উত্তুরে হাওয়া, পড়ন্ত আলোয় রাজস্থানী মজুরেরা ঝুড়ি ঝুড়ি নুড়ি লরীতে তুলে দিচ্ছে। তাদের কোমর-সমান উঁচু বাড়ি পাথরের উপর পাথরের চাঁই তুলে বানানো— এও এক রকমের স্থাপত্য, তবে বড় ঘুপচি, বড় নড়বড়ে; বিলাসী বাদশার খেয়ালের রচনা নয়, শ্রমজীবী মানুষের টিকে থাকার তাগিদে তৈরী। সে সব কুঠুরীতে ঢুকতে হলে হামাগুড়ি দিতে হয়, অচেনা মানুষের পায়ের সাড়ায় সুখা-ভূখা একটা নেড়ী কুকুর খামোখা চেঁচিয়ে ওঠে কিন্তু তাকে থামাতে ধমক দিতে হয় না, হঠাৎ দূরে বাজ পড়ার আওয়াজ শুনে সে নিজেই চুপ করে যায়। বাজ নয়, বন্দুক নয়, টায়ার ফাটাও না। ডিনামাইট। কঠিন পাথুরে মাটি নুড়ি নুড়ি হয়ে গুঁড়িয়ে যায়। পাহাড় ফাটছে, রেলওয়ে পুল বাঁধার প্রয়োজনে। বিন্ধ্য মাথা নত করে সভ্যতার রথকে পথ দেয়, বন ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে যায়। বিস্ফোরণের শব্দে ত্রস্ত কাক-চিল কর্কশ রব তুলে দিগ্বিদিকে ওড়ে, সমস্ত চরাচরে এই হামলার বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ নেই।

কোন রোমহর্ষক চাঞ্চল্য ছিল না, হাতে জরুরি কোন কাজও না, তাই কয়েকদিন ক'জন অতিথির সঙ্গে ঘুরেছি, নতুন করে পরিচয় করেছি চেনা দিল্লীর সঙ্গে। হুমায়ুনের সমাধির শীর্ষে উঠে দিগন্তের দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থেকেছি। একটু দূরেই যমুনার শীর্ণ লেখার পাশাপাশি রেলওয়ে রেখা, এপারে লোদী উদ্যানের ধ্বংসস্তূপের কাছেই সারি সারি সরকারী কোয়ার্টার। একদিকে ধূলিলীন প্রাচীন, অন্যদিকে স্পর্ধিত নবীন। পুরানা কিল্লার নিপাল্লা জানালাগুলি মণিহীন, অন্ধ অক্ষিকোটরের মত; একটু এপাশে তাকালেই ইণ্ডিয়া গেট তোরণের ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে নতুন সেক্রেটারিয়েটের জোড়া-গম্বুজ অহঙ্কার, অখণ্ড মণ্ডলাকার পার্লামেণ্ট। বিরাট প্রাণ আর বিরাট মৃত্যু মুখোমুখি। এই মৃত্যুকে আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করতে চান যদি, চলে আসুন তুঘলকবাদে—সফদরজঙ্গ চিরাগ-দিল্লী ছাড়িয়ে, মেহেরোলি পেরিয়ে সৃষ্টিবিলাসী মানুষের কীর্তির পরিণাম দেখে যান। প্রাকার এখানে-ওখানে ধ্বসে পড়েছে, কোথাও আস্তরের বিন্দুমাত্র আবরু নেই, তার ফোকরে-ফোকরে দুষ্টু দুয়েকটি কাঠবিড়ালীর লাফালাফি ছাড়া প্রাণের সব চিহ্ন লুপ্ত। চত্বরের পর চত্বর পাথরের টুকরোয় পরিকীর্ণ; নিপুণ স্থাপত্যের সাক্ষী একটি কি দুটি মিনার কালের নিষ্ঠুর থাবা সয়েও কোনক্রমে টিঁকে আছে। ইতস্তত অন্ধ সুড়ঙ্গপথ, ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি টপকে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে বোঝা যায়, সব শূন্য, কানের কাছে বুড়ো গাইডের অনর্গল বিড়বিড় অর্থহীন প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। এই কাঁকর, পাথর আর রুদ্ধশ্বাস মাটির তলায় সুলতানের অমৃতত্বের সাধ চিরকালের মত চুপ হয়ে আছে।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'। এপ্রিল ১৯৫৩

আঁ চ ল

বিমল কর

একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বয়সে যখন আমি বালক, আদি-রসাত্মক জ্ঞানমার্গে কোন অধিকার জন্মায়নি, তখন থেকেই মেয়েদের শাড়ির আঁচলের ওপর (শুধু 'আঁচল' শব্দটাই অবশ্য যথেষ্ট হ'তো) আমার ভীষণ টান। কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'লো, স্পষ্টভাবে আজও তা বুঝতে পারি না। তবু মনে হ'য়েছে, আমার মা এবং ছোট মাসীর আঁচলে সর্বক্ষণ চোখ রেখে রেখেই দৃষ্টিটা সেই ছেলেবেলা থেকেই আঁচলমুখো হ'য়ে থাকল। মার কথা মনে পড়ে; তাঁকে দেখতুম, পিঠের ওপর চওড়াপাড় শাড়ির আঁচলটা ছড়িয়ে আছে, এক কোণে তার চাবির রিঙ্ বাঁধা। বালক মনকে আকর্ষণ করার মতন যতগুলি ভাণ্ডার ছিল বাড়িতে, প্রায় সেই নীলদাড়িবালা বুড়োর গল্পের মতনই মা সেগুলিকে চাবিবন্ধ করে রেখেছিলেন। এখনও বেশ মনে পড়ে, মেহগনি কাঠের ছোট্ট একটা হাতবাক্স ছিল মার। বালিকা বয়সে যখন নববধূর বেশে স্বামীগৃহে আসেন তখনই সঙ্গে করে এনেছিলেন, শ্বেতপাথরের আর বিলিতি কাঁচের পুতুল ভর্তি করে। পুতুলের সেই হাতবাক্সটির ওপর আমার লোভ ছিল খুব। কিন্তু মার আঁচলের চাবি আমার উদগ্র লোভকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যর্থ করেছে। এ ছাড়াও মনে পড়ছে, জালিদেওয়া সেই আলমারিটার কথা, যার মধ্যে আচার মোরব্বা ইত্যাদি জিভে-জলটানা টুকটাক খাবার থাকত তালাবন্ধ হয়ে। আর একথা না বললেও চলে, সেই তালার চাবিও থাকত মার আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার মধ্যে। সেই থেকে মার আঁচলের ওপর আমার দৃষ্টিটা হয়ে উঠেছিল সতীন-সুলভ। ভাবতুম সব সর্বনাশের মূল ওই আঁচল। ঈশ্বর যদি মার ওই আঁচল নামক জিনিসটুকু না রাখতেন, চাবির গোছা সব সময় পিঠে পিঠে বয়ে বেড়ানো মার পক্ষে কি সম্ভব হ'তো? কখনোই না। ওটা থাকত কোথাও ইতি-উতি আর তা হস্তগত করা অসাধ্য হ'তো না আমার। আজও অবাক হ'য়ে ভাবি, কতো দুপুরে ভীষণ লক্ষ্মীছেলে সেজে মার পাশে গলা জড়িয়ে শুয়েছি, তারপর সুযোগ বুঝে কতো সন্তর্পণেই

না চেষ্টা করেছি আঁচলের গিঁটটা খুলে চাবির গোছাটা হস্তগত করার! দুর্ভাগ্য আমার, পুত্রের সকল চেষ্টাই জননী অনায়াসে ব্যর্থ করেছেন। বেশ বুঝতে পারি বাল্যকালে যে ঐশ্বর্যের প্রতি আমার সতত আসক্তি ছিল মার আঁচলই সেই ঐশ্বর্যের অধিকারে বাদ সেধেছে। অথচ, আশ্চর্য, যখন দেখতুম, গলায় আঁচল জড়িয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছেন মা, প্রণাম করছেন—তখন, কি জানি কেন, হয়ত সেই বিশেষ মুহূর্তের রূপটুকুই আঁচল সম্পর্কে আমার সতীন দৃষ্টিকেও কোমল করে তুলতো।......এই তো গেল মার কথা, তারপর আসে ছোট মাসীর আঁচল। মাসীর আঁচলকে ছেলেবেলাতেই মনে হয়েছে, দেবতার বর রাখা ঝুড়ি, খুশির পুঁটলি। তখনও মাসীর বিয়ে হয়নি; মার মতন ভব্য-সভ্য হয়ে আঁচল ঝোলায় না, চাবি বাঁধে না কোণে। তার আঁচল এই হাওয়ায় উড়ছে, এই লুটোচ্ছে ধুলোয়, কখনো কোমরে জড়ানো, কখনো বা পুঁটলি হয়ে ঝুলছে পিঠে। কোন্ ভোরে মল্লিকদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মাসী বেল ফুল তুলছে, হয়তো বা গাছতলা থেকে মুঠো মুঠো শিউলি কুড়িয়েছে—সব দেখো আঁচলে বাঁধা। বাড়ি এসে মাসী আঁচল খুলে সব ফুল উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে আমার হাতে। শুধু কি ফুল? অল্প অল্প শীতের আমেজে, মাথায় গায় রুদ্দুর মেখে, দুপুরে লুকিয়ে লুকিয়ে মাসীর আঁচলে বাঁধা কাঁচা কুল আমরা কী মজা করেই না খেতাম। চেয়ে চিন্তেও মার কাছ থেকে যা জুটতো না, না চাইতেই মাসীর আঁচল থেকে চুপি চুপি তা টুপ্ করে ঝরে পড়ত আমার হাতে। গালমন্দ, কানমলা, থাবড়া খেয়েছি মার কাছে, মাসী এসে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছিয়েছে। খেলতে গিয়ে হাত পা ছড়ে-কেটে যদি বাড়ি ফিরেছি মুখ চুন করে মাসী ছুটে এসে কাটা-ছড়া জায়গা জড়িয়ে ধরেছে রক্ত বন্ধ করতে। আর এতো আমার অভ্যেসই ছিল, ঘুমোবার আগে যত রাজ্যের গল্প শোনার সময়, মাসীর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে, পা ঢাকা দিয়ে বসতাম। আমার ভাগ্য ভালো, মাসীর আঁচল ছিল সর্বদাই সদয়, মার নির্দয় আঁচল দেখে দেখে হয়তো আমার বীতরাগ জন্মে যেত আঁচলের ওপর। ছেলে বয়সের এই আঁচলমোহ, আঁচলমুখো চোখ আর অন্য কোথাও থেকে আবেগ উৎসাহ ধার করে নি, কেবল আর একটি জায়গা ছাড়া। আমাদের স্কুলে যে বাঙলা বই পড়ানো হতো তাতে ছিল এক কবিতা, নাম 'শরৎ', রবীন্দ্রনাথের লেখা। কবিতাটা তো অসম্ভব সুন্দর ঠিকই, ছেলেবেলায় আরও সুন্দর মনে হ'তো, বিশেষ করে পুজোর আগে-আগে সময়ে। ,যেন চোখের

সামনেই শরৎকালের বাঙলা মাকে দেখতে পেতুম। কবিতাটা মুখস্থ করার ধুম পড়ে যেত আমাদের। আর ক্লাসেও মাস্টারমশাই, প্রায় নিত্য তার অংশ তুলে তুলে অর্থ লেখাতেন। এই কবিতায় দুটি অংশ আছে, যা ছেলেবেলায় আমায় যত আনন্দ দিয়েছে, তত বিস্ময় আর কল্পনা। 'ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার নবীন জীবন উড়ায়ে—' এই লাইনটি পড়তাম আর ইলিবিলি মন নিয়ে ভাববার চেষ্টা করতাম, বাতাসের আঁচল—আহা, না জানি কী সুন্দর জিনিস! সে আঁচলের রঙ কি সাদা, তার কি পাড় আছে লতাপাতায় বোনা কিম্বা শাঁখ আঁকা আঁকা?......এই কবিতার আর এক জায়গায় আছে—'মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য, গন্ধে ভরেছে অবনী। জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী।' কানের কাছে যে শরৎ গুন গুন করত, এই কটি লাইন পড়তে পড়তে সেই গুনগুনোনি হঠাৎ থেমে যেত। শেফালির মালা যেন চোখের সামনেই দেখতে পেতাম কিন্তু 'জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত'—এ আর কিছুতেই কল্পনায় আসতো না। ভেবে ভেবে যখন আকুল, আকাশ দেখে দেখে অধীর তখন ছুটে যেতাম মাসীর কাছে। 'ও মাসি, আমায় জলহারা মেঘ আঁচল দেখাও!'.....মাসী হাসত। বলত, আয়, দেখাই।

আর পাঁচজনের মতন আমারও বাল্যকালের বেলা বয়ে গেল, কেটে গেল কৈশোর, এসে পেঁছিলাম যৌবনের দরজায়। ধুতরো-ফুলের মধুখাওয়া নেশাকরা পাখিরা আগল খুলে দিল। বিচিত্র ইন্দ্রপুরী; স্থলে জলে শুধু রঙ, শুধু সুর, আকাশ-মাটিতে খুশির হোলি খেলা, মনে মনে আবীর ছোঁড়াছুঁড়ি। এই তো যৌবন, জীবনভোরের একটি বসন্ত ঋতু। দুঃখ থাক, দায়িত্ব থাক, রোগ শোক তাপ—থাকনা সবই, তবু যৌবন ফুটে উঠবেই, হিম পাঁক আবর্জনা সব তুচ্ছ করে পদ্ম ফুলের মতন নিরালা কোনো পুকুরে। আর একবার সে সূর্যের দিকে মুখ তুলে চাইবেই। এই চাওয়াটুকু ঘিরে যত কাঁপন, যত ব্রীড়া, যে আশা, আশাতীত কামনা, কল্পনা, বাসনা—তাকে নিয়েই কাব্য। যৌবনের, জীবনের। রসের সিঞ্চনে এ কাল, এর কাব্য সিক্ত। যখন এই রসের সমুদ্রের স্বাদ পেলাম, দেখলাম. এখানেও অনেক আঁচল আছে, অনেক আশ্চর্য সুন্দর আঁচল যাতে কাঁটা বিঁধে যায়, যে আঁচল খুলে পড়ে, হাতছানি দেয়, আপন বিভবে ময়ূরের পাখার মত ছড়িয়ে থাকে ঝিকিমিকি রঙ মেখে। আমি তো ভাবতেই পারি না, যুবক ~~বয়সে~~ কোনো না কোনো আঁচল দেখে মুগ্ধ না হ'লো, মতিভ্রম না ঘটলো, মাতাল না হ'লো এমন

কেউ আছে এ ভূভারতে। যে লোক হয় নি, এমন যদি কেউ থাকে, তবে বলবো চোখ থেকেও সে অন্ধ; তার চিত্ত আছে, রসানুভূতি নেই। আর যিনি রসিক তাঁর চোখে আঁচল যে আকাশের মতন, স্বপ্নকল্পনার দিগন্ত। এই সামান্যই তাঁর চোখে অসামান্য হ'য়ে ধরা দেয়। তাই কি নয়? 'শকুন্তলা' নাটকের সেই দৃশ্যটির কথা ধরা যাক—যেখানে পরস্পরকে প্রথম দেখে দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা পরস্পরের প্রতি অনুরাগাসক্ত হ'য়ে উঠেছে। সাক্ষাৎ এবং সামান্য কিছু আলাপ-আলাপনের পর শকুন্তলা রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সখিপরিবৃতা হয়ে, অথচ পা এগিয়ে চললেও মন যেতে চায় না; মন বলছে, আর একটু দাঁড়াও দুষ্মন্তের কাছে। ভীরু তাপসকন্যার অনুরাগ সঞ্চারের, মন-চাঞ্চল্যের এই মুহূর্তটুকু ফুটিয়ে তুলতে কালিদাস যে চিত্র এঁকেছেন তাতে দেখি, যেতে যেতে শকুন্তলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। অনসূয়াকে বলছে, সখি, একটু দাঁড়া; কুশাঙ্কুরে আমার পা কেটেছে, কুরুবকের ডালে আমার বাকলের আঁচল জড়িয়ে গেছে, ছাড়িয়ে নি। এই কথা বলে শকুন্তলা ঘাড় বেঁকিয়ে বাকলের আঁচল ছাড়াবার ছলে দুষ্মন্তকে দেখে নিচ্ছে আবার। বলা বাহুল্য, কালিদাস যদিও 'আঁচল' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, তবু বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়, পিছন থেকে কুরুবকের ডালে আর কি আটকানো সম্ভব একমাত্র বাকলের আঁচল ছাড়া। ......এই চিত্র ছাড়াও আর একটি চিত্রের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। শকুন্তলা যখন কন্বমুনির আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে—সেই অপূর্ব বিদায় দৃশ্যটির কথাই বলছি। কোন শিল্পীর আঁকা এক ছবি দেখেছিলুম, এই দৃশ্যটি যার উপজীব্য। তাতে ছিল, রোরুদ্যমানা শকুন্তলা পথ চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছন থেকে এক হরিণশিশু এসে শকুন্তলার বসনের আঁচল ধরে টানছে। এই সেই হরিণশিশু—শকুন্তলা নাটকে যার বর্ণনায় আছে, সুতীক্ষ্ণ কুশাগ্রে এই মৃগশিশুর মুখ ক্ষতবিক্ষত হলে, শকুন্তলা স্বহস্তে ইঙ্গুদী ফলের তেল দিয়ে, মুঠো মুঠো শ্যামাধানের শিষ খাইয়ে যাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, যাকে সে পুত্রের মতো দেখতো। আজ শকুন্তলার যাবার বেলায় সেই হরিণশিশুও এসে বাধা দিচ্ছে। ......বলতে কি, আমি তো ভেবেই পাই না, সামান্য আঁচল থেকে যে অনন্যসাধারণ দুটি মুহূর্ত, দুটি চিত্র সৃষ্টি হ'লো, তা আর কিভাবে হতে পারতো, আর কোন্ অতিসাধারণ জিনিসের সাহায্য নিয়ে!

এমন কোন ভারতীয় কবি, কে আছেন জানি না আঁচল সম্পর্কে

যিনি উদাসীন থাকলেন। জয়দেবকে দেখেছি শ্রীরাধার বসনাঞ্চলকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসেরও যথেষ্ট দুর্বলতা দেখেছি রাধার আঁচলের ওপর। এঁদের রাধা আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢেকে বিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাত্রে অভিসারে যান, চঞ্চল কানুকে বেঁধে রাখতে চান আঁচলে। রাধার আঁচল বাতাসে উড়ে গেলে কবিদের মনে হয় আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল। আর কৃষ্ণর কথা নাইবা বললুম, রাধার আঁচল ধরে টানতে তাঁর সংকোচ নেই।......হয়তো মনে হতে পারে আঁচল নিয়ে কাব্য করার সময় নেই, তখনই শেষ হয়েছে। এমন মনে হলে বলবো, এ ধারণা ভুল। রবীন্দ্রনাথের চোখেও আঁচল কিছু কম সুন্দর মনে হয়নি, কোথাও এমন নিদর্শন নেই যাতে মনে করা যেতে পারে আঁচল-বিহীন বসনের সৌন্দর্যকে তিনি অধিকতর মনোহর মনে করেছেন। বরং তাঁর চোখে আঁচল যে কত নব নব রূপে এসে দেখা দিয়েছে তার দু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবির 'ভ্রষ্ট লগ্নে'র নায়িকা ময়ূরকণ্ঠী কাঁচল পরে 'দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে' টেনে দেয়, তাঁর কাব্য-লোকের তরুণ-তরুণীরা অনঙ্গ দেবতাকে সম্বর্ধনা জানাতে পথে 'আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী' ছড়ায়, তাঁর আত্মসমর্পণ-আকুলা নায়িকা প্রিয়ের চরণে সমস্ত সমর্পণ করে কাঙাল হয়ে বলে, 'আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস...'। শুধু এতেই শেষ নয়, দূর-কালের গার্হস্থ্য কোন চিত্র যখন মনে আসে কবি এমন সেবিকাকেও চোখে দেখতে পান, যে তাঁকে 'আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়, সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে।'

কাব্যসাহিত্যের প্রাঙ্গণ থেকে নেমে এসে যখন দাঁড়াই আমাদের এই প্রাত্যহিক জীবনে তখনই কি আঁচলের সব সুধা নিঃশেষ হয়ে যায়? না, তাও নয়। তা যে হয় না, সে কথা তো আগেই বলেছি। মার আঁচল, মাসীর আঁচল, স্ত্রী, প্রিয়া এমন কি কন্যার আঁচলেও আমাদের মনের এক একটি বিশেষ বিশেষ সুখ, আশা, স্বপ্ন, শোক, সান্ত্বনা জড়িয়ে আছে। আসলে আঁচল যেন কিসের একটা প্রতীক, বিশেষ করে আমাদের এই বাঙালীদের জীবনে। সমাজে এর স্থান আছে, ধর্মে কর্মে, সর্বত্রই। বিয়ের গাঁটছড়া, সে তো বাঁধে নববধূর আঁচলে আর বরের উত্তরীয়ের সাথে। বিবাহের পর কন্যা যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে যায় তখন পিতৃগৃহের ঋণ যে তণ্ডুলকণা দিয়ে সে পরিশোধ করে যায়, মা আঁচল পেতে তা গ্রহণ করেন। এমনি আরও আছে, অনেক কিছু। তাই, মাঝে

মাঝে ভাবি, আমাদের সমাজের মেয়েদের মাপাজোপা আঁটসাট জীবনে, সংসারে দিয়ে থেকেও যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে, তাদের বসনের মতই, যার মধ্যে তাদের রাগ. অনুরাগ, স্নেহ, বিরহ, সতর্কতা, শোক আর সঞ্চয়—একান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই সঞ্চিত হচ্ছে—তারই কি প্রতীক নয় আঁচল?

'দেশ'। ১৬ মাঘ ১৩৬০

ছ দ্ম না ম

পত্রনবীশ

এতকাল সাহিত্যিকরা ভেবে এসেছেন, 'কি লিখবো' অথবা 'কেমন করে লিখবো'। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের সিংহচর্মে আবৃত হয়ে আরেকদল আসরে নেমেছেন, যাঁদের হাতেখড়ির প্রথম প্রশ্নই হ'লঃ কেন লিখবো? প্রশ্নটা সাহিত্যিকের, কিন্তু উত্তরটা নয়। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি উত্তরটা তাঁদের ঃ লিখবো শুধু আত্মপ্রচারের জন্যে। আমিও এ দলের। সাহিত্য বা সাহিত্যের বাজারকে টিকিয়ে রাখার ভার নিজের ঘাড়ে টেনে এনে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করার ইচ্ছে আমারও। কিন্তু জীবনে অসংখ্য প্রেমের চিঠি, বাজারের হিসেব, লেজারের খাতা লিখে নিব ভোঁতা করা কমলটা হাতে নিয়ে বাংলা ভাষায় জীবনের প্রথম অপ্রয়োজনীয় লেখা লিখতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটা সেলাম জানিয়ে সামনে দাঁড়ালো, তার মূল বক্তব্য শুনলাম, কি নামে লিখছো?

ভাবলাম, কথাটা ভাববার মতই। কি নামে লিখবো? 'কি লিখবো' এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতই ইলেকশন-জয়ী সদস্যের প্রতিশ্রুতির মত উবে গেল। লক্ষ্য বিষয়বস্তু থেকে ব্যক্তিতে গিয়ে পেঁছিলো। ভাবলাম, অসকার ওয়াইল্ডের 'অল আর্ট ইজ ইউসলেস' মন্তব্যটাকে যখন অনেকেই উল্টে নিয়ে ইউসলেস সব কিছুকেই আর্ট বলে জাহির করছেন শুধুমাত্র আত্মপ্রচারের বলে, তখন আমি এক অখ্যাত অজ্ঞাত হবু সাহিত্যিকই বা মহাজন খুরাঙ্ক অনুসরণ করে কেন না রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি!

এই বিখ্যাত হয়ে ওঠার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হ'ল ছদ্মনাম গ্রহণ করা। নামী হওয়ার চেয়ে বেনামী হওয়ায় একটা বিশেষ লাভ আছে, বেনামী সম্পত্তির মালিকের মত ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারা। সাহিত্যের ট্যাক্সো নিষ্ঠা আর পরিশ্রম, কিন্তু শ্রাদ্ধে মূল্য ধরে দেওয়ার মত ফাঁকির পিছন দরজা হ'ল ছদ্মনাম।

নিজেকে অপ্রকাশ্য রাখার ভাণ করে এত বেশী করে প্রকাশ করার জন্যে আস্তিনে লুকিয়ে রাখা একমাত্র টেক্কা এই ছদ্মনাম।

কে কবে প্রথম নিজেকে বেনামী করেছিল, তা জানি নে। সম্ভবত ছদ্মনামের জন্ম হয়েছিল মুখোশ থেকে। 'ওয়ান্স আপন এ টাইম' দিয়ে শুরু করা এবং ঈসপের নামে চালিয়ে আসা গল্পের গর্দভ আগে সিংহচর্ম পরেছিল, না দাঁড়কাক আগে ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু মানুষ যে ডাকাতি বা রাহাজানির জন্যে প্রথম মুখোশ আবিষ্কার করে এবং চুরি জোচ্চুরির দায় থেকে রেহাই পাবার জন্যে নাম ভাঁড়াবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে সে সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ছদ্মনামের সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়! হারুন অল রসিদের মত মহত্ত্ব লুকিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চলাফেরার জন্যেও ছদ্মনাম অনেকে নিয়েছেন। শেষোক্ত যুক্তিটা খুঁজে বের করতে হ'ল নিজেকে এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজনকে বাঁচাবার জন্যে। যাঁরা মহৎ তাঁদের কাছে ছদ্মনাম ত্যাগের সামিল, অন্তত একদিনের জন্যেও বাদশাহী তক্ত্ ছাড়তে হয় তাঁদের। কিন্তু যাঁরা সাধারণ, তাঁরা মোটা অঙ্কের ডিভিডেন্ড ভোগ করেন এরই কল্যাণে। বিশেষ করে সাহিত্য-যশপ্রার্থীরা। অজানাকে জানবার যে দুরন্ত মোহ, তাকে এত নিপুণভাবে এক্সপ্লয়েট করা অমুকচন্দ্র অমুকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, কিন্তু দুটি উল্টোনো যতিচিহ্নের মাঝখানে 'অমুক'এর পক্ষে স্বভাবজ। ছদ্ম-নাম সম্পর্কে পাঠককুলের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য আছে, আর ঔৎসুক্য জাগাতে পারাই লেখকের পক্ষে থ্রি-কোয়ার্টার সাফল্য।

এইসব বিভিন্ন যুক্তির বলেই সাধারণত অসাহিত্যিকরা ছদ্মনাম নিয়ে থাকেন, কিন্তু ছদ্মনামের অনুরাগী এই কারণে যে সত্যিকার সাহিত্যিক ও কবিদেরও ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে দেখেছি।

উদাহরণ: রবীন্দ্রনাথ

সব বিষয়েই যেমন রবীন্দ্রনাথ অন্যদের চেয়ে এক হাত উঁচুতে ছিলেন, ছদ্মনামের ব্যাপারেও তেমনি। কত বিভিন্ন নামে যে তিনি লিখেছেন, কখনো খেয়াল-খুশির জন্যে, কখনো বা উদ্দেশ্য ছিল বলে, তার ইয়ত্তা নেই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'মুদ্রিতবরণা', 'বীণা অভিলাস' এবং ভারতীতে 'দুদিন' লিখেছিলেন তিনি দিকশূন্য ভট্টাচার্য নামে। এ ছাড়া অকপটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াসী নাম দুটিও তিনি ব্যবহার করেছেন। আর বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি। সেদিন পুরোনো পত্রিকা 'ভান্ডারে'র জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যায় 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'র 'জলকণ্ট'

এবং পরের সংখ্যাতেই জবাবে 'শ্রীমতী মধ্যমা'র 'অহেতুক জলকষ্ট' পড়ে মনে হ'ল এ দুটিও রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে চমকপ্রদ নামঃ ভানুসিংহ।

ভ্যালেটের কাছে যে হিরো হওয়া যায় না, তা সাহিত্যিক মাত্রেই জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং আপিসের সহযোগী সকলের কাছেই পরিচিত সাহিত্যিক টাকা খরচ করে লেখা ছাপান, কিংবা সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার সূত্রে। আর অপরিচিত সাহিত্যক মাত্রেই শুধুমাত্র বই বিক্রী করে বালীতে বা বালীগঞ্জে বাড়ি তোলেন। কমবয়েসী রবীন্দ্রনাথ এই অভিমানেই পদাবলী ধরণের কয়েকটি গান লিখে ভানুসিংহ নামের কোন কাল্পনিক কবির প্রাচীন রচনা বলে চালিয়েছিলেন, প্রশংসা পাবার আশায়। এই ভানুসিংহকে প্রাচীন মৈথিলী কবি মনে করে যে বাঙালী ভদ্রলোকটি জার্মানীর এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থিসিস লিখে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম নিশি-কান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনার কথা জানতে পারার পর থেকে জার্মানীর ডক্টরেট উপাধির ওপর আমি শ্রদ্ধা হারিয়েছি। শুনেছি ফ্রান্সেও নাকি এক ধরণের 'ডক্টরেট' দেওয়া হয়, যাকে ক্রসওয়ার্ডের ভাষায় বলে কনসোলেশন প্রাইজ। এ'রা ফ্রান্সে নামের আগে ডক্টর লিখতে পান না, কিন্তু অন্য দেশে উপাধির যথেচ্ছ ব্যবহার চালাতে পারেন। ঘরে বসে ডাক-যোগে টাকা পাঠিয়ে মার্কিন ডিগ্রী পাওয়ার চেয়েও অবশ্য এটা একটু উঁচুদরের। কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত শুনেছি এই ধরণের 'ডক্টর'।

কিন্তু বৈদেশিক ছাপ যার নামের আগে বা পরে নেই (ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যাকে বানরের ল্যাজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন) তাঁর পক্ষে ছদ্মনাম গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এ যেন সামনে ফুটলাইট দিয়ে পিছনের অন্ধকারে পর্দা টাঙানো। নিজে লিলিপুট হলেও ছায়াটা ব্রবডিগনাগের মত দেখাবে।

এবম্বিধ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে আমি কলম-নামের পক্ষপাতী হয়েছি। কিন্তু ভালো ছদ্মনাম নির্বাচন করা যে কত দুরূহ কাজ তা ভুক্তভোগীদের মত আমাকেও জানতে হয়েছে।

ছদ্মনাম সংগ্রহের একটি সহজতম উপায় সকলের উপকারার্থে জানিয়ে দেওয়াই বিধেয়। অতএব আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই জানিয়ে দিই। আমি প্রথমেই একটি মোটাসোটা অভিধান নিয়ে বসেছিলাম। তারপর

তুরীয় ভাবগ্রস্ত সন্ন্যাসীর মত দু'চোখ বুজে হঠাৎ মাঝখানের একটি পাতা খুললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতাও। তারপর বাম ও দক্ষিণের পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি শব্দ দেখে গেলাম। থাম, থুৎনি, থুৎকার, দংশ, দক্ষ, দক্ষজা, দক্ষসাবর্ণি, দগ্ধশলাকা ইত্যাদি শব্দগুলি পেলাম। মনে হ'ল এর মধ্যে যে কোন শব্দই দগ্ধশলাকা হয়ে দেখা দিতে পারে। অতএব পুনরায় অভিধান বন্ধ করা. পুনরায় তুরীয় ভাব, পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার প্রথম শব্দ পেলাম 'রাজনামা'। ইউরেকা বলার আগেই অর্থটুকুও চোখে পড়লো—পটোল। এর পরই যে শব্দটি পাওয়া গেল, তা হ'ল 'রাজযক্ষা'। অতএব পুনরায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবেই ট্রাই ট্রাই এণ্ড ট্রাই করে গেলে ফললাভ অবশ্যই হবে। যদিচ বিখ্যাত ছদ্মনামীরা এ পথ অবলম্বন করেন নি।

উদাহরণ: পরশুরাম।

শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু এই ছদ্মনামটি কিন্তু তাঁর 'চলন্তিকা' থেকে সংগ্রহ করেন নি। শুনেছি জীবনের প্রথম ব্যঙ্গ-গল্পটি লিখে তিনিও আমার মতই ছদ্মনামের চিন্তায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন এবং এ বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে নির্বাচিত প্রায় সব নামই খারিজ করে ফেলেছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকলো তাঁদের পরিবারের স্যাকরা—পরশুরাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ নামটাই বসিয়ে দিলেন তিনি গল্পের শেষে। অথচ তিনি যখন বিখ্যাত হলেন, তখন সমালোচক ও গবেষকরা কত কি অর্থ বের করলেন এই ছদ্মনামের। তাঁর ব্যঙ্গরচনাকে কুঠারের সঙ্গে তুলনা করা হ'ল। এই ঘটনার পরও কি সমালোচক ও গবেষকদের উপর শ্রদ্ধা রাখতে বলেন? সে যাউক, এই সূত্রে একটা খবর কিন্তু জানিয়ে রাখা দরকার যে, শরৎচন্দ্রও একদা 'পরশুরাম' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। 'বেণু' কাগজে 'নূতন প্রোগ্রাম' প্রবন্ধটি এই ছদ্মনামে লিখেছিলেন তিনি।

বাস্তব ঘটনা ছাড়াও অনেক সময় ছদ্মনাম নির্বাচনে স্বপ্নেরও সাহায্য পাওয়া যায়।

উদাহরণ: মার্ক টোয়াএন।

স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন নাবিক। সমুদ্র আর জাহাজই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তারপর নানা বিচিত্র ঘটনার ভেতর

দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসে এমন এক অভিজ্ঞতায় সঙ্গে মুখোমুখি হতে হ'ল তাঁকে যে বিষয়টি নিয়ে রাত জেগে একটি কৌতুককর গল্প লিখে ফেললেন তিনি—'দি জাম্পিং ফ্রগ'। কিন্তু কি নামে পাঠাবেন গল্পটা ভাবতে ভাবতে এক সময় টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর স্বপ্নে দেখলেন বিগত নাবিক জীবনের একটি দৃশ্য। দেখলেন, তিনি নাবিক বন্ধুদের সঙ্গে জাহাজ থেকে দাঁড় ফেলে জলের গভীরতা মাপছেন, আর গাইছেন একটি বহু-প্রচলিত গান—'বাই দি মার্ক ওয়ান; বাই দি মার্ক টোয়াএন' ঃ মার্ক টোয়াএন—অর্থ দ্বিতীয় চিহ্ন। ছদ্মনাম হিসেবে এর কোন অর্থ আছে কি নেই ভেবে দেখলেন না ক্লিমেন্স, ঘুম থেকে উঠেই ব্যঙ্গ-রচনাটির নীচে এই নামটাই বসিয়ে দিলেন। আর এই নামেই তিনি আজও বিখ্যাত।

বাস্তব জীবন হল প্রথম পৃথিবী, স্বপ্নকে বলা চলে দ্বিতীয় পৃথিবী। আর তৃতীয় পৃথিবী—জেলখানা। অনেকেই এই তৃতীয় পৃথিবীতে গিয়ে সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। কিন্তু জেলখানায় যাঁরা চাকরী করেন, তাঁরা সাহিত্যের কোন উপকার কোনদিন করেছেন বলে শুনি নি। অবশ্য সাহিত্যিককে ছদ্মনাম জোগানোও যদি সাহিত্যকর্ম হয়, তাহলে একজন পাহারাদারকে অন্তত সাহিত্যসেবক উপাধি দেওয়া চলে।

উদাহরণ: ও হেনরি।

সিডনি পোর্টার কাজ করতেন একটি ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের হিসেব মেলাতে গিয়ে একাউণ্টেণ্টের নজরে পড়লো, বেশ কিছু টাকা তছনছ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে খবর দিলেন তিনি, আর খবর শুনে সিডনি পোর্টার পালালেন টেকসাস ছেড়ে। পরে তিনি অবশ্য ধরা দিলেন এবং যথাকালে কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ল তাঁকে। অনেকের ধারণা, পোর্টারের নিজের কোন অপরাধ ছিল না, শুধুই ভয় পেয়ে পালিয়েছিলেন তিনি এবং সেজন্যে বিচারকরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। সে যাই হোক, জেলে থাকতে থাকতে গল্প লেখার সাধ জাগলো তাঁর। কিন্তু নিজের কলঙ্কিত নামে গল্প ছাপলে কেউ পড়বে না ভেবে ছদ্মনাম খুঁজলেন তিনি। জেলখানায় তাঁর প্রহরী ছিল ও হেনরি। তারই নাম ব্যবহার করে গল্প লেখক হিসেবে বিখ্যাত হলেন।

এ ঘটনার অবশ্য মতান্তরও আছে। অনেকে বলেন, টেকসাস থেকে পুলিশের ভয়ে নিউ অর্লিনসে পালিয়ে আসেন পোর্টার এবং সেখানেই

তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত। কিন্তু স্বনামে পাঠালে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন এই ভয়ে একদিন একটি মদের দোকানে বসে জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে ছদ্মনাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, আর মাঝে মাঝে 'বয়' হেনরিকে ডাক দিচ্ছিলেন, ও হেনরি, আর এক বোতল! সঙ্গী বললেন, এই তো চমৎকার ছদ্মনাম—ও হেনরি।

ছদ্মনাম যে সব সময়ে লেখক নিজেই নির্বাচন করেন তা নয়। অনেক সময় এটি অপরের দ্বারা আরোপিত হয়, কখনো প্রশংসার ছলে, কখনো বা বিদ্রূপের ছলে।

উদাহরণ: জর্জ ইলিয়ট।

মেরী এ্যান ইভানস্ নামের মেয়েটি নাকি যৌবনেও কোন পুরুষের চোখে সুন্দর হয়ে দেখা দিতে পারেনি। ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছি যে, মেরী নিজে সুন্দর না হলেও কোন একজনকে তার সুন্দর মনে হয়েছিল এবং তার হাবেভাবে কথাবর্তায় সকলেই বুঝতে পারতো যে, এই মেয়েটি ঐ বিশেষ যুবকটিকে মন দিয়ে ফেলেছে। এতৎ সত্ত্বেও কেন সে মেরীকে বিয়ে করতে চায় না প্রশ্ন করায় যুবকটি তার বন্ধুকে বলে, 'ভালবাসা পাওয়াই তো সব নয়, চেহারা ভালো না হলে কি কোন মেয়েকে ভালবাসা যায়? মেরী যে দেখতে একেবারে জর্জের মত, মিঃ ইলিয়টের ছেলে জর্জের মত কুৎসিত।'

তারপর কি করে যেন মেরী এ্যান ইভানসের কানে গেল কথাটা; এবং এ আঘাত সে সারা জীবনেও ভুলতে পারলো না। তাই সারা জীবন এই জর্জ ইলিয়ট নামে লিখে গেল অসংখ্য উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ। যে যুবকটি ইভান্সকে আঘাত দিয়েছিল, অনেকে সন্দেহ করেন, তিনিই হার্বার্ট স্পেন্সার। ঠিক এই ধরণের মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন তিনি। পরবর্তী জীবনে অবশ্য সমালোচক জর্জ হেনরী লিউইস বিয়ে করেছিলেন মেরী ইভানসকে এবং লিউইসের মৃত্যুর দু' বছর পরেই—মেরীর বয়স তখন ষাট,—জনৈক মিস্টার ক্রসকে বিয়ে করেন মেরী ইভান্স্।

অপরের দ্বারা আরোপিত আরও একটি ছদ্মনাম আছে।

উদাহরণ: Q

ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই ছেলেটি একটু প্রিকশাস হয়ে উঠেছিল। শিক্ষকদের বিব্রত করতে তার মত ওস্তাদ আর একজনও ছিলো না। দু

মিনিট অন্তর তিড়িং করে বেঞ্চি থেকে দাঁড়িয়ে উঠবে, আর এমন এক একটা প্রশ্ন করে বসবে যে, শিক্ষকমশাই ঘেমে অস্থির সঠিক উত্তর দিতে। ছেলেটা বুদ্ধিমান, পড়ুয়া হিসাবে ভালো, কিন্তু প্রশ্নগুলো বড়ো বেয়াড়া ধরণের। তাই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তার নাম দিলেন 'Q 'অর্থাৎ কোয়েশ্চেন-এর সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। পরে ছেলেটি যখন সমালোচনা লিখতে শুরু করলো, তখন সে 'Q' নামটি ত্যাগ করলো না। বহুকাল পরে তবে পাঠকরা জানতে পেরেছিল যে, তাঁর আদি নাম স্যার আর্থার কুইলার কাউচ।

এর আগে যে ক'টি ছদ্মনামের গোপন তথ্য পরিবেশন করেছি তা হয়তো আমার মতই পাঠকরাও অন্য কোথাও না কোথাও পড়েছেন। সুতরাং প্যারীচাঁদ মিত্র কি করে 'টেকচাঁদ ঠাকুর' হয়েছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম' প্যাঁচা'. বঙ্গবাসীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ', প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল'. শরৎচন্দ্র কেনই বা 'অনিলা দেবী', 'পরশুরাম' এবং 'অনুপমা' হয়েছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'নবকুমার কবিরত্ন' এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 'দিবাকর শর্মা' সে গবেষণা না করলেও চলবে। যাঁরা আগের কাহিনী-গুলো জানতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এগুলির ইতিহাসও জানেন।

ছদ্মনামী হ'লেই যে লেখক পাঠকের ঔৎসুক্য অর্জন করেন, তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু বিখ্যাত হ'ন তাঁরাই, যাঁদের ছদ্মনামের পিছনে কোন ঘটনা আছে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, আমার ক্ষেত্রে ঠিক এই মুহূর্ত পর্যন্ত অভিধান যেমন সাহায্য করতে রাজি হ'ল না, তেমনি কোন অভাবনীয় ঘটনাও রূপোর রেকাবীতে পানের খিলির বদলে একটি ছদ্মনাম তুলে ধরলো না। সোয়াবিয়ার যাদুকর ফাউস্টও শয়তানের চর মেফিস্টো-ফিলসের সঙ্গে করমর্দন করেছিল, কিন্তু ভাগ্য আমার সঙ্গে দেখছি রাজি নয়।

না, এবম্বিধ অবস্থায় একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রচনাটি প্রায় শেষ করে এনে যখন ভাবছি কি নামে সম্পাদকের দরবারে পাঠানো যায়, সেই মুহূর্তে সত্যিই একটি ঘটনা ঘটে গেল। কোলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের লালরঙা নাম-প্লেট ঝোলানো সাইকেলের পিয়ন এসে কলিং বেল টিপলো। উড়ে চাকরটা ছুটে গেল, নিয়ে এলো একখানা চিঠি। এযাবৎ একটিও বাঙলা রচনা না লিখে যে বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকটিতে শুধুই বেনিয়া ব্রিটিশের মাতৃভাষায় চটকদার প্রবন্ধ লিখে এসেছি সেই পত্রিকার সম্পাদক কশ্চিৎ পাঠিকার লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠক, বিশেষ করে পাঠিকাদের প্রশংসাপত্রে আমার অরুচি

ধরে গিয়েছে, প্রথম প্রথম খুশি হয়ে উত্তর দিতাম, তারপর শুধুই খুশি হ'তাম—উত্তর দিতাম না, বর্তমানে খুশি হই, কিন্তু পড়ে দেখি না। তা সত্ত্বেও এ চিঠিখানি আমি পড়তে বাধ্য হলাম, কারণ চিঠিটা ছোট, ঠিক হ্যাণ্ড গ্রানাডের মত। বিস্ফোরণ তাই বেশি। পাঠিকা লিখেছেন, 'আপনার ইংরেজী প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়েছি এই ভেবে যে, আপনি বাঙলায় লেখেন না। এরপর আপনি যদি ইংরেজিতেও না লিখে বোর্নিও বা আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখেন, তাহ'লে আরও খুশি হবো। ও দুটি ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকায় আপনার লেখার সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে না। খুশি হ'বার কথা নয় কি?'

নীচে নাম সই। পদবী পত্রনবীশ।

চট্ করে পদবীটা কুড়িয়ে নিলাম। 'পত্রনবীশ'—চমৎকার ছদ্মনাম। 'পত্রনবীশের চিঠিপত্তর' নাম দিয়ে বেশ একখানা রম্যরচনার বই লেখা যাবে, আর ভূমিকাটা একটু সত্যিমিথ্যে জড়িয়ে লিখলেই বেলে লেটার্স বা জুর্নাল বলে চালাতে এতটুকু অসুবিধে হবে না। ফরাসী নামে পাঠকরা আজকাল একটু মজে বেশি। ভাবলাম, কে জানে, আজকের এই ছদ্ম-নামধারী 'পত্রনবীশ' অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সাহিত্যারণ্যে হয়তো কোন বনস্পতি বিশেষ হয়ে উঠবে। বনস্পতি শব্দ মারফৎ আমি অবশ্য ঘৃতের ছদ্মবেশে স্বনামপ্রসিদ্ধ সামগ্রীটুকুই বোঝাতে চেয়েছি। বর্তমান দিনের সব রম্যরচনাই সেই বস্তু কিনা!

মাহেশের রথ

রূপদর্শী

সেই কবে, আজকের এই এখানে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা সেদিনটির দিকে নজর দিতে গেলে চোখের পাওয়ার বাড়িয়ে নিতে হয়, ভুরু দুটো কুঁচকে আসে আর কপালের ওপর জমে ওঠে অনেকগুলো হিজিবিজি দাগ, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তার বয়েস এগারো। নাম রাধারানী। রুগ্না মাকে সে ঘরে ফেলে এসেছিল। বন্য ফুল কুড়িয়ে কয়েকগাছি মালা গেঁথে এনেছিল। মাহেশের রথে। বিক্রী করে মায়ের জন্য পথ্য কিনবে বলে। বৃষ্টি এল, হঠাৎ ভেঙে গেল রথের মেলা, মালা রইল অবিক্রীত। মালাগাছি বুকে করে নিরুপায় সেই বালিকাটি মাহেশ থেকে ফিরে যাচ্ছে, এইটুকু, এই ছবিটুকুই শুধু আমার মনে আছে। আর সবই আবছা হয়ে গেছে। হ্যাঁ আর মনে আছে মাহেশকে, মাহেশের রথকে, রথের মেলাকে।

কতদিন ধরেই তো আমার জীবনে ঘুরে ফিরে সমারোহ করে আষাঢ় আসছে। নবজলদে সজ্জিত হয়ে, বনে বনে শ্যামছায়াঘন দিনের মেলা বসিয়ে, কদম্ববনে পুলক সঞ্চার করে, সবুজ তৃণে তৃণে রোমাঞ্চ জাগিয়ে আষাঢ় আসে। রথযাত্রার মেলা বসে। মলিনমুখী একাদশী এক কিশোরীর মুখ আমার মনের দীঘিতে ভেসে ওঠে। আষাঢ়ের আকাশের সঙ্গে সে মুখের কতনা সাদৃশ্য! দুই-ই জলভারে ভারাক্রান্ত। শ্যামকরুণ। সে মেয়েটি একা তো মনে আসে না, মাহেশকেও আনে। এমনি করেই মাহেশের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরিচয় নিবিড় হয়েছে।

আষাঢ় প্রত্যাসন্ন হয়ে এলেই, আকাশে ঘন মেঘপুঞ্জের সমারোহ শুরু হলেই, ভেবেছি এবার মাহেশে যাব। কিন্তু প্রতিবারের ভাবনাই আমার পলাতক হয়েছে। এবারে কি যোগাযোগ জানিনে, মাাহেশে যাওয়া সত্যিই ঘটল।

মাহেশে এলাম। কী ভীড়! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক শড়ক লোকে বোঝাই। পথের দু'পাশে বাড়ির ছাতে ছাতে লোক। লোকের কাতার। একজন কে বললে, এ আর কি ভীড়। এখন কটাই বা লোক, উল্টো রথে আসবেন,

তখন দেখে নেবেন, পুরী ফেরতা যাত্রীরা সব আসবে তো, পথে পা ঠেকাতে পারবেন না, লোকে লোকে একেবারে 'জনমানবশূন্য' হয়ে যাবে।

পেঁাছোতে দেরি হয়েছিল। এসে দেখি রথ বেরিয়ে পড়েছে। পাঁচ সাতশ লোক রথের দড়া ধরে টানছে, বাজনা বাদ্য হচ্ছে, রথ চলছে। হঠাৎ কিসের শব্দ হল, বাজনাবাদ্য থেমে গেল, রথ পড়ল থেমে। একটুখানি বিশ্রাম। হঠাৎ আবার ফটাস্, আওয়াজ হল, বন্দুকের আওয়াজ, ফাঁকা ফায়ার। বাজনাবাদ্য শুরু হল, পয়সা আনির বৃষ্টি হল, এমন কি টাকারও। রথের গায়ে পটাস পটাস টাকা পয়সা এসে পড়ছে, কুড়িয়ে নিচ্ছে সেবাইতরা, অন্য লোকের নো-অ্যাড্মিশন। বড় বড় মই দিয়ে গোটা রথের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরা, রথ চলছে তো মই-এর বেড়াও, রথ থামছে তো মইও হল্ট্। সেপাই শান্ত্রী ভলেণ্টিয়ার সব সদাজাগ্রত চক্ষু। মাছিটি গলতে দেবে না সেই বেড়ার ভিতরে। রথের উপর কলস চাপানো, কুড়নো পয়সায় ভর্তি হলেই মুখটি বন্ধ করে ফেলা হচ্ছে।

সেই বেড়ার মধ্যে এক ফাঁকে ঢুকে পড়লাম। হ হাঁ করে ছুটে এলেন এক সেবাইত। বললেন, এখানে ঢুকেছেন কেন? বললুম কাছ থেকে রথের কারুকার্য একটু দেখবে বলে। একটু নরম হলেন। ও, তা বেশ দেখুন। তবে কি জানেন, কারুকর্মের নিদর্শন এ রথে বিশেষ পাবেন বলে মনে হয় না। মাহেশের উৎসবটাই পুরানো, এই রথটা নয়। পূর্বে ছিল দারুময় রথ, একজন এসে তাতে গলায় দড়ি বেঁধে সুইসাইড্ করেছিল। তাই সেটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর শ্যামবাজারের কেষ্টবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, এই লোহার রথটি বানিয়ে দেন, প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ চল্লিশ খরচা হয়েছিল। ওদের খরচেই এখনো রথটির রক্ষণাবেক্ষণ চলে।

সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মাহেশে রথযাত্রার উৎসব হয়ে আসছে। মাহেশের ঘাটে এসে প্রভু নাকি স্নান করেছিলেন। হাটে ছিল এক ময়রার দোকান। স্নান করে প্রভুর ক্ষিদে পেল, সঙেগ পয়সাকড়ি নেই, হাতের কঙ্কন বন্ধক দিয়ে ময়রার কাছ থেকে মিষ্টি কিনে খেলেন। পুরীর প্রধান পাণ্ডা স্বপ্ন পেলেন, ওরে আমার হাতের বালা নেই, বন্ধক দিয়ে মিঠাই খেয়েছি মাহেশের হাটে, যা আমার বালা খালাস করে আন। ধড়মড় করে পাণ্ডার ঘুম ভেঙে গেল। পড়ি কি মরি মন্দিরে ছুটলেন হেড্ পাণ্ডা, দেখেন সত্যিই, প্রভুর বালা নেই। ছোট্ ছোট্। মাহেশে এসে খুঁজে-পেতে ময়রাকে বের করে, সে বালা উদ্ধার করলেন। যে ঘাটে প্রভু স্নান করেছিলেন,

সেই জগন্নাথের ঘাটের উপরেই আগে মন্দির ছিল। গঙ্গায় ভেঙে যাবার পর মন্দির উঠে এসেছে বর্তমান স্থানে। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক শড়কের উপরে।

চৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃষ্ট সালে। মাহেশের রথের মেলা তারো আগের। তখন সেবাইত ছিল ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক বছরই নতুন রথ বানানো হত। নতুন রথে চড়ে প্রত্যেক বছর প্রভু, মাঝখানে বোন, আর ও পাশে ভাইকে নিয়ে মাসীর বাড়ি গিয়ে ফুর্তিফার্তি করতেন, আটদিন পর বাড়িতে ফিরতেন। প্রভু ঘরে ফিরে এলে সেই রথ ঘোড়া মায় গড়ুর পক্ষীটি অব্দি দিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের ধুনি জ্বালানো হত. মড়াপোড়ানোর কাজেও লাগত।

চৈতন্য দেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন কমলাকর চক্রবর্তী, আমরা তারই বংশধর, সেবাইতটি বললেন, মহাপ্রভু আদর করে নাম দিয়েছিলেন পিপ্পলাই, তিনি ছিলেন দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল, পরে এ বিগ্রহের সেবাইত হন তিনিই। তারপর থেকে সেবার ভার আমাদের হাতেই আছে।

প্রায় দু'শ বছর হবে এই মাহেশেরই এক ভক্ত, ওরা ছিল ময়রা, একখানা বেশ বড় সড় রথ বানিয়ে দেন। সেখানা পুরানো হলে শ্যামবাজারের এই কেষ্টবাবুদের পূর্বপুরুষ, ওদের দেশ ছিল আরামবাগ সাবডিভিশনে, ৺কৃষ্ণরাম বসু, বড় ভদ্রলোক ছিলেন কিনা, এক বিরাট রথ বানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছি ঘাড় টনটন করে উঠত চুড়ো দেখতে গেলে, এমনই বিরাট। তেরটা চুড়ো ছিল। বিবেচনা করুন একবার, কাণ্ডখানা কি?

শুধু কি রথ বানিয়েই খালাস, যাবতীয় ব্যয় তিনিই চালিয়ে এসেছেন। সেই রথ ভাঙলে তাঁর ছেলে গুরুচরণবাবু আবার একটা নতুন রথ বানিয়ে দিলেন। তা মশায়. সেটা গেল দৈবগতিকে পুড়ে। তা সে-ও প্রায় নব্বুই একশ বছরের কথা হল। গুরুচরণবাবুর ছেলে রায় বাহাদুর কালাচাঁদবাবু আবার একখানা রথ বানিয়ে দিলেন, সেখানায় যখন আর কাজ চলল না, তখন তারই দৌহিত্তির বিশ্বম্ভরবাবু, তিনি একখানা রথ বানিয়ে দিলেন। সে রথের ছিল পাঁচটা চুড়ো। তা সে রথখানার কথা তো আগেই বললাম, প্রভুর কি লীলা কে জানে, একজন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলে। তারপরই এই লোহার রথ, চারতলা, নয়টা চুড়ো। সেই রথই চলছে। চলছে মানে কি, চালাচ্ছেন তাই বিনা ক্লেশে চলছে। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে এই তো পিচ্ বাঁধানো পথ, কাদা নেই, উঁচু-নীচু নেই, তেলের মত 'পেলেন', চালাক দেখি, নড়াক দেখি ইঞ্চিখানেক কেউ? হরিবোল, হরিবোল, প্রভু হে দয়াময়। আজ ক বছর ধরে ঠাকুর খুবই প্রসন্ন, কোনই কষ্ট

দিচ্ছেন না, বেশ যাচ্ছেন। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে, উয়াঃ, সে কী কান্ড মশাই, মাসীর বাড়ির কাছ বরাবর গিয়ে রথ আর চলল না। চলল না তো না-ই। টানা হ্যাঁচড়া করে করে হয়রান, তারপর হাল ছেড়ে দিল্ম। বিগ্রহকে কোলে করে মন্দিরে নিয়ে তুলল্ম। আর ওমা, রথ গড়গড়িয়ে চলল। হরি হরি বল, প্রভু দয়াময় হে।

সেবাইত ভদ্রলোককে নমস্কার করে ভিড়ের অরণ্যে ঢ্কে গেলাম। ইতিমধ্যে বন্দ্কে ফায়ার হল। ঠং ঠং, ঢং ঢং বাজনা বাদ্য শ্র্ হল, টাকা পয়সা, আনি সিকির বর্ষণ শ্র্ হল, হৈ হৈ করে রথ চলল। মই-এর বেড়ার ভেতর পয়সা কুড়োনোর ধ্ম পড়ল। দ্পাশ থেকে সাবধান সাবধান রব চাপা পড়ো না, হ্ঁশ রেখে চলো। এই পয়সা জমা হবে কলসীর ভেতর, কলসী যাবে সেবাইতের ভান্ডারে। যে সেবাইত এবারের মেলা ডেকে নিয়েছেন, এ সব প্রাপ্য তাঁরই। ডাক প্রতি বছরই হয়, তবে ফ্যামিলির মধ্যে, এ ঘর নয় ওঘর, এ পকেটে নয় সে পকেটে, উঠোনের সীমানা ছেড়ে অদ্যাবধি তা অন্যত্র যায়নি।

আরেকজন বললেন, এই যে দেখছেন পথের দ্ধারে দোকান পাট, এর খাজনা তোলাও এই কদিনের মতো জগন্নাথের অধিকারে। তার এ অধিকার আজকের নয়, নবাব আলীবর্দীর দেওয়া। বৃটিশ সরকারও এ অধিকারে দাঁত বসাতে পারেনি। দেখলেন না, রথ যাবে বলে কতদ্র থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। পথের মোড়ে প্লিস কনস্টেবল দাঁড়িয়ে। ট্রাফিক ঘ্রিয়ে দিচ্ছে কেমন।

কিন্তু আমি তো রথই দেখতে আসিনি, রথ দেখলাম, লোক দেখলাম, এবার ইচ্ছে কলা বেচাটাও দেখি। সেই তালেই ফিরছিলাম। একজন বললেন, কী আর দেখবেন, মালপত্তর যা এসেছে অধিকাংশই প্লাস্টিকের। সেদিন আর নেই. কোথায় বা আপনার ভেঁপ্ বাঁশি, আর কোথায় বা সেই মাটির ঘোড়া, গর্, প্ত্লা, কাঠের বন্‌বন্ গাড়ি। ছেলেবয়সে দ্তিন মাইল ঠেঙিয়ে রথের আড়ং-এ জ্টতাম। ছোট ছোট গাড়ি এক একটা কিনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতাম, চাকার উপর চরকী ঘ্রত বন্ বন্। সে তো চরকী নয় আমাদের মনেরই খ্শি। আর মশাই পাঁপর, আর ফলের মধ্যে লটকা. সেই ছোট ছোট ফলগ্লো, তিনটে করে আঁটি, কেমন কেমন অম্লমধ্র। আর মশাই বেল্ন, আর ঘ্ড়ি। আঃ! চোখ ব্ঁজে ভদ্রলোক ছেলে বয়েসটায় যেন একবার উঁকি মেরে নিলেন।

মাহেশে এখন শ্ধ্ পাঁপর আর চিনেবাদাম। আর যা আছে তা চোখে

পড়বার মতো নয়। বরং কলকাতা ভাল। বৌবাজারে যে মেলা জমে তেমনি আর কোথায়? কত গাছ গাছালির চারা আর পাখি, আর বেতের, বাঁশের ঝুড়ি ডালা।

হঠাৎ শুনলাম হৈ হৈ। কি? মুহূর্তে লোক জড়ো হল, পুলিস এল। কটাকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে গেল। আবহাওয়া থমথম। রথ আর চলবে না। কেন? কি হয়েছে? মিলমজুররা প্রতিবার রথের দড়ি টানে, বহুদিন ধরেই টেনে আসছে, তেমনি প্রতিবারই রথের দড়ি টানবার আগে মদ টেনে আসছে, সেই আজ অনেকদিন। 'রঙ চড়ালে দুনিয়া বাঁদী', ভাবখানা এইরকম। 'দুনিয়া কেয়া হ্যায়', বলে ওরা লুঠপাট শুরু করে দেন, প্রতি বছরই করেন, এবারও তাই করতে গিয়েছেন। আর ভলেণ্টিয়াররা এসে বাদ সাধলে। অ্যাসা নেহি হোগা। বাদ সাধতেই বেধে গেল। শেষটায় পুলিস এসে ফয়শলা করলে, দুষ্কর্মের পান্ডাদের ধরে ঠান্ডা গারদে চালান করলে। অমনি স্ট্রাইক। ন্যায্য অধিকারে হাত দিয়েছে, লুঠ করবার হক আমাদের বহুদিনের, সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ! টানব না রথ। ওরা রথ টানলে না, এবার রথ টানলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা, হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে এসেছি মন্দিরের কাছ বরাবর। বেশ ভিড় এক মহিলাকে ঘিরে। বছর পঁচিশেক বয়স। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কি ব্যাপার? সর্বস্ব চুরি গেছে। রথ দেখতে আসছিলেন। স্বপ্ন পেয়েছেন। থাকেন অনেক দূরে। ছেলেপুলে হয় না, অনেক প্রার্থনা করেছেন জগন্নাথের কাছে। শেষে প্রভু স্বপন দিলেন। মাহেশ যা, দড়িতে হাত ঠেকা, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। স্বামী বিদেশে, লোক পেলেন না তাই একাই আসছিলেন। স্টেশনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, ভিড়ে টিকিট কাটতে পারছিলেন না, সে কেটে দিলে। বললে, সেও আসছে মাহেশে। কত আলাপ। হোটেলে নিয়ে খাওয়ালে। মাহেশে এসে মন্দিরে ঢুকল, সে বললে, দিদি, গহনাপত্র নিয়ে ঢুকো না। যে ভিড় ভরসা হয় না। আমার কাছে রেখে দর্শন করে এসো, একটু তাড়াতাড়ি এসো, তুমি এলে আমি যাব, আমাকে আবার পুজো দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, ঘুণাক্ষরেও অবিশ্বাস করলাম না গো। আমার কি মরণ হল, সব্বশ্শো ওর হাতে সমর্পণ করে ভেতরে ঢুকলাম। দেবতার মন্দিরে এমন প্রবঞ্চনা, হা জগন্নাথ, তোমার চোখের উপর এত বড় রাহাজানি, তুমি সহ্য করলে! জগন্নাথ, বুঝলাম, সত্যিই

তোমার হাত নেই। ভলোণ্টিয়াররা সান্ত্বনা দিতে লাগল, অমন উতলা হবেন না। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। দেখুন কি হয়।

সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসছি। দেখলাম ছোট্ট একটা ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি বলছে, আমি কিছু করিনি, সত্যি কিছু করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও। পুলিসটি ধমক দিয়ে বলছে, চোপ, এখনো বলছি, বল তোর দলে বড় কে আছে, ছেড়ে দেবো, নইলে তোকে জেলে দেবো। ছেলেটি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, কেউ নেই আমার সঙ্গে, আমি একা আর বাড়িতে মা আছে, তার বড় অসুখ, আমায় ছেড়ে দাও। চমকে উঠলাম। কি মনে হল পিছু পিছু থানায় এলাম। কনস্টেবল দারোগাকে বললে, বড়া বদমাস, বড়া হোকে ডাকু হোগা। দারোগা বললেন, কি, এ কে? কনস্টেবল বললে, পকেটমার। ছেলেটি বললে, না আমি পকেট মারিনি। আমি তো মালা বিক্রি করছিলাম। দারোগা জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাড়ি কোথায়? গোঁদলপাড়া। নাম কি? বিজু। পকেট মেরেছিস? না না। তবে কি করছিলি? মালা বেচছিলাম। কোথায় মালা? ফেলে দিয়েছে। কে? বলতে পারল না। কিন্তু বুঝলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম, দারোগাবাবু, আমি জানি ও পকেটমার নয়, ওকে ছেড়ে দিন। অনেক বলে কয়ে ছাড়িয়ে আনলাম। জিগ্যেস করলাম, মালা আছে? চুপ করে রইল, তার পর বললে, পুলিস ফেলে দিয়েছে। বললাম, আচ্ছা বাড়ি যাও। যেতে পারবে? ঘাড় নেড়ে বললে হ্যাঁ। ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, কি আশ্চর্য যোগাযোগ। মাহেশের মেলায় বঙ্কিমবাবুর রাধারানী কি রূপ পাল্টিয়ে এল?

লে খ ক - প রি চি তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)।

উনিশ শতকের বাংলা দেশে এমন কয়েকজন মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের প্রতিভা ছিল বহুধাবিস্তৃত, এবং যাঁদের কর্মকাণ্ডও জীবনের বিশেষ কোনও একটি ক্ষেত্রের চতুঃসীমায় আবন্ধ থাকেনি। চিন্তায় এবং আচরণে আমাদের জাতীয় জীবনকে তাঁরা এক অনন্য মহিমা দান করে গিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই নিত্য-স্মরণীয়দেরই অন্যতম; সর্বাগ্রগণ্য বললেও কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। শুধু চিন্তা-নায়কই তিনি ছিলেন না, সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রয়াসের তাৎপর্য প্রায় অপরিসীম। আবার শুধু সমাজ-সংস্কারক বললেও তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একাধারে তিনি ছিলেন চিন্তা-নায়ক, সমাজ-সংস্কারক, সাহিত্যস্রষ্টা, মানব-প্রেমিক ও লোকশিক্ষক।

বিদ্যাসাগর তাঁর উপাধি, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাল্য-কালে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন। শৈশব এবং বাল্যজীবন নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন শেষ হবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, ইংরেজী এবং হিন্দী ভাষাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসামান্য।

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনও বাধা, কোনও বিঘ্নই তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এ-ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অকুতোভয়। বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে যে একাগ্র নিষ্ঠায় তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন, তা তাঁর অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব এবং অনমনীয় তেজস্বিতারই পরিচায়ক।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে কঠোর আর কোমলের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এক-দিকে তিনি ছিলেন অত্যন্তই কঠোর, অন্যদিকে অত্যন্তই কোমল। সেই কোমল করুণাপরবশ দিকটির পরিচয় যাঁরা পেয়েছিলেন—অনেকেই পেয়েছিলেন—তার মধ্যে একজনের এখানে নাম করছি; মাইকেল মধুসূদন।

বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক। অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য। কিন্তু সরসতাও অপরিসীম। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরসতার এই সংমিশ্রণ তাঁর চারিত্রিক সম্পূর্ণতারই পরিচয় বহন করছে।

গ্রন্থাবলীঃ সীতার বনবাস, কথামালা, বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, শকুন্তলা ইত্যাদি।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—১৮৮৯)।

বাংলা গদ্যের যখন গঠন-কাল চলছে, সেই সময়েও আপন রচনা-রীতির মধ্যে যাঁরা একটি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁদেরই একজন। তাঁর ভাষা দৃঢ়, কিন্তু কদাচ দুরূহ নয়। বরং তার সর্বত্রই একটি সহজ প্রফুল্লতার স্পর্শ লেগে রয়েছে। শিল্পী হিসেবে এ তাঁর সুদৃঢ় শক্তিরই পরিচায়ক।

বিগত শতকের এই বিখ্যাত লেখকের প্রকৃত নাম কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র নয়, সঞ্জীবনচন্দ্র। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুজ। সঞ্জীবচন্দ্রের চরিত্রে নানাবিধ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। শুধুই সাহিত্য নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্যবহারিক জীবনে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। জন্ম ২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায়। মেদিনীপুর, হুগলী ও ব্যারাকপুরে শিক্ষা লাভের পর বর্ধমানের কমিশনারের দপ্তরে কিছুকাল চাকরি করেছিলেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু পরীক্ষায় কৃতকার্য না হওয়ায় তাঁকে সাব-রেজিস্ট্রারের চাকরি গ্রহণ করতে হয়। কিছুকালের জন্য 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত আর-একটি পত্রিকার নাম 'ভ্রমর'।

গ্রন্থাবলীঃ বেঙ্গল রায়ত, পালামৌ, জাল প্রতাপচাঁদ ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)।

বাংলা সাহিত্যের যাঁরা পাঠক, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের কাছে নতুন করে কোনও কিছু বলতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সর্ববিষয়েই তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল সুগভীর, এবং এই সর্বক্ষেত্রেই তাঁর চিন্তার উজ্জ্বল প্রভায় বাঙালী-মানসকে তিনি আলোকিত করে গিয়েছেন। প্রাচ্য শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সুফল আহরণেও তাঁর উদ্যম কখনও অবসন্ন হয়নি। বস্তুত ভারতীয় ভাবধারাকে বিসর্জন না দিয়েও কীভাবে বৈদেশিক শিক্ষার সৎপ্রভাবকে আত্মস্থ করা যায়, বঙ্কিম-চরিত্র তারই এক মহান দৃষ্টান্ত।

জন্ম ২৪ পরগনার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়ায়। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষাস্থান কাঁঠালপাড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও কলকাতা। ১৮৫৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম প্রথম গ্র্যাজুয়েট। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পরেই তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবন শুধু গ্রন্থরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা, এবং এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজ-মানসে এক বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সে-কালের আরও বহু লব্ধকীর্তি সাহিত্যিক ও চিন্তা-ব্রতী এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যুগন্ধর সাহিত্যস্রষ্টা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের তিনি প্রবর্তক। সে-অধ্যায় অদ্যাবধি এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

গ্রন্থাবলীঃ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরানী, আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬)।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় সাহিত্যিক হিসেবে ততখানি নয়, যতখানি এক আত্মভোলা দার্শনিক হিসেবে। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু—আমাদের দুর্ভাগ্য—সে-সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে আরও কম। হলে বুঝতে পারা যেত, সাহিত্যেও তাঁর প্রতিভা ছিল সহজাত, দক্ষতা স্বতঃস্ফূর্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঋষিকল্প মানুষ। জাগতিক সমস্ত কোলাহলের অন্তরালে যে-এক অখণ্ড অনন্ত শান্তির স্রোত প্রবহমান রয়েছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের মধ্যে সেই শান্তিই যেন একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "কাব্যে, দর্শনে, সংগীতে, গণিতে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ছিল।" অত্যন্তই অল্প বয়সে তিনি "মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেন। তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বাংলা সাহিত্যে নানা দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায় সাহিত্যিক মহলে কথা উঠে যে পৌরাণিক আখ্যান ছাড়া কাব্যরচনার উপাদান সুদুর্লভ; আর মধুসূদন যে সংস্কৃতবহুল ভাষায় মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন, সে-ভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়া মহাকাব্য রচনা করা দুঃসাধ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই দুই ধারণা দূর করিবার জন্যই স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দ্বিজেন্দ্রনাথের অসংখ্য সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়।...তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রধানত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত হয়।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমে সেণ্ট পল্‌স স্কুল ও পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। স্বদেশী-মেলার তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা, হিতবাদী পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ভারতী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ১৯১৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি-পদে বৃত হন। বাংলা শর্টহ্যাণ্ড-লিখনরীতির তিনি উদ্ভাবক। কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। শেষ জীবন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত হয়েছে।

গ্রন্থাবলী ঃ মেঘদূত, স্বপ্নপ্রয়াণ, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনা, রেখাক্ষর বর্ণমালা, কাব্যমালা ইত্যাদি।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯)।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের যাঁরা উত্তরসাধক, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রেই দুজনের নাম করতে হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। দুজনেই এঁরা লব্ধকীর্তি কবি। ভাবের গাম্ভীর্যে আর শব্দ-সম্ভারের ঐশ্বর্যে দুজনেই এঁরা বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের প্রতিভা যেখানে কাব্যকলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, নবীনচন্দ্রের সেখানে আরও একটি পরিচয় রয়েছে। গদ্যরচনাতেও তিনি সমধিক পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গদ্য অবশ্য কবিতার মত অলঙ্কারবহুল নয়, কিন্তু নিরলঙ্কার হয়েও লাবণ্যময়। এবং তারও মধ্যে সুন্দর একটি কবি-প্রাণের স্বাক্ষর রয়েছে। সেই কবি-প্রাণ যেন আরও সহজ, আরও স্বচ্ছন্দ। বস্তুত নবীনচন্দ্রের গদ্য-রচনা পড়তে-

পড়তে এক-এক সময় মনে হয় যে, তাঁর কাব্য-চেতনা যেন গদ্যের মধ্যেই তার সহজতর, সুন্দরতর প্রকাশ-পথ খুঁজে পেয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের জন্ম চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে। ১৮৬৮ সালে তিনি বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাবলীঃ অবকাশরঞ্জিনী, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস, অমিতাভ, রঙ্গমতী, আমার জীবন, প্রবাসের পত্র ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৩)।

বাঙালী পাঠক সর্বরকম রসেরই সমাদর করতে জানেন। তবু এক-এক সময় স্বতই সন্দেহ হয় যে, অদ্ভুত বা উদ্ভট রস সম্পর্কে তাঁর ততটা আগ্রহ নেই। তা যদি থাকত, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে তা হলে এত অনায়াসে তিনি ভুলতে পারতেন না। বাঙালী শিশু বরং উদ্ভট রসকে আদর করতে জানে। সে-তুলনায় বয়স্ক পাঠকের ঔদার্য অনেক কম। বিস্মৃতপ্রায় এই সাহিত্য-সাধকের পরিচয় দিতে গিয়ে ইংরেজ লেখক চেস্টরটনের নাম মনে পড়ছে। চেস্টরটনও বহুলাংশে এই একই রসের ব্যবসায়ী। ইংরেজ পাঠক তাঁকে ভুলবে বলে মনে হয় না, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। কথাটা আমাদের পক্ষে গৌরবের নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ২৪ পরগনার রাহুতা গ্রামে। প্রথম জীবনে সামান্য চাকরি করতেন। কিন্তু সেই সময়েই কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। ১৮৭৭ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যখন দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময়ে সরকারকে তিনি জানান যে, ব্যাপকভাবে গাজরের চাষ করলে হয়তো দুর্ভিক্ষজনিত দুর্দশার কিছুটা উপশম হতে পারে। সরকার তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরেই ত্রৈলোক্যনাথ বিদেশ যাত্রা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরে এসে তিনি একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করেছিলেন।

গ্রন্থাবলীঃ ভিজিট টু ইউরোপ, আর্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ইণ্ডিয়া, কঙ্কাবতী, ডমরুচরিত, ভূত না মানুষ, ফোকলা দিগম্বর, মুক্তামালা, ময়না কোথায় ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯—১৯২৫)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম সেই স্বর্ণ-যুগে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যখন এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হয়েছে। সেই আন্দোলনের ঢেউ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল। অত্যন্ত সহজেই তাঁর শিল্প-মানস তাই সৃষ্টিকর্মের নব-নব ক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বাংলা সাহিত্যে ফরাসী মেজাজের প্রবর্তনায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। মৌলিক রচনায় তো বটেই, বিদেশী সাহিত্যের তর্জমাতেও তিনি অশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ-ছাড়া সঙ্গীত-বিদ্যাতেও তাঁর প্রতিভা ছিল সহজাত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি পঞ্চম পুত্র। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও কবি-ভ্রাতার সংগে তাঁর একটি নিবিড় সখ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সাহিত্য ও সংগীতচর্চার ব্যাপারে নতুনদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ও বৌঠানের (জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সহধর্মিণী কাদম্বিনী দেবী) কাছে বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে উৎসাহ পেয়েছিলেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানেই তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ করেন। পরবর্তী জীবনে কিছুদিনের জন্য তিনি তত্ত্ববোধিনী ও সংগীত-প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভারতী পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিছুকাল ফ্রেনলজি-বিদ্যারও চর্চা করেছিলেন। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্টীমার চালনা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। শেষ জীবন সংসার থেকে দূরে নির্জন পল্লী-প্রকৃতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

গ্রন্থাবলীঃ অশ্রুমতী, পুরুবিক্রম, সরোজিনী ইত্যাদি।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯২২)।

"চন্দ্রশেখর বাংগলা সাহিত্যের যে কেমন পুরুষ ছিলেন, তাহা আধুনিক যুবজন জানে না—বুঝি বা তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চন্দ্রশেখর বাংগলা সাহিত্যের একজন ঋষি বা স্রষ্টা প্রবর্তক ছিলেন। গদ্যে পদ্যের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও বচন চাতুরী তিনিই প্রথম আমদানী করেন। তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' গদ্যে একখানি মহাকাব্য,—অপূর্ব, অতুল্য এবং অদ্বিতীয়। উহা আর হইবে না, বুঝি বা হইবার নহে।" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে সাহিত্য পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেছিলেন।

'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে চন্দ্রশেখর এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এমন একসময় ছিল, এ-গ্রন্থ যখন বাঙালী পাঠক-মাত্রকেই উদ্বেল করে তুলেছে। এ-ছাড়া আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করে-ছিলেন। সেগুলি অবশ্য 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম'-এর মত এত খ্যাতি অর্জন করেনি, তবে চন্দ্রশেখরের সাহিত্যসাধনার যথার্থ মূল্যায়নে সেগুলিরও গুরুত্ব রয়েছে।

চন্দ্রশেখরের পৈতৃক নিবাস নদীয়ায়। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আট বছর বয়সে তাঁকে টোলে দেওয়া হয়েছিল। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স, এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি,এ, পাশ করেন। ফরাসী ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। কিছুদিন শিক্ষকতা এবং ওকালতি করেছিলেন। ওকালতিতে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উপাসনা পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। সাহিত্যচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, চন্দ্রশেখর তাঁদের অন্যতম।

গ্রন্থাবলীঃ মসলা-বাঁধা কাগজ, উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম, সারস্বত কুঞ্জ, স্ত্রী-চরিত্র, কুঞ্জলতার মনের কথা ইত্যাদি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯—১৯১১)।

আর-এক বিস্মৃতপ্রায় লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্য ও গদ্য, এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমধিক পারদর্শী ছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁর রসবোধও ছিল অত্যন্তই তীক্ষ্ন। আপাতসামান্য তুচ্ছ বিষয়বস্তু নিয়েও তিনি সুন্দর নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য পড়লে আর যে-কথাটি মনে না হয়েই পারে না, তা হল এই যে, দৃষ্টি ঈষৎ বঙ্কিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শিল্পী-হৃদয় ছিল অত্যন্তই মমতাময়। তাঁর রচনায় পরিহাসের সঙ্গে সমবেদনার একটি সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।

বর্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বামাচরণ পূর্ণিয়ায় ওকালতি করতেন। কর্মসূত্রে ইন্দ্রনাথকে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। পূর্ণিয়ায় উকিল হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। এর পর কিছুদিন মুনসেফি করে তিনি দিনাজপুরে গিয়ে আবার আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। কিছুদিন হাইকোর্টেও প্র্যাকটিস করেছিলেন। তারপর আবার বর্ধমানে চলে যান। আইন-ব্যবসায়ের অবকাশে হেতমপুর স্কুলে প্রধান-শিক্ষকের কাজও করেছেন। পঞ্চানন্দ পত্রিকায় তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হত। সেই সময় পাঠক-সাধারণের কাছে 'পঞ্চানন্দ' নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

গ্রন্থাবলীঃ উৎকৃষ্ট কাব্যম্, হাতে হাতে ফল, পাঁচু ঠাকুর, খাজনার আইন, ক্ষুদিরাম ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১)।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক অনন্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। তবে তাঁর পরিচয় শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই নয়। একাধারে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, ভাষাবিদ্, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যস্রষ্টা। বহুবিধ বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী; বিস্তারেও তা কোনও সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এবং তার চেয়েও যা বিস্ময়জনক, সেই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রাঞ্জলতার একটি সার্থক মিলন সাধিত হয়েছিল।

নৈহাটির সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য-পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম রামকমল ন্যায়রত্ন। পিতামহ শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার। বালক বয়সে হরপ্রসাদের নাম ছিল শরৎনাথ। কান্দী-স্কুলের খাতায় এই শরৎনাথ নামটিই পাওয়া গিয়েছে। সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি এনট্রান্স ও এফ, এ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। পরে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম,এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি বরাবরই সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হরপ্রসাদের কর্মস্থান ঢাকা এবং কলকাতা। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, এবং কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মসচিব হিসেবে কাজ করেন। সংস্কৃত, পালি, তিব্বতী, ইংরেজী, জর্মান ইত্যাদি বহু ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে

তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে চর্যাপদ ও রাম-চরিতের উল্লেখ করা যেতে পারে। "বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি"—এই প্রসিদ্ধ উক্তি হরপ্রসাদেরই, এবং আত্মবিস্মৃত এই জাতিকে তার নিজের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার সুমহান সাধনাতেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। "হর-প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা"য় এই মহামনীষীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "অনেক পণ্ডিত আছেন...তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, সে যুগ বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষ কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না।...হরপ্রসাদ ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।"

গ্রন্থাবলীঃ বাল্মীকির জয়, ভারতমহিলা, মেঘদূত ব্যাখ্যা, কাঞ্চনমালা, সচিত্র রামায়ণ, বেণের মেয়ে ইত্যাদি।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫—১৯৩২)।

সাহিত্যের তুলনায় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান সামান্য নয়। তাঁর গদ্যের ভঙ্গী ঋজু, বলিষ্ঠ। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত হওয়ায় বাংলা সন্দর্ভ-সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধি দানে সমর্থ হয়েছিলেন। ইংরেজী আর বাংলা, দুটি ভাষাতেই তাঁর সমান দখল ছিল। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিপিনচন্দ্রের জন্ম শ্রীহট্ট জেলায়। অল্প বয়সেই তিনি দেশের মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য বাংলা দেশে যে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, বিপিনচন্দ্র তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে যে অসীম শৌর্য এবং গভীর বিচক্ষণতার তিনি পরিচয় দেন, রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বহু সংবাদপত্র তিনি সম্পাদনা করেছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ সত্যমিথ্যা, জেলের খাতা, চরিত-কথা, সোল অব ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল বৈষ্ণবিজ্‌ম ইত্যাদি।

জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮—১৯৩৭)।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি যে সর্বাঙ্গীণ নয়, তার একটি প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতী পুরুষ, মাতৃভাষার সমৃদ্ধিসাধনে তাঁদের অধিকাংশেরই তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। আপনাপন বিষয় সম্পর্কে যা-কিছু তাঁদের বক্তব্য, প্রধানত ইংরেজীতেই তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র তার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী, ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

বিজ্ঞান-সাধকদের অন্যতম। কিন্তু বাঙালী পাঠকদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজী জানেন না, মাতৃভাষাই যাঁদের একমাত্র সম্বল, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার ফলশ্রুতিতে তাঁদেরও কখনও কোনও বিঘ্ন হয়নি। জ্ঞানের তপস্যায় যে-সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র, অত্যন্তই সুললিত সুন্দর বাংলায় তার কথা তিনি বিবৃত করে গিয়েছেন। জগদীশ-চন্দ্রের মানসিক গঠন ছিল দার্শনিকের। তাঁর রচনার সর্বত্রই সেই দার্শনিক মনের সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

জন্ম ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে। পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতার শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র ইউরোপে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ তিরিশ বছর এই কলেজের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যুৎ, বেতার এবং উদ্ভিদ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণা একসময় পৃথিবীর সর্বত্রই সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। বিদ্যুৎবিষয়ক গবেষণার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি. এস-সি উপাধি দেওয়া হয়। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের সংগে এই বিশ্ব-বিজ্ঞানীর একটি অন্তরংগ বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

গ্রন্থাবলী ঃ রেসপন্স ইন দি লিভিং অ্যাণ্ড নন্‌লিভিং, প্ল্যাণ্ট রেসপন্স, অব্যক্ত ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কোনও কিছু বলতে যাওয়ার অর্থই হল গংগাজলে গংগাপুজা করা। কেননা, যে-ভাষায় আমরা লিখি, কথা বলি, এ তাঁরই সৃষ্টি; এবং এ-ব্যাপারে সচরাচর যে-ভংগীর আমরা আশ্রয় নিয়ে থাকি, তারও উত্তরাধিকার আমরা তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছি। ভারতবর্ষের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা; সর্বদেশের ও সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় শুধু কবি হিসেবে নয়, এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচয় শুধু সাহিত্যিক হিসেবে নয়। বস্তুত আমাদের জাতীয় জীবনে এমন কোন ক্ষেত্র বোধ হয় নেই, যেখানে তাঁর মংগল-হস্তের স্পর্শ পড়েনি। সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, শিল্প, নাট্যকলা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসামান্য তাঁর অবদান; প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনকে তিনি এক অনন্যপূর্ব সমৃদ্ধি দান করে গিয়েছেন। পৃথিবীর আর কোনও দেশে কোনও কালে এমন কোনও মনীষী বোধ হয় জন্মগ্রহণ করেননি, যাঁর একক সাধনায় একটি জাতির পক্ষে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁর সেই অনুরাগ কোথাও মানবপ্রেমের অন্তরায় হয়নি। বস্তুত, বিশ্বপ্রকৃতির সংগে মানবজীবনের যে একটি নিগূঢ় যোগসম্পর্ক রয়েছে, এবং নিগূঢ় বলেই যার অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ধরা পড়তে চায় না, বারংবার তার বিষয়ে তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে, তাঁর সৌন্দর্যময় অবিরোধ জীবনচর্যায়। বাংলা সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমিত স্বল্পালোক কক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম সেই বাতায়নটি খুলে দিলেন,

যে-বাতায়নপথে বহির্বিশ্বের রৌদ্র আর হাওয়া তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে, যে-বাতায়নে দাঁড়িয়ে বহির্জগতের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের বিরাট একটি দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অন্তরকে দেখার প্রয়োজনেই যে বাহিরকে দেখা প্রয়োজন, এ-শিক্ষা তাঁরই। জাতীয় মানসের সঙ্গে বিশ্ব-মানসের এই যোগসাধন—যাকে রবীন্দ্র-সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্য বলে গণ্য করা চলতে পারে—আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসে এর গুরুত্ব যে কতখানি, সে-বিষয়ে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন করে না।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি অষ্টম পুত্র। সে-কালে ঠাকুরবাড়ি ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি পীঠস্থান। এবং তার প্রভাব বালক-রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল। এ-বিষয়ে তিনি স্বয়ং যা লিখেছেন, তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।...আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিতাম।...শুনিয়া তার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।" কবি-জীবনের সূত্রপাত সম্পর্কে অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। ..একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।" কাব্য-রচনায় পরিবারস্থ আর যাঁদের কাছ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন, নতুনদা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) তাঁদের অন্যতম। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হবার পর সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই তরুণবয়সী কবিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সংবর্ধিত করেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য জগতেও তাঁর কবিকৃতির সমাদর ঘটে, এবং ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সে-উপাধি তিনি বর্জন করেন। উত্তর-জীবনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্তই গভীর একটি সহমর্মিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না, এবং মূলত এই কারণেই ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তার কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছে।

গ্রন্থাবলী ঃ ভানুসিংহের পদাবলী, মানসী, সোনার তরী, গীতাঞ্জলি, বলাকা, গীতবিতান, চোখের বালি, গোরা, গল্পগুচ্ছ, জীবনস্মৃতি ইত্যাদি।

শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১—১৯২০)।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহিলা-সাহিত্যিকদের সংখ্যা যদিও কম, অবদান, সামান্য নয়। এবং এঁদের মধ্যে ক্ষমতাশালিনী এমন কয়েকজন লেখিকা সত্যিই ছিলেন, রচনার বৈশিষ্ট্যে এ-ক্ষেত্রে যাঁরা একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শরৎকুমারী চৌধুরানী এঁদের অন্যতম। তাঁর ভাষা লাবণ্যময়, ভঙ্গী অন্তরঙ্গ। ঘরোয়া সংসার-

জীবনের চিত্ররচনায় তাঁর যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না।

জন্ম চোরবাগানের বসু-পরিবারে। অক্ষয়কুমার চৌধুরী তাঁর স্বামী। কলকাতার ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিল। সেই সূত্রে শরৎকুমারীও ঠাকুর-বাড়িতে আসতেন। দীর্ঘদিন লাহোরে ছিলেন বলে ঠাকুর-বাড়িতে তাঁকে কৌতুক করে লাহোরিনী বলা হত। 'ভারতী' পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখিকা।

গ্রন্থাবলী : শরৎকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২)।

পরাধীন শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর দুর্বল ধমনীতে যিনি একদিন নূতন প্রাণস্রোতের সঞ্চার করেছিলেন, জাতীয় উজ্জীবন-যজ্ঞের সেই অন্যতম প্রধান ঋত্বিক্ স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমাদের ঋণ প্রায় অন্তহীন। ভ্রান্তবুদ্ধি জাতিকে তিনি একদিন সত্যপথের সন্ধান দিয়েছিলেন; দৃঢ়কণ্ঠে সমগ্র জাতিকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তার ঐতিহ্য সুমহান, এবং সেই সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগস্থাপনের দ্বারাই সে তার সমস্ত লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতে পারে। ভারতবর্ষের মর্মবাণীকে এ-যুগে তিনিই সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেন। স্বামী বিবেকানন্দ মূলত যদিও ছিলেন ধর্ম-প্রচারক সন্ন্যাসী, তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যও অপরিসীম। বাংলা গদ্যসাহিত্য তাঁর গ্রন্থাদির দ্বারা সমৃদ্ধতর হয়েছে। তাঁর ভাষা বলিষ্ঠ এবং ব্যঞ্জনাময়।

কলকাতার বিশিষ্ট দত্ত-পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী। স্বামী বিবেকানন্দের গার্হস্থ্য জীবনের নাম নরেন্দ্রনাথ, শৈশবে তাঁর ডাকনাম ছিল বিলে। মেট্রোপলিটান স্কুলের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতাও করেন। এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তার ফলে তাঁর জীবন-বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন ঘটে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-জীবনে তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের পর তিনি অ্যামেরিকায় যান। শিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় তিনি যে বক্তৃতা দেন, নানা কারণে তা আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিদেশে যাঁরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁদের অন্যতমা। ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব-নাম মিস মার্গারেট নোব্‌ল। স্বামী বিবেকানন্দই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবর্তক। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমও তিনিই সংগঠন করেন।

গ্রন্থাবলী : জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, পরিব্রাজক, বর্তমান ভারত, ভাববার কথা, বীরবাণী ইত্যাদি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬—১৯২৩)।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, এই উভয় ক্ষেত্রেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা প্রায় সমপরিমাণ। বাংলা সাহিত্যে—বিশেষত সন্দর্ভ-সাহিত্যে—তিনি একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁর ভাষা

ঐশ্বর্যময়, একটু বা অলঙ্কারবহুল। কিন্তু অলঙ্কারের এই বাহুল্য সত্ত্বেও তা কোথাও আড়ষ্ট নয়। বরং তার সর্বত্রই একটি সাবলীল গতিভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়। ভঙ্গিমার এই স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর গদ্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। ধর্মতত্ত্বের প্রবক্তা ও রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জন্ম ভাগলপুরে। পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি তাঁর একমাত্র সন্তান। ভাগলপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা এবং পাটনা কলেজ থেকে এফ, এ ও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি বারাণসীতে যান। সেখানে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ করেন। তরুণ বয়সে তিনি ধর্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সান্নিধ্যে আসেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহেই তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হন। কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরে অধ্যাপনা করেছিলেন। তারপর সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সাংবাদিক-জীবনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটিয়ে দেন। বিখ্যাত যে-সব দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন, তার মধ্যে এখানে বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, ভারত-মিত্র (হিন্দী), সাহিত্য ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

গ্রন্থাবলী : আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী (অনুবাদ), উমা, রূপলহরী, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, সাধের বউ, দরিয়া ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬)।

যদিচ বাংলা দেশে প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করেননি, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে কথ্য রীতি বলতে ঠিক যে-জিনিসটিকে বোঝায়, তিনিই তার প্রবর্তক। তিনিই প্রথম প্রমাণ করলেন যে, কথ্য ভাষায় লঘু প্রবন্ধই শুধু নয়, গুরুবিষয়ক প্রবন্ধও রচনা করা চলে। এবং তা চলে বিষয়বস্তুর মর্যাদাকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ না করে। সংস্কৃত ভাষার অভিভাবকত্ব থেকে বাংলা গদ্যকে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দান করলেন। এই যে মুক্তি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিসীম এর তাৎপর্য, এবং এরই ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলা গদ্যরীতির এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর কাছে এ-কারণে আমাদের ঋণ প্রায় অন্তহীন।

সন্দর্ভ, কথাসাহিত্য ও কাব্য, এই তিন ক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। শুধুই সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্য-নায়ক। 'সবুজপত্র'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। এই সাহিত্যপত্রটিকে কেন্দ্র করে সে-কালে তরুণতর সাহিত্যিকদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। 'সবুজপত্র'-এর আড্ডায় যাঁরা নিয়মিতভাবে যোগদান করতেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের অনেকেই এখন লব্ধকীর্তি। প্রমথ চৌধুরীর অধ্যয়নের ক্ষেত্র ছিল সুবিস্তৃত। একাধিক বিদেশী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর সম্পর্কে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি প্রবন্ধের একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "অন্নময় ও প্রাণময় কোষের অন্তরে যে মনোময় কোষ, তিনি ছিলেন সেই লোকের অধিবাসী; সেখানেই তাঁর বাস্তুভিটা। ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যের জীবনই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন। তাঁর কথায়, গল্পে, রসিকতায় এই জীবনের ছাপ সহজেই সর্বদা ফুটে উঠত।......বুদ্ধির উজ্জ্বল সূর্যালোকে চিন্তার সুস্পষ্ট মূর্তি, ও ভাষার প্রসাদগুণে তার পরিচ্ছন্ন প্রকাশ যে

সাহিত্যে সেই সাহিত্য ছিল প্রমথবাবুর প্রিয়। তাঁর নিজের রচনা বাংলা ভাষায় এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা।”

প্রমথ চৌধুরীর জন্ম পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। শিক্ষাজীবনের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হবার পর তিনি বিলাত যান এবং সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসেন। আইন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বীরবল তাঁর ছদ্মনাম। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ সনেট পঞ্চাশৎ, চার-ইয়ারী কথা, বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, আমাদের শিক্ষা, রায়তের কথা, নানা চর্চা, নীললোহিত, নীললোহিতের আদিপ্রেম, ঘোষালের ত্রিকথা ইত্যাদি।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯২৯)।

লঘু রসের সাহিত্য সৃষ্টি করে একদা যাঁরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তাঁর রচনার মধ্যে সর্বত্রই একটি মার্জিতরুচি সরস ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এ-ছাড়া তিনি ছিলেন কৃতী সমালোচক। শিশু-সাহিত্য-রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁর জন্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বরাবরই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এম, এ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার পর অধ্যাপকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অসামান্য। এ-কারণে জীবনের প্রথম পর্যায়ে কোনও কলেজেই বেশীদিন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে যথেষ্টই সুনাম অর্জন করেছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ ফোয়ারা, ব্যাকরণ-বিভীষিকা, অনুপ্রাস, ক-কারের অহংকার, পাগলা ঝোরা, প্রেমের কথা ইত্যাদি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে ঠাকুর পরিবারে আর যাঁরা সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একটি স্নিগ্ধ সুন্দর কবি-মানসের অধিকারী, এবং অনেক স্থলে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যকর্মে নিজস্ব অনুভূতি ও চিন্তার একটি বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কাব্য ও প্রবন্ধ-সাহিত্য, দ্বিবিধ ক্ষেত্রেই তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে সবিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বাংলা ১৩০২ সালে তিনি এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়ায় ‘ঠাকুর কোম্পানি’র পত্তন করেন। ভূষি মাল ও পাট কিনে তাঁরা বাঁধি

কারবার করতেন। প্রথমে কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত এতে প্রভূত লোকসান হয়, এবং আইনের দিক থেকে তার সমস্ত দায় ও দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপরে গিয়ে বর্তায়। অত্যন্তই অল্প বয়সে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্রই ২৯ বছর।

গ্রন্থাবলী : চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, শ্রাবণী।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১)।

আমাদের একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, যাঁকে যে-পরিচয়ে একবার আমরা চিনে ফেলি, তার অতিরিক্ত অন্য কোনও পরিচয়ে তাঁকে আর আমরা চিনতে চাইনে। শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়-বিচারেও এই একই ত্রুটি আমাদের ঘটেছে; এ-কথা অনেককাল পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারিনি যে, তিনি শুধু শিল্পী-গুরুই নন, সাহিত্যিকদেরও গুরুস্থানীয়। কাব্যময় যে-একটি সহজ সরল স্নিগ্ধ গদ্য-শৈলীর তিনি অধিকারী ছিলেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা প্রায় দুর্লভ। সে-গদ্য সহজ হয়েও বর্ণাঢ্য, নিরলঙ্কার হয়েও রূপৈশ্বর্যশালী। অবনীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন শিশুসাহিত্যের রচয়িতা। কিন্তু সে-সাহিত্য শিশুবৃদ্ধনির্বিশেষে সকলের সামনেই রূপবর্ণময় এক নূতন পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় "রূপকথাই প্রকৃত গণসাহিত্য এবং অবনীন্দ্রনাথ সেই গণসাহিত্যের রাজা। অবনীন্দ্রনাথ সমাজের যে স্তরে এবং যে ঘরেই জন্মিয়া থাকুন-না কেন, প্রতিভার রহস্যে তিনি দেশের সেই উদার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছেন যেখানে দেশের সর্বশ্রেণীর আসন; যেখানে দেশের মানুষ গল্পলিপ্সু, যেখানে গল্প শুনিবার লোভে সকল মানুষ বয়োভেদ ভুলিয়া চিরকালের শিশু।......মাটির উপরে বসিয়া তিনি মাটির মানুষের মন কাড়িয়া লইয়াছেন, যে মাটিতে চিরকালের ফসল ফলে, মানুষের শিশু নিত্য ভূমিষ্ঠ হয়।"

জন্ম জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে। বর্তমানকালের তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। শিল্পী-সমাজ যখন পথভ্রান্ত, পাশ্চাত্ত্য শিল্প-পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণে উন্মত্তপ্রায়, অবনীন্দ্রনাথই তখন সর্বপ্রথম ভারতীয় চিত্র-শৈলীকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের সংগে যুক্ত ছিলেন। কিছুকাল এখানে অধ্যক্ষতাও করেন। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট্‌স-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

গ্রন্থাবলী : শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, নালক, বুড়ো আংলা, ভারত-শিল্প, শিল্পায়ন ইত্যাদি।

সরলাবালা সরকার (১৮৭৫—)।

বাংলা দেশের মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সরলাবালা সরকারের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনার স্নিগ্ধ সৌকর্যে তাঁর সাহিত্যে সুন্দর একটি প্রসন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। কাব্য ও গদ্যসাহিত্য, উভয় ক্ষেত্রেই সমাধিক তাঁর দক্ষতা। রচনারীতি প্রাঞ্জল এবং আবেদনময়।

গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের কাঁঠালপোতা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা কিশোরীলাল সরকার।

সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে অগ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকারের কাছে যথেষ্টই উৎসাহ পেয়েছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন তাঁর পিতৃবন্ধু। ঋষি রাজনারায়ণ তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সরলাবালার দেশাত্মবোধ অত্যন্তই প্রবল। বাংলা দেশের বহু লব্ধকীর্তি বিপ্লবী নেতা একসময়ে তাঁর কাছে সস্নেহ আশ্রয় পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫৩ সালের জন্য গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন করেন। ইতিপূর্বে কোনও মহিলা এই সম্মান লাভ করেননি।

গ্রন্থাবলী ঃ প্রবাহ, নিবেদিতা, চিত্রপট, কুমুদনাথ, অর্ঘ্য, মনুষ্যত্বের সাধনা, হারানো অতীত।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫—১৯৩০)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় সাহিত্যিক হিসেবে ততখানি নয়, যতখানি ঐতিহাসিক হিসেবে। ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিকদের তিনি অন্যতম; এবং তাঁর গবেষণা-কার্যের মূল্য যে কী অপরিসীম, দেশবাসীর তা অজানা নয়। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বহির্ভারতেও প্রসারলাভ করে-ছিল। মহেঞ্জোদড়োয় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর তাঁর প্রতিষ্ঠা আরও বৃদ্ধিলাভ করে।

বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যসাধনায় তাঁর নিষ্ঠা কখনও ক্লান্ত হয়নি। প্রবন্ধাদি এবং উপন্যাসে—বিশেষত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসে—তাঁর যথেষ্টই দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চায় তিনি অকুণ্ঠ উৎসাহ লাভ করেন। কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বারাণসীতে ছিলেন।

গ্রন্থাবলী ঃ ধর্মপাল, শশাঙ্ক, ময়ূখ, বাঙ্গালার ইতিহাস, পাষাণের কথা ইত্যাদি।

সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩)।

ইংরেজীতে যাকে বলে ননসেন্স রাইম্‌স, বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ই তার প্রবর্তক। এবং সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে আজ পর্যন্ত আর কেউ তাঁর কৃতিত্বকে অতিক্রম করতে পারেননি। পাঠকদের মধ্যে এখন যাঁরা যুবকবয়সী, ছোটবেলায় তাঁদের প্রায় সকলেই তাঁর ছড়া পড়েছেন,—'আবোল তাবোল'-এর সেই উদ্ভট সব ছড়া, যা শুধু একবার পড়লেই হয় না, বারবার পড়তে ইচ্ছে করে, এবং একেবারে মুখস্থ করে ফেলার পর তবেই স্বস্তি পাওয়া যায়। শুধু ছড়াই নয়, শিশুসাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। সরস প্রবন্ধেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং ম্যাঞ্চেস্টারের শিল্প-কলেজে ফোটোগ্রাফি ও ব্লক-

নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। পরিহাস-রসাত্মক ছবি আঁকতেও দক্ষ ছিলেন। তাঁর আর-একটি পরিচয়, অধুনালুপ্ত বিখ্যাত শিশু-মাসিক 'সন্দেশ'-এর তিনি সম্পাদক। ১৯২৩ সালে—মাত্রই ৩৬ বছর বয়সে—তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ আবোল তাবোল, হ-য-ব-র-ল, খাই খাই ইত্যাদি।

দিবাকর শর্মা (১৮৯৬—১৯৩২)।

এমন কয়েকজন লেখক আছেন, যাঁদের প্রতিভার আকস্মিক বিদ্যুৎ-প্রভায় পাঠকমাত্রেই একদিন চমৎকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিভার সম্পূর্ণ রূপটি পাঠকচক্ষুতে প্রতিভাত হবার পূর্বেই যাঁরা চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র মৈত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁরই ছদ্মনাম দিবাকর শর্মা। ১৯৩২ সালে—মাত্রই ৩৬ বছর বয়সে—তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁর প্রতিভার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, এবং তার সমাদর ঘটতেও দেরি হয়নি। নাট্যসাহিত্য, ছোটগল্প এবং বৈঠকী প্রবন্ধ, এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই তাঁর তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। তাঁর রচিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ।

জন্ম রংপুরে; পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলায়। কর্মসূত্রে কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সরস খণ্ড-নিবন্ধগুলি একসময় যথেষ্টই সমাদৃত হয়েছিল।

গ্রন্থাবলী ঃ মানময়ী গার্লস স্কুল, ত্রিলোচন কবিরাজ, উদাসীর মাঠ, থার্ড ক্লাস, দিবাকরী ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৬—১৯৫০)।

বিভূতিভূষণের প্রধান পরিচয়, তিনি পথের পাঁচালীর লেখক। তাঁর এই গ্রন্থখানি সাহিত্যক্ষেত্রে একদা এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বাংলা সাহিত্যের এটি যে একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। বিভূতিভূষণ সহানুভূতিশীল শান্ত রসের লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাসে পল্লী-বাংলার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

হালিশহরের কাছে মুরাতিপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন কথক ও পুরোহিত। পিতার সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। রিপন কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন। কিছুকালের জন্য ভাগলপুর জমিদারী এস্টেটে চাকরি করেছেন। তারপর শিক্ষক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ লোকান্তরিত হবার পর 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁর নামে রবীন্দ্র-পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

গ্রন্থাবলী ঃ পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, অনুবর্তন, আদর্শ হিন্দু হোটেল, চাঁদের পাহাড়, ইছামতী ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—)।

বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে কাজী নজরুল ইসলাম এক দুর্লভ ভালবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন। বস্তুত, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের মধ্যে অন্য আর কেউই বোধ হয় আপন জীবদ্দশায় তাঁর মত এতখানি জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হননি। তাঁর এই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ভাব ও ভাষায় এক অভূতপূর্ব আবেগের বন্যা তিনি বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাব্য উদ্দীপনাময়, যদিচ লালিত্যেরও সেখানে অভাব নেই। 'বিদ্রোহী কবি' নামেই তাঁর পরিচয়। সংগীত রচনা ও সুরসৃষ্টিতেও তিনি অনন্যসুলভ প্রতিভার অধিকারী। মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাশায়ী আছেন।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'নবযুগ', 'ধূমকেতু' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। রাজদ্রোহের অপরাধে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কৃষক ও শ্রমিক দলের তিনি প্রথম সভাপতি।

গ্রন্থাবলী ঃ রিক্তের বেদন, বাঁধনহারা, অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ছায়ানট, বুলবুল ইত্যাদি।

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২—)।

সমালোচনা, উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও নাটক, সাহিত্যের এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশী তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠাশীল শক্তিমান লেখক; সমালোচক হিসেবে সূক্ষ্মদৃষ্টি। পরিহাসের সংগে করুণার সার্থক সংমিশ্রণে তাঁর সাহিত্য একটি সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

রাজশাহীর এক বিশিষ্ট ও সচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্র-জীবনে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন। উত্তর-কালে সেখানে অধ্যাপনার কার্য গ্রহণ করেন। পরে কলকাতায় এসে রিপন কলেজে যোগ দেন। কয়েক বৎসর আনন্দবাজার পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক। তাঁরই ছদ্মনাম প্র-না-বি।

গ্রন্থাবলী ঃ জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, মৌচাকে ঢিল, অশ্বত্থের অভিশাপ, নিকৃষ্ট গল্প, রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, বাংলার লেখক, উত্তরমেঘ, নীলমণির স্বর্গ ইত্যাদি।

ইন্দ্রজিৎ (১৯০৩—)।

দুরূহ বিষয়বস্তু নিয়ে সরস ভংগীতে আলোচনা করা, এ বড় সহজ কাজ নয়। এ-কাজ শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব, বিষয়বস্তুর উপরে যাঁর প্রশ্নাতীত দখল রয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রধান গুণ, তাঁর রচনার বিষয়বস্তু যে সর্বক্ষেত্রে খুব সহজ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ, পাঠককে সে-কথা তিনি ভুলিয়ে রাখতে পারেন। কী করে

পারেন, আগেই তার উল্লেখ করেছি। তাঁর ভঙ্গীটি খোলামেলা, তার মধ্যে বেশ-খানিকটা বৈঠকী আবহাওয়া থাকে। ইন্দ্রজিৎ তাঁর ছদ্মনাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে আছেন। সেখানকার কলেজে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বন্ধুবৎসল সহৃদয় প্রকৃতির মানুষ।

গ্রন্থাবলী ঃ প্রাণবন্যা, ইন্দ্রজিতের খাতা ইত্যাদি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—)।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য যাঁদের সৃষ্টিকর্মের দ্বারা সর্বাধিক সমৃদ্ধ হয়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। অন্যতম, তবু অনন্য। অনন্য এই কারণে যে, বর্ণনায় আর ব্যঞ্জনায় তাঁর মতন এতখানি পরিমিতবোধের প্রমাণ এ-যুগে আর কেউ বোধহয় দিতে পারেননি। সাহিত্যিক হিসেবে একাধিক তাঁর পরিচয়। তিনি কবি, তিনি কথাসাহিত্যিক, তিনি প্রবন্ধকার। শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে—কথাসাহিত্যে আর প্রবন্ধে—তাঁর কবি-সত্তারই একটি সুন্দর সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তরাশ্রয়ী লেখক। তাঁর সাহিত্যকর্মের সর্বত্রই মানবজীবনের প্রতি এক অন্তহীন সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

বারাণসীতে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন প্রধানত কলকাতায় ও ঢাকায় অতিবাহিত হয়েছে। তিনি এবং এ-যুগের অন্যতর লব্ধকীর্তি সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একই বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে পড়তেন। মাত্রই ১৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসখানি রচনা করেন। পরে এই উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কল্লোল-গোষ্ঠীর তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। কর্মজীবনে বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে বঙ্গবাণী, নবশক্তি, বাংলার কথা, রংমশাল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। সম্প্রতি 'স্বনির্বাচিত গল্প' সংকলনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র-জগতেও প্রতিষ্ঠাশীল। কর্মসূত্রে এখন বোম্বাইয়ে আছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ পাঁক, পুতুল ও প্রতিমা, বেনামী বন্দর, নিশীথ নগরী, মহানগর, উপনায়ন, বৃষ্টি এল, প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—)।

যাঁদের রচনায় হৃদয়াবেগের সঙ্গে মননের একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে, অন্নদাশঙ্কর সেই স্বল্পসংখ্যকদের অন্যতম। তাঁর গল্প-উপন্যাস-কাব্য-প্রবন্ধের সর্বত্রই একটি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। তাঁর বিষয়বস্তু হিতকারী, ভঙ্গী মনোহারী। ভাষায় আর বর্ণনায় আভরণের বাহুল্য না ঘটিয়েও যে তাকে কতখানি সতেজ আর সরস করে তোলা যায়, সাম্প্রতিক কালে অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যই তার নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করছে।

উড়িষ্যার ঢেনকানলে তাঁর জন্ম। পিতা নিমাইচরণ রায় সেখানকার রাজ-সরকারে

চাকরি করতেন। অন্নদাশঙ্করের বাল্যজীবন উড়িষ্যাতেই অতিবাহিত হয়েছে, ওড়িয়া ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আই, সি, এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে এখন স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে আছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য, আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, অসমাপিকা, প্রকৃতির পরিহাস, নূতনা রাধা, কন্যা, রাঙাধানের খৈ, জীয়ন কাটি ইত্যাদি।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪—)।

লেখনী ধারণের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। 'দেশে বিদেশে' তাঁর প্রথম বই। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে তাঁর এই রচনা যখন দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই সাহিত্য-মহলে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এবং অনতিকালের মধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর সাহিত্যে এমন একটি হাস্যোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকে, এ-কালীন সাহিত্যে যার তুলনা প্রায় দুর্লভ। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য রয়েছে, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য তাঁর রচনাকে কোথাও ভারাক্রান্ত করেনি।

জন্ম শ্রীহট্টের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ছাত্র-জীবনে কয়েক বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে আফগানিস্তানে এবং আফগানিস্তান থেকে জার্মেনীতে যান। সেখানে কিছুকাল অধ্যয়ন ও গবেষণার পর ডক্টরেট লাভ করেন। পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সত্যপীর, ওমর খৈয়াম, প্রিয়দর্শী, রায় পিথৌরা ইত্যাদি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায় একসময় নিয়মিতভাবে লিখেছেন। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর পাটনা-স্টেশনের ডিরেক্টর।

গ্রন্থাবলী ঃ দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, চাচা-কাহিনী, অবিশ্বাস্য।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫—)।

হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবেই শিবরাম চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধি। কিন্তু এটা তাঁর এ-কালের পরিচয়। এককালে তিনি সিরিয়স প্রবন্ধ লিখতেন, এবং প্রবন্ধকার হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিলেন। তারপর তাঁর পথের পরিবর্তন হয়েছে। নতুন পথে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ যে কতখানি, বাংলাদেশের শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তা জানেন। তাঁর গল্পের ঘটনা, পরিবেশ ও সংলাপ, সবকিছুর মধ্যেই এক দুর্বার হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়। লঘু প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

বাংলাদেশের এক সচ্ছল জমিদার-পরিবারে তাঁর জন্ম। খুব অল্পবয়সে কলকাতায় আসেন। কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে সেইসময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানুষ হিসেবে অত্যন্তই উদারচেতা, অন্যের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ।

গ্রন্থাবলী ঃ বাড়ি থেকে পালিয়ে, মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি, আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না, প্রেমের বি-চিত্র গতি, আমার লেখা, বিচিত্ররূপিণী ইত্যাদি।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬—)।

কবি ও প্রবন্ধকার, দ্বিবিধ পরিচয়েই বিমলাপ্রসাদ প্রখ্যাত। তাঁর কাব্যে যে একটি রুচিস্মিত মনের প্রকাশ দেখতে পাই, প্রবন্ধেও সেই একই মনের পরিচয় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শিল্প-দৃষ্টি সহানুভূতিময়, ভাষা ঋজু, বর্ণনা পরিপাটি। সহজ কথাকে সহজ করে বলবার কৌশলটিকে তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছেন। বিপ্রমুখ তাঁরই ছদ্মনাম।

কলকাতার এক বিশিষ্ট পরিবারে তাঁর জন্ম। বিখ্যাত সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর অগ্রজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে রিপন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

গ্রন্থাবলী : সঞ্চারী, বিপ্রমুখের কথা, মাঝারী, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭—)।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবোধকুমার সান্যালই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বাঁধুনি অত্যন্তই দৃঢ়, ভাষা বেগবতী, শিল্পবুদ্ধি সংবেদনশীল। হৃদয়াবেগের দাক্ষিণ্যে তাঁর সাহিত্যে একটি সুন্দর, অন্তরঙ্গ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও লঘু প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে সামান্য চাকরি করতেন। বাল্যবয়স থেকেই ভ্রাম্যমাণ। ভারতবর্ষের নানা দুর্গম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন। এক সময়ে সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। স্থায়ীভাবে কলকাতায় আছেন।

গ্রন্থাবলী : প্রিয় বান্ধবী, মহাপ্রস্থানের পথে, আঁকাবাঁকা, নদ ও নদী, বনহংসী, হাসুবানু, তুচ্ছ, দেশ-দেশান্তর, জলকল্লোল, পায়ে হাঁটা পথ ইত্যাদি।

অজিত দত্ত (১৯০৭—)।

অজিত দত্তের প্রধান পরিচয়, তিনি কবি। রবীন্দ্রোত্তর কালের অগ্রগণ্য কবিদের তিনি অন্যতম। রোমাণ্টিক মনের আনন্দ-বেদনায় নিষিক্ত এমন কিছু কবিতার তিনি স্রষ্টা, বাংলা সাহিত্যে যার স্বাদ কখনও পুরনো হবার নয়। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটি পরিচয় তাঁর বর্তমান। তিনি নিবন্ধকার। তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে একটি বুদ্ধিদীপ্ত, মার্জিতরুচি শিল্পী-মানসের সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

জন্ম ঢাকা শহরে। শৈশব পিতার সঙ্গে তাঁর কর্মস্থলে বাইরে-বাইরে কেটেছে। পিতৃবিয়োগ হয় অত্যন্তই অল্প বয়সে। তারপর ঢাকায় পিতামহের কাছে থাকতেন। বাল্য ও প্রথম-যৌবন ঢাকায় অতিবাহিত হয়েছে। সেইসময়ে তাঁর এবং বুদ্ধদেব বসুর যৌথ উদ্যোগেই 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে কলকাতায় আসেন। 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তখন আরও বৃদ্ধি পায়। কিছুকাল রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন।

গ্রন্থাবলী : কুসুমের মাস, পুনর্নবা, নষ্টচাঁদ, জনান্তিকে, মন পবনের নাও, ছায়ার আলপনা ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—)।

বুদ্ধদেব বসু এ-কালের একজন প্রসিদ্ধ কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। তাঁর রচনার প্রধান গুণ, তার মধ্যে একটি সৌন্দর্যপিপাসু মুগ্ধ কবি-চিত্তের স্পর্শ রয়েছে। অত্যন্তই নিবিড় তাঁর অনুভূতি, এবং ভাষার যথাযথ ব্যবহারে—বিশেষ করে গদ্য রচনায়—তাঁর দক্ষতা প্রায় অন্তহীন। বর্ণনার জাদু-প্রভাবে সামান্য বিষয়কেও তিনি অসামান্য করে তুলতে জানেন। সে-বর্ণনা সতেজ, সুন্দর, স্ফূর্তিময়।

পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় তাঁর জন্ম। দীর্ঘকাল ঢাকায় ছিলেন। ছাত্র-জীবন সেইখানেই কেটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিখ্যাত 'প্রগতি' পত্রিকা তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকায় থাকতেই কল্লোল-গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ। পরে কলকাতায় সেই যোগ-সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। কিছুকাল রিপন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী, দুই ভাষাতেই তাঁর সমান স্বাচ্ছন্দ্য। 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক।

গ্রন্থাবলী ঃ যেদিন ফুটল কমল, বাসর ঘর, সূর্যমুখী, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, অ্যান একার অব গ্রীন গ্র্যাস, তিথিডোর, শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর ইত্যাদি।

পরিমল রায় (১৯০৯—১৯৫১)।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পরিমল রায়ের মত এতখানি তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর সূক্ষ্মবুদ্ধি লেখকের আবির্ভাব খুব কমই হয়েছে। অত্যন্তই কম লিখতেন তিনি, কিন্তু সেই অত্যল্পপরিমাণ রচনার মধ্যেই যে অসাধারণ শিল্পবোধের স্বাক্ষর রয়েছে, তাতে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে নিতান্ত অন্যমনস্ক পাঠকেরও কোনও সংশয় থাকে না। তাঁর গদ্যভঙ্গী ঋজু, পরিচ্ছন্ন। ভাষার উপরে তাঁর অসামান্য দখল ছিল; বর্ণনার অনায়াস দক্ষতায় সামান্য বিষয়কেও তিনি মনোগ্রাহী করে তুলতে পারতেন।

আদি নিবাস ঢাকা জেলার সুয়াপুর। জন্ম ময়মনসিংহে। পিতার কার্যোপলক্ষে বাল্য বয়সে বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। কৃতী ছাত্র। খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় পড়তে আসেন। সেই সময়ে কবি অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এম, এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কয়েক বৎসর বিভিন্ন স্থানে চাকরির পর সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অর্থনীতি বিভাগের ফার্স্ট অফিসারের পদে নিযুক্ত হয়ে অ্যামেরিকায় যান। সেই দূর প্রবাসে—মাত্রই কয়েক বছর আগে—তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯—)।

সুবোধ ঘোষ সেই বিরল গোষ্ঠীর লেখক, সাহিত্যকে যাঁরা একটি মহৎ ব্রত বলে গণ্য করেন, এবং সেই ব্রতের উদ্‌যাপনে যাঁদের নিষ্ঠা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে প্রথমেই যে-কথাটির উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল

এই যে, তার সর্বত্রই একটি বলিষ্ঠ শিল্পী-হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা ঐশ্বর্যময়, বর্ণনা বর্ণাঢ্য। বিষয়বস্তুর বিশালতায় এবং আঙ্গিকের সৌকর্যে তাঁর সাহিত্যে একটি গভীর আবেদনের সৃষ্টি হয়েছে।

জন্ম হাজারিবাগে। বাল্য ও কৈশোর হাজারিবাগেই অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময়ে সুপরিচিত মনীষী দার্শনিক ও বহুভাষাবিদ্ মহেশচন্দ্র ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য-লাভের সুযোগ হয়। বাল্যবয়সেই বহির্জগৎ তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিল। অভারতীয় জিপসী দলের এক ভ্রাম্যমাণ কার্নিভ্যাল-কোম্পানির চাকরি নিয়ে কিছুদিন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন। কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। কিছুকাল এক সার্কাস দলে ছিলেন। তারপর সমুদ্রগামী জাহাজে স্বাস্থ্য-পরীক্ষকের চাকরি নেন। তেল-কোম্পানির কাজ নিয়ে আবাদানেও গিয়েছিলেন। পুলিস-রিপোর্ট প্রতিকূল হওয়ায় সেখান থেকে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। এরপর রাঁচি-গয়া মোটর সার্ভিসের অধীনে বাস-কণ্ডাক্টরি থেকে শুরু করে কলকাতায় মাখনের ব্যবসা—অনেক রকমের কাজই তিনি করেছেন। চা-ব্যবসায়ের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, এবং সে-কার্যে প্রভূত আর্থিক সাফল্য অর্জন করেন। সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাতেই প্রসিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক।

গ্রন্থাবলী : ফসিল, পরশুরামের কুঠার, তিলাঞ্জলি, ত্রিযামা, একটি নমস্কারে, জতুগৃহ, অমৃতপথযাত্রী, ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস, পুতুলের চিঠি, কিংবদন্তীর দেশে, ভারত প্রেমকথা ইত্যাদি।

যাযাবর (১৯০৯—)।

যাযাবর সেই ভাগ্যবানদের দলে, প্রথম বই প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর 'দৃষ্টিপাত' একখানি বহুপঠিত বহুপ্রশংসিত গ্রন্থ। গদ্যরীতি মূলত রবীন্দ্রাশ্রয়ী। কিন্তু বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়। ভাষার নিপুণ কারুকর্মে পাঠক-চিত্তকে তিনি মুগ্ধ করতে জানেন।

জন্ম পূর্ববঙ্গে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর। শিক্ষা-জীবন প্রধানত চাঁদপুরে অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ভারত সরকারের ডেপুটি প্রিন্সিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যাযাবরের প্রকৃত নাম বিনয় মুখোপাধ্যায়। 'দৃষ্টিপাত'-এর পরেও স্বনামে ও ছদ্মনামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গ্রন্থাবলী : দৃষ্টিপাত, জনান্তিক, খেলার রাজা ক্রিকেট, মজার খেলা ক্রিকেট, ঝিলম নদীর তীর।

জ্যোতির্ময় রায় (১৯১১—)।

জ্যোতির্ময় রায়ের শিল্পী-মন প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে স্ফূর্তি পেয়েছে। ছোটগল্পে আর সরস প্রবন্ধে। শিক্ষিত মার্জিতরুচি লেখক। সাহিত্যকর্মেও সেই রুচির ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। সংলাপ রচনায় তাঁর যথেষ্টই দক্ষতা।

জন্ম পূর্ববঙ্গে। দীর্ঘদিন কলকাতায় আছেন। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায় উত্তীর্ণ হবার পর চলচ্চিত্র-জগতের সান্নিধ্যে আসেন। এবং, প্রধানত, 'উদয়ের পথে'র লেখক হিসেবেই তাঁর প্রসিদ্ধি। পরে পরিচালক হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গ্রন্থাবলী ঃ উদয়ের পথে, দৃষ্টিকোণ, আচমকা ইত্যাদি।

সুশীল রায় (১৯১৫—)।

সুশীল রায়ের সাহিত্য-কর্মে কোন আকস্মিকতা নেই। কোনও তীব্র বিস্ময়? না, তাও নেই। আছে একটি সুমিত সুস্মিত লাবণ্য। এবং কী করে সেই সুন্দর লাবণ্যের অপরূপ মায়ায় পাঠকের সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে ভরিয়ে তুলতে হয়, তা তিনি জানেন। তাঁর কবিতা, তাঁর গল্প-উপন্যাস, আর তাঁর প্রবন্ধ, সবকিছুর মধ্যেই সেই শান্ত সৌন্দর্যের একটি প্রসন্ন হাস্যচ্ছটা ছড়িয়ে রয়েছে।

জন্ম রাজশাহীতে। পিতা শ্রীগোবিন্দ রায় ছিলেন সরকারী উকিল; সেই সঙ্গে 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকার সম্পাদক। সুশীল রায়ের শিক্ষা-জীবন কেটেছে প্রথমে রাজশাহীতে, পরে কলকাতায়। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কর্মজীবনের শুরু। টুথ পাউডারের ক্যানভাসিং থেকে শুরু করে সরকারী অফিসের চাকরি, নানান রকমের কাজ তিনি করেছেন। এখন আছেন 'বিশ্বভারতী'তে। প্রাচীন সাহিত্যের তিনি অত্যন্তই অনুরাগী। মেঘদূত ও রঘুবংশের সাহিত্যিক আলোচনায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দীর্ঘ কয়েকটি কাব্যও তাঁর প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থাবলী ঃ একদা, শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু, ত্রিবেণী, আকাশস্বপ্ন, পাঞ্চালী, রুদ্রাক্ষ, গল্পসঞ্চয়ন, মনীষী-জীবনকথা, সুবর্ণা।

রানী চন্দ (১৯১৬—)।

সাহিত্যক্ষেত্রে রানী চন্দের আগমন খুব বেশী দিন আগে ঘটেনি, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে', এ-দুটি বইয়েই তাঁর লিপিকুশলতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মে। তাঁর ভাষা সাবলীল, শিল্পী-হৃদয় মমতাময়।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সুযোগও সেই সময়ে ঘটেছে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের জন্য তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয়। চিত্রাঙ্কনেও পারদর্শিনী।

গ্রন্থাবলী ঃ জেনানা ফাটক, পূর্ণকুম্ভ, হিমাদ্রি ইত্যাদি।

রঞ্জন (১৯২০—)।

'কী লিখব', এটি একটি জরুরী প্রশ্ন। 'কী ভাবে লিখব', এটিও। কিন্তু খুব কম লেখকের মনেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। রঞ্জনের মনে হয়। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি লেখাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। বস্তু এবং ভঙ্গী, দুয়ের প্রতিই তাঁর সমান

নিষ্ঠা। গদ্যরীতি ঋজু, স্পষ্ট। তাতে শোভা কম, সবলতা বেশী। আর তাতে একটি আত্মসচেতন, সপ্রতিভ শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জন্ম রংপুরে। কিন্তু একুশ দিন বয়সের পর আর কখনও সেখানে যাননি। শৈশব কেটেছে কাশীতে আর কলকাতায়, কৈশোর চাঁদপুরে, কলেজ-জীবন পুনরপি কলকাতায়। ইংরেজী আর বাংলা, এই দুই ভাষাতেই পারদর্শী! দীর্ঘদিন কলকাতার একটি বিখ্যাত ইংরেজী সাময়িক পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে যুগপৎ আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সহযোগী সম্পাদক।

গ্রন্থাবলী ঃ শীতে উপেক্ষিতা, অন্যপূর্বা, বইয়ের বদলে, অসংলগ্ন, সংকরী, বিকল্প।

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০—)।

নিম্নচল্লিশ যে-কজন লেখকের রচনায় একটি গভীর প্রতিভার স্পর্শ রয়েছে, সন্তোষকুমার ঘোষের নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। মানবজীবনের অনেক রহস্যেরই তিনি সন্ধান রাখেন; সেই রহস্যের উন্মোচনেও তাঁর দক্ষতা প্রায় অপরিসীম। তাঁর ভাষা লাবণ্যময়, তবু তীক্ষ্ম। তীব্র, তবু সুন্দর। শুধুই গল্প-উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধেও সিদ্ধহস্ত।

পৈতৃক নিবাস বরিশাল। বাল্যকাল ফরিদপুরের রাজবাড়িতে অতিবাহিত হয়েছে। কলেজ-জীবন কলকাতায়। এককালে কবিতা লিখতেন, কবি হিসেবে সুনামও হয়েছিল। রাইটার্স বিল্ডিংসের কনিষ্ঠ কেরানি হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। সে-চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বার্তাজীবীর জীবন গ্রহণ করেন। যুগান্তর, কৃষক, প্রত্যহ, জয় হিন্দ্, নেশন, স্টেট্‌সম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। কিছুকালের জন্য বিলেতের এক বিখ্যাত পত্রিকার করেসপণ্ডেণ্ট ছিলেন। এখন আছেন দিল্লীর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে। ইংরেজী আর বাংলা, দুই ভাষাতেই তাঁর সমান দক্ষতা।

গ্রন্থাবলী ঃ কিনু গোয়ালার গলি, নানা রঙের দিন, শ্রেষ্ঠ গল্প, মোমের পুতুল, চীনেমাটি, পারাবত, শুকসারি ইত্যাদি।

বিমল কর (১৯২১—)।

মনস্তাত্ত্বিক জটিল এক-একটি রহস্যের উপলব্ধি আর তার বিশ্লেষণে বিমল কর যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তরুণতর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম, সত্যান্বেষী। সহানুভূতিও সামান্য নয়। তিনি জানেন, মানুষ দুর্বল। কিন্তু দুর্বল জেনেও মানুষকে তিনি ভালবাসেন। এই ভালবাসার প্রসাদেই তার সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস আর প্রবন্ধ—এত মাধুর্যময়।

২৪ পরগনার টাকিতে তাঁর জন্ম। বাল্যবয়স ধানবাদ, আসানসোল আর কুলটিতে অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময়ে কয়লা-খনির জীবনের সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। তারপর কলকাতায় আসেন। আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন। ভাল লাগেনি। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবন বিচিত্র। প্রথমে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে শিশি-বোতল ধোয়ার

কাজ। তারপর এ আর পি। ই আই রেলওয়ের অ্যাকাউণ্টস বিভাগেও কিছুদিন চাকরি করেছেন। তারপর সাংবাদিকতা। বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন আছেন 'দেশ' পত্রিকায়।

গ্রন্থাবলী ঃ হ্রদ, ঝড় ও শিশির, ত্রিপদী, বরফ সাহেবের মেয়ে, কাচঘর।

পত্রনবীশ (১৯২২—)।

পত্রনবীশের প্রকৃত নাম রমাপদ চৌধুরী। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি এই ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছেন। রমাপদ চৌধুরীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তাঁর গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিষয়-পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁর ভাষার কারুকর্মও লক্ষণীয়। ছদ্মনামে যে-সব প্রবন্ধ তিনি লিখে থাকেন, তার মধ্যে একটি পরিহাসরসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

জন্ম খড়্গপুরে। স্কুল-জীবন খড়্গপুরে কেটেছে, কলেজ-জীবন কলকাতায়। এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিন এক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া একাধিক বাংলা সাময়িকপত্রও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখন আছেন আনন্দবাজার পত্রিকায়।

গ্রন্থাবলী ঃ তিন তারা, স্বর্ণমারীচ, অভিসার রঙ্গনটী, অন্বেষণ, দরবারী, প্রথম প্রহর, শুভদৃষ্টি।

রূপদর্শী (১৯২৩—)।

সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাতেই জনচিত্তের অকুণ্ঠ সংবর্ধনা লাভ, এ-রকম ঘটনা বড়-একটা ঘটে না। রূপদর্শীর জীবনে ঘটেছে। এবং অকারণে ঘটেনি। বস্তুত, পাঠক-সমাজের হাতে এমন-কিছু তিনি তুলে দিয়েছেন, যার স্বাদ সম্পূর্ণই আলাদা, যা একেবারে নতুন জিনিস। তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের তিনি মিলন ঘটাতে জানেন। আনন্দের সঙ্গে বেদনার। হাসি আর অশ্রুর সার্থক সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যে অপূর্ব এক রসের সৃষ্টি হয়েছে। রূপদর্শীর প্রকৃত নাম গৌরকিশোর ঘোষ।

জন্ম যশোহরে। বাল্য আর প্রথম-যৌবন নবদ্বীপে অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষা—প্রধানত—নবদ্বীপেই। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। সেই সূত্রে বাংলা ও বাংলার বাইরে নানান জায়গায় ঘুরেছেন। কর্মজীবন অত্যন্তই সংঘাতময়। ইলেকট্রিক-মিস্ত্রির সাকরেদি থেকে প্রেস পরিচালনা, নানান রকমের কাজ করতে হয়েছে। তারপর সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। অধুনালুপ্ত 'সত্যযুগ' পত্রিকায় ছোটদের পাতার সম্পাদক ছিলেন। এখন আছেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। রিপোর্টার।

গ্রন্থাবলী ঃ এই কলকাতায়, মেঘনামতী, রূপদর্শীর নকশা, রূপদর্শীর সার্কাস, কথায় কথায়।